[এই উপন্যাসের সব কিছুই কাল্পনিক ; বাস্তবের সংগে এর কোন সংস্রব নেই]

তারক হালদার ▯ গোপী ভট্টাচার্য

প্রগতি পাব্লিশিং লিঃ

৩৯।১ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা—৬

প্রকাশক ঃ
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার
প্রগতি পাব্লিশিং লিঃ
৩৯।১ শিবনারায়ণ দাস লেন
কলি—৬

প্রচ্ছদপট ঃ
ডিজাইন, ব্লক ও মুদ্রন
বেংগল ফটোটাইপ কোং

প্রথম সংস্করণ
মহালয়া—১৩৫৭

দাম ঃ
তিন টাকা

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার
কাত্যায়নী মেসিন প্রেস
৩৯।১ শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা—৬

ভূমিকা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভারতীয় মেয়েদের যে অংশ নার্স-এর কাজ নিয়ে দেশের ও দেশের বাইরের বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়েছিলেন, তাঁদের দৈহিক শ্রমের আড়ালেই কি ভাবে তাঁদের নারীত্ব নিয়ে নির্বিচারে ছিনিমিনি খেলা হয়েছিল, তার কাহিনী এই উপন্যাসে বিবৃত হয়েছে। যুদ্ধের মতো বিশ্বগ্রাসী বিপর্যয়ের ত কথাই ওঠে না, সাধারণ অবস্থাতেও ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারী তাঁর শ্রমের বিনিময়ে সম্মানজনক ভাবে জীবিকার্জন করবেন, সে সুযোগ কমই আছে—তাঁর নিরুপায় নির্ভরশীলতার সুযোগে তাঁকে কোন না কোন ভাবে পাঁকে নামানো হবেই, যেহেতু নারীকে এখনো আমরা ঠিক মানুষ বলে ভাবতে শিখিনি—তিনি পুরুষ শাসিত সমাজে এখনো হয়ে আছেন ভোগ্যবস্তু বিশেষ।

নবীন গ্রন্থকারদ্বয় সমাজের অন্তর্নিহিত এই জান্তব রূপটি অবারিত করে দিয়েছেন দেশবাসীর সামনে। এই বইয়ের বিষয়বস্তু গল্প হলেও তথাকথিত বুশশার্ট ও ফোরাজ ক্যাপের আড়ালে কি হারে দেশে-বিদেশে নারীত্বের অপচয় এবং অপমান হয়েছিল, আমরা সকলেই তা কিছু কিছু জেনেছি। এই সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছি আমিও, কাজেই প্রামাণ্য দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটেছি এ সম্পর্কে অনেকই। আমি একথা নির্বিবাদেই বলতে পারি যে করুণকে অতি করুণ, সত্যকে অতি সত্য করার জন্যে লেখকরা কোথাও বেশী রং চড়ান নি। যা হয়েছিল, তার ছোট্ট একটি ভগ্নাংশই বরং এই বইয়ে উপস্থাপিত হয়েছে।

কিন্তু শুধু এইটুকু মাত্রই এই উপন্যাসের অভিনবতা নয়—গল্পের গাঁথুনি, এবং চরিত্র বিন্যাসের নৈপুণ্যও এতে লক্ষনীয় বিশেষ ভাবেই। প্রথম রচনার অপটু লেখনী আত্মপ্রকাশ করেনি প্রায় কোন খানেই—সে কি ভাষার দিকে, কি ব্যবস্থাপনার দিকে। এই রকম তৈরী হাত ও জাগ্রত মন নিয়ে এঁরা সাধনায় ব্রতী থাকলে, এঁদের দ্বারা বাংলা কথাসাহিত্যের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হবে। সেই সম্ভাবনার অগ্রদূত রূপেই আমি এই 'যাযাবরী'কে সাহিত্যের আসরে সাদর স্বাগত জানাচ্ছি।

মহালয়া,
১৩৫৭

যাযাবরী—১

তারক হালদার

(এক)

বিমান বিধ্বংসী কামানের প্রচণ্ড গর্জনে আটলান্টিক মহাসাগর কেঁপে উঠল।

মার্কিণ বিমানখানি বিরাট ঈগলের মত পক্ষ বিস্তার করে উড়ে আসছিল। যন্ত্রের ঘর্ঘর শব্দ অবিরাম তরংগ সৃষ্টি করে চলেছিল মহাশূন্যে

মার্কিণ চালকের সুকৌশলে বিমানখানি রক্ষা পেল সে যাত্রা ভারী অদ্ভুত রকমে। একটা আঁচড় লাগলনা প্লেনখানার গায়ে।

বিজয়লক্ষ্মী ধীরে ধীরে হেলে পড়ছেন মিত্রপক্ষের দিকে। সব সময়েই অব্যর্থ নয় আর জার্মান সেনার সন্ধান। তাদের হুংকার শোনায় যেন নিস্ফল গর্জনের মত।

বিমানখানা দুবার ভল্ট খেয়ে উর্ধমুখী হয়ে আকাশে উঠতে লাগল অপ্রতিহত গতিতে। তারপর চক্ষের পলকে চলে গেল কামানের পাল্লার বাইরে।

একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেল মার্কিণ পাইলট বিমানখানি নিয়ে— অসীম নীলিমায় বায়ুস্তরের গভীর অন্তরালে।

জার্মান ক্যাপ্টেনের বিমূঢ় চক্ষুদুটি তখনো নিস্ফল হাহাকারে বিমানখানি খুঁজে বেড়ায় দূর বিস্তৃত মেঘমালা ভেদ করে। অকেজো কামানখানার গায়ে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ক্যাপ্টেন —আর দাঁড়িয়ে সহকারীর দল বেয়নেট খচিত বন্দুকগুলো বাগিয়ে। সবার মুখের ওপর নেমে এসেছে হতাশার কৃষ্ণ অন্ধকার

মাঝারি রকমের ডাকোটা বিমান। আরোহী কয়েকটি শ্বেতাংগ সৈনিক। তারা কোন্ কন্‌সেন্‌ট্রেশন ক্যাম্প থেকে চলেছিল মিশরের দিকে। সেকেণ্ডফ্রন্টের যুদ্ধ তখন সুরু হয়ে গেছে।

দুই সারি শ্রেণীবদ্ধ গদীআঁটা কোচে উপবিষ্ট কয়েকটি তরুণ শ্বেতাংগ। তরুণ হলেও অকাল বার্ধক্যের ছায়া নেমে এসেছে দেহের ওপর—যুদ্ধ সুরু হবার সংগে সংগে।—চোখে এক পোঁচ কালি লেপা। অসংখ্য রেখায় কুঞ্চিত মুখ-মণ্ডল। তারুণ্যের লালিমা অস্তমিত। নৈশ মজলিসের অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতার ছাপ পড়েছে চোখে, মুখে, সর্বাংগে।

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের যূপকাষ্ঠে বলি প্রদত্ত আজও পৃথিবীর তারুণ্য। অপরাধী কে? মার্কিণ তরুণ?—না সাম্রাজ্যবাদ? —থাক্ সে সব।

রিক্রিয়েশন পার্টি অন্য বিমানে এতক্ষণ পৌঁছে গেছে মিশরে। ঘটনা চক্রে সাঙ্গিক্ দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই বিমানখানি পেয়ে যায়। বসেছিল পেছনের একটা কোচে।

আর একটি মেয়ে। পোষাকে বোধ হয়. শ্বেতাংগিনী।

পরণের গাউন দেহের সংগে টাইট্ হয়ে হিল্লোলিত হয়ে উঠেছে নিটোল স্বাস্থ্যের তরংগে তরংগে। কাঁধের অনেক নীচে সুরু হয়ে নেমে এসেছে জংঘা পর্য্যন্ত। শুভ্র পরিপুষ্ট জংঘার উর্ধমুখী শুভ্রতা দর্শকের কল্পনায় জাগায় রংগীন নেশা।

লিপষ্টিকে রঞ্জিত ওষ্ঠপ্রান্ত, রক্তাধর এবং বিলোল কটাক্ষ বহ্নি সৃষ্টি করে তরুণ যাত্রীর মনে।

ছুটি ফুটন্ত গিরিচূড়া সূক্ষ্ম বস্ত্রবাসের লঘু আস্তরণ ভেদ করে দর্শকের মনে জাগায় রোমাঞ্চিত শিহরণ। আঁটসাট বন্ধনীর কঠিন নিষ্পেষণ ভেদ করে লুব্ধ চোখের সামনে জেগে ওঠে ছুরন্ত ছুটি নাগিনীর উন্মাদ ফণার অর্ধ নগ্নতা।—দেহের আবেদন জানাবার ব্যগ্র ব্যাকুলতা।

অনেক মেয়ের মতই ভেসে চলেছে ইভা আফ্রিকার দ্বিতীয় রণাঙ্গণের আর একটি রণাঙ্গণে লালসার উদ্দাম স্রোতে ইভা ভেসে চলেছে ফুলের মালার মত।

বিমান বালিকা। নার্সের কাজ করে। যাত্রীদের স্বাস্থ্যের তত্ত্বাবধান করা, মধুর আলাপনে স্বজন-বিরহ-বেদনা ভুলিয়ে দেওয়াই তার কাজ।

জার্মান গোলার লক্ষ্য ব্যর্থ করে মেঘ সমুদ্র মথিত করে নিরাপদ ঊর্ধে চলে আসার সংগে সংগে তুমূল হর্ষ-ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল সৈন্যবাহী বিমানখানি।

সৈন্যদের হর্ষচাঞ্চল্যে হোক্, ইচ্ছায় কিম্বা অনিচ্ছায় হোক্, অথবা বিমানখানির আলোড়নে—ইভা যেন টাল সামলাতে না পেরে টলে পড়ে গেল কথোপকথনরত কোন একটি বিমান-সৈনিকের একেবারে গায়ের ওপর।

সরি।—লাস্য ভংগীতে কথাটি বলে মেয়েটি উঠে পড়লো।

তারপর ধনুকের মত ভ্রুদুটি নাচিয়ে হানলে একটি বিলোল কটাক্ষ।

চুলের গন্ধের মাদকতায় মাতাল হয়ে ওঠে সৈনিকটি। বাহু প্রসারিত করে সে ধরে ফেলে মেয়েটিকে। তারপর কোলের কাছে টেনে এনে তার মুখখানি চেপে ধরে বুকের ওপর—উন্মত্ত আবেগে।

হর্ষধ্বনি এবার রূপান্তরিত হয়ে ওঠে উচ্ছৃংখল উল্লাসের গগন ভেদী চীৎকারে। বিমানের চাকার ঘর্ঘর শব্দ ডুবে যায় অসভ্য মার্কিণ সেনানীর আনন্দের উৎকট হুর্‌রায়। তারা পিঙ্গলাক্ষী মেয়েটিকে নিয়ে লোফালুফি সুরু করে দেয়।

সাগ্নিকের সঙ্গে মেয়েটি ভাব জমিয়ে ফেলেছিল সর্বপ্রথম। এখন তার বর্ণবিদ্বেষের নগ্নরূপ এবং নির্লজ্জ বেলেল্লা পানা দেখে ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে উঠল সাগ্নিকের ভ্রূদুটি।

রিক্রিয়েশান্ পার্টির সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছে সাগ্নিক্। আজ এডেন, কাল মাল্টা, পরশু বৃন্দিসি, আলেক জান্দ্রিয়া, পোর্ট সৈয়দ অথবা প্রশান্ত মহাসাগরের সুবিস্তৃত উপকূলে সারেংগী বাজিয়ে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে সৈনিকদের প্রমোদ দিয়ে।

এখনও মনকে আচ্ছন্ন করে আছে প্যারীর মোমার্ত এবং অপেরা অঞ্চলে নৈশজীবনের স্মৃতি।

রাত্রি তৃতীয় প্রহর। নিঝুম নিস্তব্ধ প্যারী। প্লাদি কোঁকার্দের বিজয়স্তম্ভের সন্নিহিত আলোকমালা যেন উৎসব শেষে ম্রিয়মান, নিষ্প্রভ। বিশ্ববিখ্যাত লুভ্‌রে মিউজিয়াম্,

নোত্রেদাঁর গির্জা, আর্ক ডি ত্রায়াম্প স্মৃতি স্তম্ভ, ইফেল টাওয়ার এক হয়ে মিশে গেছে কলংকিত রাত্রির কালো অন্ধকারে।

মোমার্ত এবং অপেরা অঞ্চলে জড়িত চীৎকারের দু একটা টুকরো নিস্তব্ধ হাওয়ায় ভেসে যায়। বিশ্ববিখ্যাত লিডোর নাচঘরে থেমে গেছে নাচের মজ্‌লিস। শুধু শোনা যায় মদ এবং সোডা ওয়াটারের উৎক্ষিপ্ত ফেনিল উচ্ছাসের সংগে সংগে জঘন্য কাৎরাণি। কামনার ঔধ্যত্যে বোতাম খোলার সঙ্গে সঙ্গে স্ফুর্তির ফোয়ারায় গা এলিয়ে দেওয়া খিল খিল হাসির হর্‌রা। আর শোনা যায় মোদো রক্তের উন্মত্ত চীৎকার।

সাগ্নিক্ বন্দী। বিদ্যুতের ঝলকের মত চঞ্চল উনিশবছরের একটি মেয়ের শুভ্রদেহের যৌবন তটে সে বন্দী এই প্যারী সহরে।

প্লাদি কোঁকার্দ্দের আলোকোজ্জ্বল ফোয়ারার কাছে নীলাক্ষীর দুটি নীল নয়নের ফাঁদে বন্দী দুটি কৃষ্ণ চক্ষু। অপার্থিব প্রণয়ে অঙ্গ সংলগ্ন দুটি ভিন্ন দেশীয় নর এবং নারী পরস্পরের বক্ষে কাণ পেতে যেন শোনে কিসের প্রতিধ্বনি।

ফরাসী মেয়ে ক্লারা সাগ্নিকের জীবনের পাতায় রেখে গেছে এক অপরূপ রূপের লোভনীয় স্মৃতি। কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় সে এসেছিল উত্তপ্ত স্পর্শ নিয়ে। এসেছিল সে স্বেচ্ছায়।

ইভাকে ভালবাসতে তার দ্বিধা ছিলনা। কিন্তু, খসে গেছে যে তার বর্ণ বিদ্বেষের ছদ্মবেশ। ধরা পড়েছে যে তার ভণ্ডামির আবরণ।

অভ্রের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে থাকে সাগ্নিক্।
মেঘের পর মেঘের তরংগনর্ত্তন। দৃষ্টি আর চলেনা জমাট মেঘের ধূম্রজাল ভেদ করে।

দৃষ্টি আর ফেরান যায় না পেছনের দিকে। একটা মেয়েকে নিয়ে কুকুরের মত ছিনিমিনি খেলছে সবাই মিলে। মিস মেয়োর বর্ণ আছে এদের গায়। এরা নাকি সভ্যতার বড়াই করে।

সাগ্নিকের চোখের পাতা ক্রমেই ভারী হয়ে আসতে লাগল। ঠাণ্ডা জলো-হাওয়ার স্নিগ্ধ-স্পর্শে ঘুমের আমেজ আসে। রুক্ষ মাথা তুটো সামনে ঝুঁকে পড়ে।

হঠাৎ পাথর কুচির মত কি একটা অতি ক্ষুদ্র কঠিন পদার্থ ছিটকে এসে পড়লো সাগ্নিকের কোলের ওপর। সে চমকে ধড়মড় করে উঠে বসলো।

বোতাম। —সদ্যছিন্ন এক টুকরো সুতোর অস্তিত্ব তখনো ছিদ্র পথে।

বোতামখানা হাতে নিয়ে পেছনের দিকে আর না চেয়ে পারলে না সাগ্নিক্। ঘৃণায় তার মুখ বিকৃত হয়ে উঠল। প্রকাশ্য বেহায়াপনা আর নিলর্জ্জতা দেখে আনত হলো চক্ষু তুটি। মেঘমালা ভেদ করে এমনি করে চলতো কি বিস্তৃত মেঘ রাজ্যে দেবতাদের আকাশ বিহার? কোথায় কোন্ গ্রহের আড়ালে লুকোন আছে দেবাদিদেব মহাদেবের কৈলাস। দিগম্বর

নটরাজের কোলের ওপর এমনি খেলা করতো খোলোস ছাড়া দুরন্ত নাগিনী ?

হঠাৎ ভীষণ দুলে উঠল প্লেনখানা নিরবলম্ব অন্তরীক্ষ্যে। ঘড়-ঘড়-ঘড়। —বিকট একটা আওয়াজ উঠল। তারপর প্লেনখানা কাৎ হয়ে গেল একদিকে।

কল গেছে বিগড়ে! মানুষের শক্তিকে ভ্রুকুটি করে মধ্যাকর্ষের প্রচণ্ড আকর্ষণ। প্রলয়ের মহা-সংঘাতে এবার বিচূর্ণ হয়ে যাবে কক্ষচ্যুত গ্রহ। প্রজ্জ্বলন্ত বহ্নির মধ্যে মিশে যাবে কয়েকটি হতভাগ্য প্রাণের দীপ শিখা।

বিমানখানিকে বাগে আনবার জন্য পাইলটের সে কি প্রাণপণ উদ্যম! সেকি অদ্ভুত ক্ষিপ্রতা! ততোধিক ক্ষিপ্রতায় তিনি আদেশ দিলেন,—লাফিয়ে পড় সবাই প্যারাস্যুট নিয়ে।

শ্বেতাংগ পাইলট আর সাগ্নিক্ ছাড়া সবাই চীৎকার করে লাফিয়ে উঠল। বিকল প্লেনখানা এবার যেন ব্যংগ করে উঠল তাদের আর্তনাদ শুনে।

প্রাণের কাছে মূল্য কি নারীর? ওরকম কত গড়াগড়ি যাচ্ছে ক্যাম্পে ক্যাম্পে। তারা ছুড়ে ফেলে দিল ইভাকে একখণ্ড পরিত্যক্ত মাংসপিণ্ডের মত। তারপর লাফিয়ে পড়লো প্যারাস্যুট নিয়ে।

সাগ্নিকের ভাবপ্রবণ বাঙালী মন নিশ্চিত মৃত্যুর মধ্যে ফেলে রেখে যেতে চাইল না ইভাকে। সে বিদ্যুদ্বেগে মেয়েটিকে হাত ধরে তুলে বললে,—পোষাক পরবার সময় নেই আর। প্যারাস্যুট গায়ে জড়িয়ে নিন।

গেল-গেল।—এবার নিশ্চিত মৃত্যু। আর কয়েক শত ফুট আছে মাত্র। উল্কাবেগে নীচে নেমে আসছে প্লেনখানা।

আত্মোৎসর্গে দৃঢ়সংকল্প উদার বীর মার্কিণ পাইলট। পূর্বকথিত সৈনিকদের সঙ্গে যেন ইনি বিপরীত ধর্মী।

মার্কিণ পাইলটের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধায় শির অবনত করলে সাগ্নিক্। তারপর উভয়ে লাফ দিল মহা শূন্যে।

(দুই)

সাগ্নিকের পায়ের তলায় কোমল ঘনিষ্ঠ স্পর্শ   তার বুক থেকে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে।—আঃ !

সৎমায়ের স্নেহ ক্রোড়ের মত মহাশূন্যের ঐ আরামপ্রদ আশ্রয় কখন যে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করে নিশ্চিত মরণের মুখে ঠেলে দেবে তা কে বলতে পারে ?

তবু বিশ্বাসঘাতক নয় এই মাটি। মানুষ এর বুকে আশ্রয় পায়, অভয় পায়। মানুষ যতই উর্ধে উঠুক, এই মাটি একাগ্র ব্যাকুলতায় অভয় হস্ত প্রসারিত করে তার সন্তানকে ডাকে,—ওরে আয়! ওরে আয়!

চারিদিকে রাত্রির অন্ধকার। বিমান দুর্ঘটনা থেকে প্রাণে বেঁচে আনন্দে একেবারে কেঁদে ফেলেছিল সাগ্নিক্। মরণের নিশ্চিত দুয়ার থেকে ফিরে এসে নব জীবনের সঙ্গে যেন এই হলো তার প্রথম পরিচয়।

আসন্ন মৃত্যুর ঘনান্ধকার থেকে নবজীবনের আলোকোজ্জ্বল প্রদেশে পদার্পণ করে সাগ্নিক্ আত্মস্থ হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর যখন চমক ভাঙ্গলো, তার মন আর এক আশংকায় ভরে উঠল।

একি! কোথায় এসেছি!

কোথায় সমতল ? কোথায় বনস্পতির শ্যামল আচ্ছাদন, ঘর, বাড়ী, সহর ? এযে ধূসর মরুপ্রান্তর! ঘর, বাড়ী লোক

লস্কর বন জংগল কিছু নেই। পাখীর কাকলি নেই। নিঝুম, নিস্তব্ধ মরুর বুক।

কি করবে সাগ্নিক্? যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধুই বালি! —কেবল বালি। নিশীথের নীল আকাশ ছুঁয়ে আছে ধূসর বালির রজতগিরি। অসংখ্য দুরন্ত নাগ শিশুর মত রাশি রাশি বালির তরংগ নৃত্য। চন্দ্রকিরণে ঝক্ ঝক্ করছে অসংখ্য ফণার ওপর অগণিত মণিমালা।

নিশ্চিত মরণের মরুপ্রান্তরে—তবে সেকি নবজীবনের মরীচিকা দেখে আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিল এতক্ষণ?

এতক্ষণে তার মনে হলো মার্কিণ সহযাত্রীদের কথা। ইভার কথা। সে প্রাণপণে চীৎকার করতে লাগল। প্রতিধ্বনি মাত্র ফিরে এল শুধু ব্যংগ করে।

সাগ্নিক্ প্রাণপণে ছুটতে লাগল। উর্ধশ্বাসে ছুটতে লাগল। প্রাণভয়ে ছুটতে লাগল। মরুর হিমশীতেও ঘর্মাক্ত হয়ে উঠল সর্বদেহ।

মরুর তৃষিত বায়ু। তৃষ্ণায় প্রাণ কণ্ঠাগত। ঐ দূর দিগ্বলয়ের ব্যবধানের চেয়েও তার জীবনের সীমারেখা খুব কম, খুব নিকট। তবু সেই নির্বান্ধব মরুপ্রান্তরে পা টেনে টেনে চলেছে সাগ্নিক্।

এমনি মানব প্রকৃতি। নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখে এসে মানুষের বাঁচবার এমনি অদম্য আকাংখা।

হঠাৎ সাগ্নিকের মন আনন্দে হিল্লোলিত হয়ে উঠল। ঐ দেখা যায় জ্যোৎস্নালোকিত সমুদ্রের উত্তাল তরংগে। কানে আসে

কার আর্ত্তচীৎকার ধ্বনি। নিশ্চয় কোন লোকালয় আছে ঐ সমুদ্রের ধারে।

সাগ্নিক্ উল্লাসিত হয়ে ছুটে যায় সমুদ্রের দিকে। সমুদ্রও ব্যংগ করে এগিয়ে যায় -- আগে আগে।

সাগ্নিকের দেহ কণ্টকিত হয়ে উঠল। সমুদ্র নয়? তবে একি? মৃগতৃষ্ণিকা?—কী সর্ব্বনাশ?

পা আর চলে না। তৃষ্ণার্ত, অবসন্ন সাগ্নিক্। একটা বালিয়াড়ির গায় হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। তার জ্ঞানহীন দেহ লুটিয়ে পড়ে বালির ওপর।

সাগ্নিকের যখন জ্ঞান হলো, তার মনে হলো, সে যেন শূন্যের ওপর ভেসে চলেছে। তার মাথার নীচে কোমল জীবন্ত, মাংসল উপাধানের উষ্ণ স্পর্শ। রুক্ষ চুলের মধ্যে চম্পক অঙ্গুলি সঞ্চালনের অপূর্ব স্নিগ্ধতা। সাগ্নিক্ ধীরে ধীরে চোখ মেলে চাইল।—কে এ? ইভা? সেই রূপজীবিনী?—না, সে তো নয়!—বিমানে চলেছে?- না, তাওতো নয়।—নিরবলম্ব হয়ে স্থির চন্দ্রালোকে সেতো চলেছে ভেসে ভেসে।

সাগ্নিক্ আনন্দে চোখ বুজোলো।—তবে একি মৃত্যুর পর পরজীবন? এত সুন্দর? সংসার মরু পার হয়ে তবে সেকি চলেছে স্বর্গের পারিজাত ঘেরা মরুদ্যানে?

—আঃ! স্বপ্ন নয়, সবই সত্যি। আশ্চর্য্যরকমের সত্যি। তার মাথা কোলে তুলে নিয়েছে স্বর্গের কোন অপ্সরী। কার সংগে যেন কথা কইছে। বোধহয় কোন দেবদূত।

—কানে আসে যেন শংখধ্বনি। —অপ্সরীকণ্ঠের অপূর্ব গীত-বাদ্য।

সাগ্নিক চোখ চাইলে আবার। হাঁা, স্পষ্টই সে মৃত। এইতো সে এসেছে মৃত্যুর পরপারে। এইতো সে নিরবলম্ব হয়ে চলেছে অনন্ত নীহারিকার সৌরপথে। ঐতো দেখা যায় অপূর্ব স্রোতস্বতী। কাঁচের মত শুভ্র জল। স্ফটিক স্তম্ভ। তারপর—

আঃ! মেয়েটির হাতে জল খেয়ে সুস্থ হলো সাগ্নিক্।—না-না—সে মৃত নয়। চারিদিকে সেই অনন্ত বিস্তৃত মরুভূমি। সে-ই! সে-ই। গীতবাদ্য, স্রোতস্বতী, স্ফটিক স্তম্ভ কিছু নয়, শুধু সে-ই মৃগতৃষ্ণিকা। তবু—

তবু আর তো সে তৃষ্ণার্ত নয়। সে আকণ্ঠ সুধা পান করেছে। আর সে একা নয়। কোন্ কল্পলোকের রূপবতী রাজকন্যার অংকে বন্দী হয়ে কোথায় যেন সে চলেছে জীবনের মরুপথে। রাজকন্যা সোনার কাঠির স্পর্শে তাকে জাগিয়ে তুলেছে মরুর বুকে।

অদ্ভুত পোষাক মেয়েটির। গলা থেকে পা-পর্য্যন্ত কালো আল-খাল্লা। কপাল থেকে আর একটা কালো কাপড় পিঠ পর্য্যন্ত ঝুলে পড়েছে। চুল থেকে কপালের ওপর দিয়ে চোঙার মত একটা কি নেমে এসেছে নাকের ওপর। মাথার ওপর উন্মোচিত কালো মিহি জালের সূক্ষ্ম অবগুণ্ঠন।

যেন কোন্ এক স্বপ্ন লোকের রহস্যময়ী। অপূর্ব রূপবতী।

দুটি আয়ত নীল আঁখির ওপর বঙ্কিম ভ্রু-যেন জিজ্ঞাসায় চিহ্নিত।

বীণাবিনিন্দিত কণ্ঠস্বরে মেয়েটি বল্‌লে,—মুসাফির !

সাগ্নিক্ ধীরে ধীরে উঠে বসে ক্ষীণ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে,—আমি কোথায় ?

মেয়েটি শুধ্য ইংরাজীতে উত্তর দিল—তুমি শুয়ে পড় মুসাফির। কষ্ট হবে !

সাগ্নিকের মুখে ফুটে উঠল ম্লান হাসি। সে বললে,—কষ্ট ?—নাঃ ! আরতো কষ্ট হচ্ছেনা। বরং কষ্ট দিয়েছি তোমাদের।

কিছু আঙুর এবং খেজুর বার করে সাগ্নিকের হাতে দিল মেয়েটি। তারপর মধুর কণ্ঠে বললে,—এগুলো খেয়ে ফেল মুসাফির।

সাগ্নিক্ কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাইলে যুবতীর পানে। তারপর দুহাত পেতে গ্রহণ করলে মরুপ্রান্তরে—রূপসীর করুণার দান।

—কোথায় আমরা ?—সাগ্নিক্ প্রশ্ন করলো আবার।

—সাহারা।—গম্ভীর পুরুষের কণ্ঠে উত্তর দিল আর একজন।

মেয়েটির পাশে বসেছিল এক বৃদ্ধ। নগ্ন বলিষ্ঠ দেহ। আপাদ লুণ্ঠিত আলখাল্লা। মাথায় ফেজ।

সাহারার দূর বিস্তৃত মরুর দিকে চেয়ে সেই বৃদ্ধের উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করলে সাগ্নিক্। নিশ্চয় কোন আরবীয় বণিক ইনি। পথিমধ্যে মুমূর্ষু দেখে দয়া করে তুলে নিয়েছেন।

হঠাৎ মেয়েটি সাগ্নিকের চিন্তাস্রোতে বাধা দিয়ে কলকণ্ঠে বলে উঠল — মিরাজ !

প্রায় রাত্রির শেষ প্রহর। সাগ্নিক্ সবিস্ময়ে দেখলে, এক ছায়া শীতল প্রান্তরের কাছে এসে নিশ্চল হয়ে দাঁড়াল মরু পোত। মরুভূমির মধ্যে চক্ চক্ করছে এক চন্দ্রালোক খচিত নিস্তরংগ জলাশয়

এতক্ষণ সাগ্নিকের দৃষ্টি ছিল সামনে। এবার পেছনে চেয়ে দেখলে, একটি উট যূথ চলেছে। সর্বশুদ্ধ প্রায় দুশো আরোহী। সামনের উটের সংগে সংগে সব উটগুলোই আরোহী-শুদ্ধ দাঁড়িয়ে পড়লো।

তারপর সেই মনোরম ওয়েসিসে উট থেকে নেমে পড়লো সবাই।

আনুপূর্বিক নিজের সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করে পূর্বোক্ত লোকটিকে সাগ্নিক্ ব্যাকুল ভাবে প্রশ্ন করলে,—আমার সহযাত্রীরাও কি প্রাণে বেঁচেছে ?

আগন্তুক লোকটি ব্যংগ হাসি হেসে উত্তর দিল,—বেদুইনের হিংস্র কবলে পড়লে বাঁচা বড় কঠিন হিন্দী।

—বিশ্ব বিখ্যাত যাযাবর দস্যু বেদুইন ?

আতংকে সাগ্নিকের গা কাঁটা দিয়ে উঠল। পায়ের নীচে পৃথিবী টলমল করে উঠল। বলির পশুর মত তোয়াজ করা হচ্ছে তবে, নির্মম ভাবে হত্যা করবার জন্যই ? কে না জানে এই বেদুইনদের নির্মম হিংস্রতা।

দলের একটি দস্যু এগিয়ে এসে প্রথমোক্তটিকে কুর্নিশ করে বলে উঠল,—উম্‌দা!

তারপর দুর্বোধ্য ভাষায় কি কথোপকথন হবার পর সে লোকটি চলে গেল।

বৃদ্ধ বেদুইন দস্যু সহাস্যে সাগ্নিককে বললে,—আমি এদের সর্দার অর্থাৎ উম্‌দা। আমার নাম সেখ সৌকত বলে জানবে।—তোমার কোন ভয় নেই, হিন্দী।

দস্যু সর্দার করমর্দন করে আলিংগন করলে সাগ্নিককে। তারপর বললে,—উম্‌দার এই আলিংগনের পর আর আমার দলের একটি বেদুইনের সাহস হবেনা যে তোমার অংগ স্পর্শ করে।

বিমূঢ় সাগ্নিক্। সে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে উম্‌দার দিকে চেয়ে পাংশু মুখে প্রশ্ন করলে,—আমার সংগী

ভ্রুকুঞ্চিত করে উম্‌দা বললে,—বলেছিতো! তাদের বাঁচা হবে না।

রাত্রির শেষ প্রহরের স্থির চন্দ্রালোকে দেখা যায়, অদূরে একটা উটের পেছনে শৃংখলিত মার্কিণ সৈন্যের দল। বোধহয় তাদের উটের পেছনে হাঁটিয়ে এনেছে নৃশংস বেদুইন দস্যুরা। আর একজন ইভার হাত শক্ত করে ধরে আছে।

সাগ্নিকের চক্ষু অশ্রুসজল হয়ে উঠল। হোক্ এদের উচ্ছৃংখল জীবন। তবু এদের জীবনের মূল্য কম কিসের? পাপী বলে কি দাম নেই তার প্রাণের?

সাগ্নিক্ নতজানু হয়ে সৌকতকে বললে,—এদের প্রাণে মারবেন না উম্‌দা।

তার কথা শুনে ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল বেদুইন সর্দার। তার দেহের শিরা সকল ফুলে উঠল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলে উঠল,—শোন মুসাফির! তুমি আমাদের আশ্রিত। অন্য কেউ ওদের হয়ে ক্ষমা চাইলে, এতক্ষণে তাকেই প্রথমে শেষ করতাম। জান ওরা কি করেছে?

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সাগ্নিক্ চেয়ে রইল উম্‌দার দিকে। উম্‌দা যা বললে তার সার মর্ম এই ;—

দাউ দাউ করে জ্বলে বালির মধ্যে প্রোথিত হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় প্লেনখানা। আর একদিকে এই মার্কিণ সৈন্যেরা প্যারাসুট নিয়ে নেমে পড়ে ঠিক সর্দারের মেয়ে নওয়ারার উটের সামনে। তারা এলোধাবাড়ি রাইফেলের গুলি চালাতে চালাতে বেদুইনদের মধ্যে আতংক সৃষ্টি করে নওয়ারাকে আক্রমণ করে। তার উটকে হত্যা করে ফেলে। তারপর তুমুল যুদ্ধের পর বন্দী হয় এই বেকুবের দল। এদের এই জঘণ্য অপরাধের শাস্তি মৃত্যু। নৈলে সাগ্নিকের মত এদেরও প্রাণ বাঁচাতে দ্বিধাবোধ করতো না বেদুইন উম্‌দা।

সাগ্নিক্ অবরুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনে গেল সমস্ত কাহিনী উম্‌দার মুখে। এমনি কত সংসার এরাই জ্বালিয়ে দিচ্ছে বাংলা দেশে। সর্ব্বনাশ করছে কত গৃহস্থ বধুর। এই দূর মরুপ্রান্তরে বিপদের মুখে পড়েও নিবৃত্তি নেই লালসার :—হ্যাঁ, মৃত্যুই এদের উপযুক্ত শাস্তি।

সাগ্নিকের সামনে গ্রীবা বেঁকিয়ে অপূর্ব লীলায়িত ভংগিমায় এসে দাঁড়াল নওয়ারা। দস্যুকন্যার হাতে কফির আরক। স্নিগ্ধ-স্বরে সে বললে,—রাতটা ভারী ঠাণ্ডা। কফিটা খেয়ে নিন্ মুসাফির।

সাগ্নিকের চক্ষের পলক পড়ে না। অপূর্ব সুন্দরী এই বেদুইন কন্যা। সে অবাক হয়ে ভাবে, এই মরুপ্রান্তরে বিধাতা কি অতি নির্জনে সৃষ্টি করেছিলেন নিখুঁত তিলোত্তমা?

সাগ্নিক্ সসম্ভ্রমে নওয়ারার হাত থেকে গ্রহণ করলো কফির উগ্র আরক।

উঃ! কী উগ্রতা কফির আরকে। মদের মত উগ্র নেশায় মাতাল করে দেয় মনকে। উত্তপ্ত হয়ে ওঠে শোণিত শিরায়-শিরায়।

সৌকত সহাস্যে সাগ্নিক্‌কে জিজ্ঞাসা করলে,—কি করা হবে ওদের?

সাগ্নিক্ জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বললে,—নারীর অনিচ্ছায় তার দেহে হস্তক্ষেপের শাস্তি—মৃত্যু।

সাগ্নিকের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই সৌকতের ইংগিতে বেদুইনদের রাইফেলগুলো গর্জে উঠল। লম্পট মার্কিণ সৈন্যরা আর্তনাদ করে উঠল মাত্র একবার। তারপর লুটিয়ে পড়লো তাদের প্রাণহীন দেহ।

অদূরে উইলো গাছের তলায় বসে সাগ্নিক দেখতে লাগলো,

ডাকোটার দুর্ভাগাদের দেহ তল্লাস করে লুণ্ঠন করে নেওয়া হলো তাদের যথাসর্বস্ব।

তারপর—সাহারা মরুসমুদ্রের বালুরাশির অনন্ত গভীরতায় রচিত হলো সমাধি শয্যা।

তার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল শুধু একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস।

(তিন)

সাগ্নিকের চারিদিকে এক মোহময় মধুর আবেষ্টন। বেশ কাটছে দিনগুলো। সাহারার দীর্ঘ মরুপথ সে অতিক্রম করে চলেছে মিশরের পথে এই যাযাবরদের সংগে।

কে জানে কি অবস্থা ইভার। হয়তো দুশ্চরিত্রা মেয়েটা প্রাণের বিনিময়ে দেহদান করে মানিয়ে নিয়েছে বেদুইনদের সঙ্গে। পালাবার সুযোগ খুঁজছে।

উট চলেছে। সংগে মেষপাল। যেন একটি চলমান নারিকেল বীথি। নিদাঘ সূর্যের প্রখর উত্তাপে মরুপথ ঝল্সে যায়। সামনের উট থেমে যাবার সংগে সংগে তার নাকের সঙ্গে পেছনের উটের লেজে বাঁধা রশির টান পড়ে। সংকেত চলে যায় উট যূথের সর্বশেষটি পর্যান্ত।

সামনের উটে বেদুইন দলপতি। তার নির্দ্দেশে নেমে পড়ে বেদুইনরা। লোমের তাঁবু পড়ে যায়। তারপর কয়েকদিন কাটিয়ে আবার যাত্রা সুরু হয় লক্ষ্য পথে।

খেজুরের পাৎলা রসে তৈরী কাফির আরক। উগ্র আরবী সুরা। মাতাল করে দেয় মনকে।

বেদুইন মেয়েরা সুরাপাত্র নিয়ে এগিয়ে আসে নৃত্যছন্দে-চঞ্চল পদক্ষেপে। বেদুইনদের সংগে বসে সাগ্নিক আকণ্ঠ পান করে মৃত্যু-সুধা। সে বেশ মিশে গেছে যাযাবরদের সংগে।

রাত্রির তুষার শুভ্র মরুর ওপর উগ্র নেশায় মাতাল হয়ে পড়ে থাকে। উচ্ছৃঙ্খল বিলাসের বীভৎস চীৎকারের অস্পষ্ট আওয়াজগুলো কাণে এসে জট পাকায় মস্তিষ্কের মধ্যে।

উম্‌দা এবং তার মেয়ের প্রকৃতি যেন একটু উচ্চস্তরের। সামান্য রকমের আলাদা। নিরক্ষর বেদুইনদের মধ্যে এরাই শিক্ষিত: একজন সম্রাট—অপরটি সম্রাট দুহিতা। সরকারকেও কোন কোন ক্ষেত্রে না মেনে উপায় নেই—এই যাযাবর উম্‌দাদের. একটা সূক্ষ্ম আভিজাত্য বোধ এদের পৃথক করে রাখে অধীনস্থ দস্যুদের উচ্ছৃঙ্খল আমোদের সময়।

সুরার মতই উন্মাদনা আনে নওয়ারার রূপশিখা। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য নিটোল স্বাস্থ্য এবং পীবর বক্ষ নিয়ে নির্জন মরু-প্রান্তরে সুরাপাত্র এনে সাগ্নিকের মুখে ধরে ডাকে সুমধুর স্বরে,—মুসাফির!

সারেংগী বাজায় সাগ্নিক। সুরের লহরীর তালে তালে অগ্নি-শিখার মত কেঁপে কেঁপে ওঠে অশান্ত মরুনৃত্য। চঞ্চল পুলক-প্রবাহ কি এক উন্মাদনায় ছুটোছুটি করে তার স্নায়ুতে স্নায়ুতে।

নওয়ারা মাতাল হয় নিজেও। কিন্তু ধরা দেয় না। জীবন্ত মরীচিকার মত ছুটে পালায়।

জীবন-মরুর পথে সাগ্নিক্ কেবলই দেখেছে মরীচিকা। মরীচিকার পেছনে সে ছুটেছে। মরীচিকার পেছনে সে ছুটে

বেড়িয়েছে। ওয়েসিসের শ্যামলীমা তাকে স্থির হয়ে থাকতে দেয়নি বেশী দিন।

অনীতার জন্যেইতো সে আজ যাযাবর। সে যুদ্ধে যোগ দেয় শুধু অনীতার জন্যেই।

সাগ্নিকের জীবনের প্রথম সঞ্চয়। অষ্টাদশী কিশোরী। স্কটিশে সাগ্নিকের সঙ্গে একই ক্লাসে পড়তো মেয়েটি।

রংএর চেয়েও সুন্দর দেহের গড়ন। ঘন আঁখিপল্লবের নীচে আলোভরা দুটি চক্ষুর দীর্ঘায়ত দৃষ্টি। দুকানে দুটো সোনার দুল। মস্ত বেণী দুভাগে বিভক্ত হয়ে পিঠের ওপর দিয়ে এসে পরিপুষ্ট নিতম্ব চুম্বন করে। বলের মত লাফাতে লাফাতে ওঠে সিঁড়ি দিয়ে। বেণীটা দোলে সাপের মত।

অনীতার বিষম অভিযোগ—ছেলেদের লুব্ধ দৃষ্টির সামনে সে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তার দিকে চেয়ে থাকে ছেলের দল।

ছেলেরা অস্বীকার করে অনীতার এই সাংঘাতিক অভিযোগ। অবশেষে তারা সাক্ষী মানে সাগ্নিককে।

সুশ্রী গৌরবর্ণ চেহারা। তীক্ষ্ণ দুটি চক্ষু বুদ্ধির প্রভায় জ্বল্ জ্বল্ করে। কি যেন অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব আছে ঐ উজ্জ্বল দুটি চক্ষে। সাগ্নিকের দিকে চেয়ে মুহূর্তের জন্য কি ভেবে তাকে সাক্ষী করবার প্রস্তাবে সায় দিল অনীতা—ও।

সাগ্নিকের দৃপ্তশির। মেরুদণ্ড সোজা করে সে উঠে দাঁড়াল। হলঘর নিস্তব্ধ। সবাই উৎকর্ণ হয়ে বসে আছে। সাগ্নিকের একটি কথায় আজ নির্দ্ধারিত হবে জয়-পরাজয়। তারা যে স্বেচ্ছায় তাকে সাক্ষী মেনেছে।

অধ্যাপক গম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করলেন,—অনীতার অভিযোগ সত্যি ?

— হ্যাঁ।

অনীতার উজ্জ্বল দুটি চোখ খুসীতে আরও জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল: গালে হাত দিয়ে বসে ছিল সোজা হয়ে বসলো এবার।

স্তম্ভিত ছেলেরা। তারা ভেবেছিল সাগ্নিক্ই তাদের রক্ষা করবে এযাত্রা। মৃদু গুঞ্জনে হলঘর ভরে গেল। কে একজন অস্ফুট স্বরে বলে উঠল,—রাস্কেল!

অধ্যাপক বোধ হয় মূহুর্ত্তের জন্য ফিরে গিয়েছিলেন তাঁর নিজেরি অতীত যৌবনে। তিনি ব্যংগ স্বরে প্রশ্ন করলেন.— আর তুমি বোধ হয়, সে সময় বইয়ের পাতার দিকেই চেয়ে থাক ?

—আজ্ঞে, না। আমিও অনীতার দিকেই চেয়ে থাকি। ভারী সুন্দরী—ও!

সাগ্নিকের এই নির্লজ্জ উত্তরে ছেলেরা এ ওর মুখ চাওয়া চাওয়ি

করে। অনীতাও পরম কৌতুহলে মাথা উঁচু করে দেখে নেয় অদ্ভুত ছেলেটিকে। তারপর সলাজে মাথা নীচু করে।

—সাট্‌আপ্‌! তুমি বেয়াদ্‌প্‌! অসভ্য!—হুঙ্কার করে উঠলেন লজিকের অধ্যাপক।

—আমি ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তুমি। ক্লাসে বসবার যোগ্য নও তুমি। এমন লোককে আবার সাক্ষী মানে!

সাগ্নিক্ পরিহাস তরল কণ্ঠে উত্তর দিলে,—

—সাক্ষী মানা এবং আমাকে সাক্ষী বলে স্বীকার করার দায়িত্ব আমার নয়, আপনাদের। সে যাই হোক্! আপনার প্রশ্নের মিথ্যা উত্তর দিলে কি আপনি সুখী হতেন স্যার ?—বলুন।

হলঘর নিশ্চুপ। বিস্মিত লজিকের অধ্যাপকের ছুটি ভ্রু-কুঞ্চিত।

—তবে স্বীকার করছো, তুমিও দোষী ?

—স্বীকার এখনো করিনি কিছু। তবে অনীতার দিকে চেয়ে দেখবার অপরাধে যদি আমরা দোষী সাব্যস্ত হই, অনীতা কেন নির্দ্দোষী থেকে যাবে ?

—তার মানে ?—বিস্মিত অধ্যাপক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলেন সাগ্নিকের মুখের দিকে।

—অনীতাও ছেলেদের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে।

হলঘরে বজ্রপাত হলেও বোধহয় কিছু হতো না। সাগ্নিকের এই অদ্ভূত পাল্টা অভিযোগে একসঙ্গে সবাই চমকে উঠল।

অনীতার সুন্দর মুখ ক্রোধে আরক্ত হয়ে উঠল। সে রাগে কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়িয়ে বললে,—মিথ্যে কথা!

সাগ্নিকের ওষ্ঠপ্রান্ত একটুখানি ক্ষীণ হাস্যে রেখায়িত হয়ে উঠল। তার দৃষ্টিতে কৌতুক। সে পূর্ণদৃষ্টিতে অনীতার দিকে চেয়ে বললে,—আমি এখুনি প্রমাণ করে দেব, অনীতা দেবী। তার আগে আপনি প্রমাণ করুন, আপনি ছেলেদের দিকে না তাকিয়ে কি করে একেবারে প্রত্যক্ষ দেখলেন যে, ছেলেরা আপনার রূপসুধা পান করছে?

তুমুল হাস্যধ্বনি এবং বিজয়োল্লাসে যেন ফেটে যায় হলঘর। ক্লাস ওভার হলে সাগ্নিককে প্রায় কাঁধে করে নাচতে সুরু করে দিল ছেলের দল।

নির্বাক লজিকের অধ্যাপক। তিনি সেদিনটা শুধু মুখে রুমাল দিয়ে কেবলই হেসেছিলেন। আর যাকে সামনে পেয়েছেন তার সঙ্গেই গল্প করেছেন।

এই সপ্রতিভ ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করবার জন্য উস্‌-খুস্‌ করতে লাগল অনীতা। একদিন সে সুযোগ এলও।

এস্‌প্ল্যানেডের ট্রামে চলেছে সাগ্নিক্‌। হঠাৎ কন্‌ডাক্টর হেঁকে উঠল,—উঠুন বাবু। লেডিজ্‌ সিট।

শশব্যস্তে উঠে দাঁড়াল সাগ্নিক্‌। সে অবাক হয়ে দেখলে,

মহীয়সী লেডি আর কেউ নন, স্বয়ং অনীতা। সাগ্নিক্ পাশ কাটিয়ে সরে পড়তে পারলে বাঁচে—এমনি ভাব।

পালাবেন না, সাগ্নিক্ বাবু।—বললে অনীতা। তার কণ্ঠস্বরে সুন্দর মধুর আবেদন মাখান।

বিমূঢ় সাগ্নিক্ নিজের মূঢ়তা স্মরণ করে জড়সড় হয়ে যায়। লজ্জার প্রচণ্ড বাধা ঠেলে কোনরকমে বসে পড়ে মেয়েটির পাশে। তার হৃৎপিণ্ড দুরু দুরু করে। চলন্ত ট্রামে দ্বিধারা বেণী দুলে দুলে এসে সাগ্নিকের গায় যেন ছোবল মারে সাপের মত। চুলের মিষ্টি গন্ধ—অনুশোচনায় তীব্র বিষের জ্বালা ধরিয়ে দেয় মনের মধ্যে।

অনীতা সাগ্নিকের দিকে চেয়ে মুখ টিপে হেসে বললে,—ওমাঃ আপনি যে বড় ঘেমে উঠেছেন সাগ্নিক্ বাবু। সাগ্নিক সংকুচিত হয়ে ওঠে।

ও কিছু নয়।—সে রুমাল দিয়ে ললাটের ঘাম মুছে ফেলতে ফেলতে বললে।

অনীতা সাগ্নিকের এই সংকোচের কারণ অনুমান করে খুসী হয়ে উঠল মনে মনে। সেদিনকার ব্যাপারে ছেলেটির অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পেয়ে সে আরও খুসী হয়েছিল।

সত্যি, সেদিন আপনার সাক্ষ্য দেওয়ার অসাধারণ ভংগী ছেলে মেয়ে সকলের মনেই একটা খুসীর বন্যা বহিয়ে দিয়েছিল।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ আপনি দুপক্ষকেই সন্তুষ্ট করেছেন। আমি আমার

অভিযোগের কথা ভুলে গিয়ে কেবলই ভেবেছি কী আপনার অসাধারণ যুক্তি, হিউমার, অসাধারণ—

—প্রতিভা, বিদ্যা, বুদ্ধি। আরও যা যা গুণ মনে আসে বলে ফেলুন অনীতা দেবী।—সাগ্নিকের মন এতক্ষণে হাল্‌কা হয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।

অনীতা খিল খিল করে হেসে উঠে বললে,—সবতো আমি এখনো বলিনি। আপনিই তো বলে যাচ্ছেন।

—আপনার হয়ে আমিই না হয় বললাম

অনীতা এবার সাগ্নিককে খোঁচা দিয়ে বললে,—সেদিন আমার হয়ে বললে আজ হয়তো আপত্তি করতাম না।

সাগ্নিক্ অপ্রতিভ না হয়ে উত্তর দিল,—সেদিন আপনাদের হয়ে বলেছিলাম। এইমাত্র আপনি স্বীকার করেছেন, অনীতা দেবী।

অনীতা বললে,—আমি লজিক পড়বো আপনার কাছে। আসবেন আমাদের বাড়ী?

সাগ্নিক্ উত্তর দিল,—আপনার বাড়ী যেতে মোটেই আপত্তি নেই। কারণ মেসে হোষ্টেলে যারা থাকে তাদের কাছে গৃহস্থের নিমন্ত্রণ ভারী লোভনীয়। তবে আপনি কি করে ঠাওরালেন যে, আমি লজিকে মস্ত পণ্ডিত।—দু একটা হিউমার জানি বলে?

অনীতা নাছোড়বান্দা। লজিক পড়াতেই হবে। সাগ্নিক্ প্রথম বিভাগে লজিকে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছিল। সুতরাং অসংগত নয় অনীতার দাবী।

অপুত্রক অনীতার বাপ একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে মেয়েটিকে

মানুষ করেছিলেন। উচ্চশিক্ষা লাভ করে নিজের পছন্দে বিয়ে করবে, এই আশা মনের মধ্যে রেখেই অনীতার বাপ পরপারে পাড়ি দিলেন ইন্‌সিওরেন্সের কয়েক হাজার টাকা আর আরপুলি লেনে একখানা একতলা বাড়ী রেখে। অনীতার বাপের এই উচ্চাশায় বাদ সাধেন নি অনীতার মা।

অনীতার মার সস্নেহ মাতৃহৃদয় একান্ত মনে গ্রহণ করলে সাগ্নিক্‌কে। তিনি আপন মনেই বলে উঠলেন একদিন,—দিব্যি ছেলেটি। বেশ মানাবে অনীতার সঙ্গে।

অনীতার বাড়ী একদিনও না গেলে সাগ্নিকের সময় কাটে না। মাঝে মাঝে বাড়ী যাওয়াও ঘটে ওঠে না। মেসে আসা-যাওয়ার কোন গতিবিধি নেই। তাই সে কলেজ হোষ্টেল ছেড়ে উঠে এসেছে প্রাইভেট মেসে। ছন্নছাড়া জীবনে এমনি করে সাগ্নিকের হলো প্রথম পদক্ষেপ।

চব্বিশপরগণার বল্লভপুরের প্রতাপশালী জমিদার সাগ্নিকের বাপ। সহস্রাধিক একর জমা-জমির বিপুল সম্পত্তির একছত্র মালিক। সেই সম্পত্তির ভাবী উত্তরাধিকারী সাগ্নিক্‌।

সাগ্নিকের বাপ ওকালতিও করেন বারাসতে। তাঁর একান্ত ইচ্ছা, সাগ্নিক্‌ও তাঁর মত ওকালতি পাশ করে প্রজাদের মস্তক চর্বণ করবে এবং একদিন তাঁর আসন অধিকার করে লাঠি না ভেঙ্গে সাপ মারবে প্রচণ্ড প্রহারে।

সাগ্নিকের বিবাহে কি রকম মেয়ে ঘরে আনবেন, কত টাকা

নেবেন এবং সুদশুদ্ধ কত সংখ্যায় গিয়ে দাঁড়াবে, তার একটা হিসাব তিনি মনে মনেই এঁচে রেখেছিলেন।

এতবড় একটা উচ্চাশা। তার ওপর সাগ্নিক্ মাতৃহীন। সুতরাং ছেলের কোন অভাবই রাখেন নি। সাগ্নিকের নামে ব্যাংকে মোটা টাকা, একটা বুইক্ গাড়ী—সবই দিয়েছিলেন।

ইদানীং সাগ্নিকের বাড়ী যাতায়াত ছিল না। সাগ্নিকের বাপ চিঠি দিয়েও উত্তর পেতেন না। তবে একটী খবর তিনি পেতেন; সাগ্নিক্ পরীক্ষায় কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। আর কোন দোষ তিনি গ্রাহ্য করেন না। কারণ, সে সব দোষ যদি আসে, সেগুলো জমিদার সুলভ।

লজিকের পাতায় পাতায় ফেরে অনীতার দুষ্টুমি ভরা চোখ। লজিকের একটা দূরূহ মীমাংসা বোঝাতে বোঝাতে বক্ বক্ করে বকে যায় সাগ্নিক্। অনীতা মুখ টিপে হাসে।

—তুমি কিছু শুনছ না, অনীতা।

উঁহু!—অনীতা সরে এসে সাগ্নিকের সঙ্গে নিবিড় হয়ে বসে লাস্য ভংগীতে।

—তবে আমি আর পড়াব না।

অনীতা দুহাত জোড় করে ভ্রু দুটি নাচিয়ে বলে উঠল,—জো হুকুম!

—তবে আমি আসব না তো?

আবার দুষ্টুমির হাসি এসে বললে অনীতা,—পড়াবার জন্যেই যদি এখানে আসা—আর কোথাও যাওয়া হয় না কেন পড়াতে?

সাগ্নিক্ বললে,—আর কাউকে পড়াতে ভাল লাগে না, শুধু তোমাকে ছাড়া।

—আমারও পড়তে ভাল লাগে না।

—তবে কি ভাল লাগে ?

—গল্প শুনতে।—বলে অনীতা সটাং শুয়ে পড়লো সাগ্নিকের কোলের ওপর মাথা রেখে।

অনীতার লজিক পড়া শেষ হয়ে গেল সেইদিন থেকে। তাব বদলে গল্প-গুজব হয়, না হয় সিনেমায় যায় সাগ্নিকের বুইক্ গাড়ীতে—তার পাশে বসে।

—আজ আর সিনেমায় যাব না। বেড়িয়ে আসি চল সাগ্নিক্দা। সাগ্নিকের গা ঘেঁসে মিহি গলায় বললো অনীতা। সাগ্নিকের বুইক গাড়ীখানা রূপবাণীর সাম্নে না থেমে সটাং শ্যামবাজারে এসে ট্রাংক রোড ধরলো।

সাগ্নিকের গাড়ী ছুটেছে তীরবেগে ছুটেছে হাওয়ার মত ছুটেছে।

অনীতা সাগ্নিক্কে জড়িয়ে ধরে ভয়ে চোখ বুজিয়ে বললে,—অ্যাক্সিডেণ্ট করে বসবে যে সাগ্নিক্দা।

সাগ্নিকের দৃষ্টি সম্মুখে। হাত দুটি ষ্টিয়ারিংএ। গতি আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে মৃদু হেসে সে বললে,—ক্ষতি কি? পাশাপাশি আমাদের নিয়ে যাবে হাসপাতালে।

অনীতা সকৌতুকে বললে,—হাসপাতালে কিম্বা বেহেস্তে তার ঠিক কি ?

—নরকেও হতে পারে।

এমনি টুকরো-টুকরো কথায় সাগ্নিকের গাড়ী বারাকপুর চলে এল। বারাকপুর লেভেল ক্রসিং গেটে মোড় ঘুরিয়ে বারাসাত রোড ধরে ছুটে চললো।

গাছের আড়ালে তখন সূর্যের অর্ধেক ডুবে গেছে। দীর্ঘ ছায়ায় ঢেকে গেছে পথ, ঘাট, মাঠ। দূর গ্রামের আড়ালে গোধূলির রক্তাভা। আকাশ পথে সার দিয়ে উড়ে যায় বলাকা।

অনীতা বললে,—এইখানে থাম। চল মাঠে বেড়িয়ে আসি।

সাগ্নিক্ গাড়ীখানা থামিয়ে একপাশে রাখলে। তারপর তারা মাঠে নেমে এগিয়ে চললো

আলের ওপর দিয়ে চলতে চলতে অনীতা মুখখানি বিকৃত করে বললে,—ওরে বাবা! তার চেয়ে রাস্তায় ওঠো সাগ্নিক্‌দা।

সাগ্নিক্ হেসে বললে,—মাঠে না বেড়ালে পল্লী সৌন্দর্যের কতটুকু দেখলে অনীতা।

অনীতা ঠোঁট ফুলিয়ে বললে,—তাই বলে কি হাত পা রক্তাক্ত করতে হবে?

সাগ্নিক্ আবার হাসলে। সে বললে,—সে দোষ তো আমার নয় অনীতা। তুমিই মাঠে নামতে চেয়েছিলে।

তারপর কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটতে হাঁটতে অনীতা বারাসাত রোডের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললে,—ঐটেই তো তোমার বাড়ীর রাস্তা?

—হ্যাঁ। যাবে আমার বাড়ী?

—জানি না। লজ্জায় চোখ ফিরিয়ে নেয় অনীতা। এক মধুর কল্পনায় রক্তিম হয়ে ওঠে দুটি গোলাপী অধর।

বোধহয় এই দুটি তরুণ-তরুণীর কলরব শুনে পশ্চিম আকাশে জমাট বাঁধতে লাগল কয়েক টুকরো কালো মেঘ। মেঘের আড়ালে হুংকার করে উঠল কোন্ অদৃশ্য দানব।

সাগ্নিক্ বললে,—এবার ফেরা যাক অনীতা। এখুনি ঝড় উঠবে।

অনীতা বললে,— হ্যাঁ। চল সাগ্নিক্দা।

অন্ধকারে আর ঠিক তেমন সাবধানে পা ফেলতে পারে না অনীতা। হঠাৎ সে হোঁচট খেলো। টাল সামলাতে না পেরে পড়ে গেল একেবারে সাগ্নিকের গায়ের ওপর।

কি উত্তাপ অনীতার দেহে। মনে হলো সাগ্নিকের সর্বাংগ পুড়ে গেল। সে অশান্ত আবেগে তার মুখখানা নিজের বুকে চেপে ধরলো।

অনীতা নিজেকে ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে বললে,—দু এক ফোঁটা গায়ে পড়লো যে সাগ্নিক্দা।

ছুটতে ছুটতে গাড়ীর মধ্যে যখন তারা এসে বসলো, তখন দুজনেই ভিজে নেয়ে উঠেছে। সাগ্নিক জামাটা গা থেকে খুলে ফেললে।

কী করবে অনীতা? একেবারে ভিজে সপ্ সপ্ করছে। টুপ্ টুপ্ করে চুল থেকে পড়ছে জলের ফোঁটা গুলো।

সাড়ীর পাড় দিয়ে জল টোপাচ্ছে অজস্র। জলের মধ্যে দ্বিধারা বেণী জেগে আছে ছুটি বারিস্নাত কৃষ্ণ-দ্বীপের মত। বাইরে জমাট অন্ধকারে প্রলয়ের তাণ্ডব চলেছে যেন। অসীম প্রাণীহীণ অন্ধকারে একটি আলোকিত ক্ষুদ্র পুরীর মধ্যে মুখোমুখি হয়ে জেগে আছে ছুটি নর এবং নারী।

কী সুন্দর অনীতা। সৌন্দর্যের এমনি মধুর অপার্থিব নগ্নতা আর কখনো পড়েনি সাগ্নিকের চোখে। ভিজে সাড়ী দেহের সঙ্গে লেপ্টে গিয়ে ভাঁজে ভাঁজে ফুটে ওঠে দেহের গাঢ় রং। বিদ্যুতের আলোয় ঝিকিমিকি করে উত্তাল সাগরিকার প্রান্তে ফুটন্ত স্পন্দিত ছুটি দিগ্বলয়।

সাগ্নিক সস্নেহে কাছে টানে অনীতাকে। অনীতা হেলে পড়ে সাগ্নিকের গায়ে।

ভীষণ ঝড় আর প্রকৃতির তাণ্ডব। সেই তাণ্ডবে নটরাজ জেগে উঠেছে আদিম কামনায়, দুর্বার ক্ষুধায়। অসংখ্য চুম্বনে ঝরে পড়ে রাশি রাশি পুষ্প। অশান্ত কামনায় দলে পিষে সমভূমি হয়ে যায় বুঝি ছুটি গোলাকার মহাদেশ। নটরাজের প্রলয় নৃত্যে তোলপাড় হয়ে যায় সাগরিকা। কেঁপে ওঠে সৈকত ভূমি। আগ্নেয় গিরির উত্তপ্ত লাভাপ্রবাহ টগবগ করে ফুটে ওঠে। লাভাস্রোতের বিগলিত ধারা উদগ্র কামনায় প্রবাহিত হয়। তার প্রচণ্ড সংঘাতে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে মনোরম পার্বত্য অধিত্যকা।

কখন থেমে যায় প্রকৃতির তাণ্ডব। স্তব্ধ হয় নটরাজ। প্রকৃতি ঘুমের ঘোরে ঢলে পড়ে।

সাগ্নিকের কাছে সেই একটি রাত্রি এসেছিল সৌভাগ্যের এক মধুর সম্ভাবনা নিয়ে। তারপর—

তারপর সব ওলট পালট হয়ে যায়। পৃথিবীর মানচিত্রের রংটুকু পর্য্যন্ত পাল্টে যেতে লাগল।

অনীতার মা ওপারের ডাক শুনে চলে গেলেন। সাগ্নিকের বাপ কঠোর স্বরে বললেন, অনীতার সংস্পর্শ ত্যাগ না করলে তিনি সাগ্নিক্‌কে ত্যজ্য পুত্র করবেন। উপরন্তু তিনি অনীতার বাড়ী বয়ে গিয়ে তাকে দুটো শক্ত কথাও শুনিয়ে দিয়ে এলেন।

তারপর সাগ্নিক্ শুনলে অনীতা ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে চাকরী নিয়েছে। বোম্বায়ে আছে।

আর একদিন শুনলে, অনীতারা জাহাজে সাগর পারের কোন্ দূর রণাঙ্গনে পাড়ি দিয়েছে। তারপর নিজেও সার্ভিস ফোর্সের রিক্রিয়েশন পার্টিতে ঢুকে অর্ধেক পৃথিবী ঘুরে বেড়িয়েও সন্ধান পায়নি অনীতার।

অনীতাকে সাগ্নিক্ ভালবাসে এখনো। তাবলে চরিত্রের কুসংস্কারের শৃংখল গলায় ঝুলিয়ে সৌন্দর্যের উপাসনা করতে সে ছাড়বে কেন?

ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের মহিষী ছাড়াও তাঁদের যৌবনের কুঞ্জবনে এসে ভীড় করেছিলেন নেল, ডাচেস্ অফ্ ক্লেভ্‌ল্যাণ্ড ও ডাচেস্ অফ্ পোর্টস্ মাউথ্।

সম্রাট নেপোলিয়ঁর ভগ্নী পলিনের নগ্ন সৌন্দর্য্য ক্ষুধিত ভাস্কর ক্যানোভার আদর্শ।

দার্শনিক ডায়োজেনেসের বাণীকে সে আজ করেছে তার

জীবনের মূল মন্ত্র,—অতীতকে মুছে ফেল—ভবিষ্যৎকে ভুলে যাও—বর্ত্তমানকে উপভোগ কর।

বেদুইন মেয়েদের ডাগর আঁখির স্বপ্ন-পারিজাত আচ্ছন্ন করে রেখেছে সাগ্নিক্‌কে। তাকে বিহ্বল করে রেখেছে।

লক্‌লকে আগুনের মত মেয়েটি ময়াল সাপের মত সাগ্নিক্‌কে বেষ্টন করে আছে। নিঃশ্বাসে তার তীব্র কাল কূট। সৌন্দর্যে বহ্নির উত্তাপ। সাগ্নিকের ইচ্ছা হয় স্পর্শ করে, কিন্তু হাত সরিয়ে নেয়।

খিল্ খিল্ করে হেসে ওঠে যাযাবরী।

সাগ্নিকের ছন্নছাড়া যাযাবর জীবনে এই যাযাবরীর মিলন বিধাতার নির্দিষ্ট কি এক অদ্ভুত যোগাযোগ।

লিবিয়া মরুভূমির একপ্রান্তে হালুয়ান পর্ব্বতের পাদদেশে এক খর্জুর কুঞ্জের ধারে বেদুইনদের তাঁবু পড়েছে।

নওয়ারা একদিন সাগ্নিককে ধরে বসলো,—চলুন, আমরা হেলিওপেলিস্ বেড়িয়ে আসি। নতুন তৈরী হচ্ছে সহরটা।

আতংকে চমকে উঠল সাগ্নিক।—না—না, আর কোথাও যাবনা। এমনি করে প্রকৃতির কোলে মরুভূমির মধ্যে তোমাদের সঙ্গেই ঘুরে বেড়াব।

নওয়ারা অবাক হয়ে গেল।—তবে যে আপনি বললেন, মিশরে এসেই কাজে যোগ দেবেন?

—আমি মত বদলেছি। সে যাই হোক্, আমি চলে গেলে তুমি খুসী হও, নওয়ারা?

নওয়ারা বিষণ্ন হয়ে উত্তর দিল,—সে কথা আমরা বলেছি কোন দিন ?

—আমি থাকলে খুসী হও ?—সাগ্নিক ব্যাকুল ভাবে চাইলে প্রাণের প্রাচুর্যে উচ্ছল যাযাবরীর দিকে।

নওয়ারা খুসীতে নেচে ওঠে।—হ্যাঁ হই।

—তবে থাকবো।

—সহরে যাবেন না কেন, মুসাফির? আমরা কি সহরে যাইনা? মানুষের সঙ্গে মিশিনা? সাগ্নিক্ ভাবলে কি করে বোঝাবে তার মনের কথা এই নির্বোধ মেয়েটীকে। এরাতো সভ্যতার গরল কোনদিন পান করেনি! এরা সমাজের বাইরে।—সভ্যতার বাইরে। আদিম প্রবৃত্তি করে এদের চলনা। তাই লুঠপাট করে, হত্যাকাণ্ড করে, বেশ নিঃশংকে সহরে ঢুকে মানুষের সংগে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা কয়ে আবার ফিরে আসে অসভ্য আবাসে।

সাগ্নিক তা তো পারেনা। যে যে সমাজের, সেই সমাজের তথাকথিত সভ্য মানুষ তাদের অসভ্য প্রবৃত্তির উগ্রতাকে ঢেকে রেখেছে সভ্যতার ছদ্ম আবরণে। অসভ্য বেদুইন দস্যু যা করে, তাকে সভ্য মানুষ বলে বসে অপরাধী, কিন্তু তারও আদিম প্রবৃত্তি তাকে আকর্ষণ করে সেই অপরাধই করতে। সুযোগ পেলে লোক চক্ষুর অন্তরালে সেও সেই অপরাধই করে বসে—প্রবৃত্তির বশে। সাগ্নিক্ ভাবে, সে এই অসভ্যদের সঙ্গে মিশে আছে সভ্যতার মুখোস খুলে। কী করে সে পরবে আবার সেই পরিত্যক্ত মুখোস।

তাছাড়া কি করে সে বোঝাবে এইযাযাবরীকে যে, ক্যাম্পে ফিরে গেলে মার্কিণ সৈন্যদের খুন করার ব্যাপারে হয় এই অপরাধ তার নিজের কাঁধে চাপবে, নাহয় তাকে জড়িয়ে পড়তে হবে বেদুইনদের সংগে শত্রুতায়।

সাগ্নিকের চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে মায়া হলো নওয়ারার। সে বললে,—তবে থাক্ মুসাফির। যেতে হবেনা সহরে।

এমনি করে কিছুদিন যায়। আর সহরে যাবার কথা তোলেনা নওয়ারা।

প্রায়ই শোনা যায় বোমারু বিমানের গোঁ-ও-ও, গোঁ-ও-ও শব্দ। কানে আসে মোটরের হর্ণের আওয়াজ। হয়তো বা বিরাট এক ঝাঁক বিমানের ছায়া পড়ে তাঁবুর ওপর। সাগ্নিক্ ভয়ে তাঁবুর মধ্যে লুকোয়। মানুষকে ওর এত ভয়।

সেদিন মোটরের আওয়াজ শুনে তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল সবাই। এবার নওয়ারা সাগ্নিককে টেনে বার করে নিয়ে এল জোর করে।

জীপ—একখানা! ইঞ্জিন গর্জন করে বন্ধ হয়ে গেল ঠিক তাঁবু-গুলোর কাছে এসে। গাড়ী আর চলে না।

গাড়ীর ড্রাইভার মার্কিণ। অনাবৃত বক্ষে রোদে পুড়ে গলদ-ঘর্ম হয়ে অনেক চেষ্টা করলে ইঞ্জিনের গলদ ধরবার; কিন্তু ব্যর্থ হলো সব।

আনাড়ি ড্রাইভার। বোধ হয় ট্রেনিং শেষ হতে না হতেই বেকারত্ব ঘুচিয়েছে যুদ্ধে যোগ দিয়ে। দুর্গম পার্বত্য পথে মরুপথে কিম্বা সহরের যানবাহনবহুল রাস্তায় ভারী ভারী

ট্রাক্ চালিয়ে হাত পাকাচ্ছে, নাহয় অনেকগুলো প্রাণীকে সংগে নিয়ে চলে যাচ্ছে একেবারে ভবপারে। বিমানেও তাই। সাগ্নিক্ কি ভেবে লম্বালম্বা পা ফেলে এগিয়ে গেল ড্রাইভারের দিকে।—আমি কি ইঞ্জিন দেখতে পারি ?—বললে সাগ্নিক্।

মার্কিণ ড্রাইভার সাগ্নিকের রুক্ষ চুল এবং নোংরা চেহারা দেখে অবিশ্বাসের হাসি হেসে সম্মতি দিয়ে সকৌতুকে তার কার্য্য কলাপ দেখতে লাগল।

সাগ্নিক্ পেট্রোল ট্যাংকের আবরণ উন্মোচন করে পুংখানুপুংখ রূপে পরীক্ষা করলো।

পেট্রোল পাশ করছে না। সে যন্ত্রটি ঠিক করে দিল অপূর্ব কৌশলে। তারপর হ্যাণ্ডেল ঘোরাতেই ইঞ্জিন গর্জে উঠল। গীয়ার আর্ত্তনাদ করে উঠল।

মার্কিণ ড্রাইভার আনন্দে আত্মহারা হয়ে সাগ্নিকের সংগে কর-মর্দন করে বললে ;—আশ্চর্য! তোমাদের সঙ্গে সভ্যতার পরিচয় আছে, তবু তোমরা অসভ্য বনে' বেড়াও কেন ?

সাগ্নিক্ ভাবলে বলে,—বন্ধু! তোমাদের সভ্যতার চরম তো দেখেছি। দেশে-বিদেশে, জাহাজে-বিমানে। তোমরা বেশ্যালয়ে ভীড় জমাও। অসভ্য উল্লাসে অসভ্যদের ছাড়িয়ে যাও। তুলনা কোথায় তোমাদের ?

সাগ্নিকের হয়ে সৌকত উত্তর দিল। সে ক্রুদ্ধ গর্জনে হেঁকে উঠল,—বেইমান! পিয়াস্তা।

মার্কিণ বীরপুরুষটি অনেকদিন হলো মিশরে এসেছে। সে

খুব ভাল করেই জানে এই বেতুইনদের।—আর দ্বিতীয় বাক্যব্যয় না করে সৌকতের হাতে কয়েকটি মিশরীয় মুদ্রা গুঁজে দিয়ে জীপ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

একদিন বেদুইন উম্‌দা সাগ্নিককে বললে,—ক্যাম্পে যাবেনা হিন্দী? আমরা তো কায়রোর কাছে এসে পড়েছি।

সাগ্নিক্ ঘাড় হেঁট করে বললে,—বিশেষ ইচ্ছে নেই।—বেদুইন দস্যু ইরাকী সিগারেট টেনে একমুখ ধোঁওয়া ছেড়ে বললে,—সেতো খুব ভাল কথা। ওরা ডাকাতি করছে। আমাদের চেয়েও বড় ডাকাত। ওদের মধ্যে মায়া নেই দয়া নেই।

সাগ্নিক্ বেদুইন দস্যুর কথায় সায় দিয়ে বললে,—সেই কথাই বলছিলাম সেদিন নওয়ারাকে। ঐসব অসভ্যের দল সভ্যতার মুখোস পরে মানবতার ভান করছে। দেশে এনেছে দুঃখ দারিদ্র, দুর্ভিক্ষ, নির্ম্মম হত্যাকাণ্ড। শান্তির নামে অশান্তির বহ্নি জ্বলে উঠেছে দাউ দাউ করে।

নওয়ারা মুগ্ধ দৃষ্টিতে সাগ্নিকের উজ্জ্বল চক্ষু দুটির পানে চেয়ে বল্‌লে,—এ অশান্তি কি যাবেনা, মুসাফির?

সাগ্নিক্ আবেগকম্পিত স্বরে বল্‌লে,—যাবে। যদি সভ্য-জগৎ এখনো লুটিয়ে পড়ে হিন্দুস্থানের অর্ধনগ্ন ফকিরের পায়ে।—কিন্তু এরা যীশুর-মত সেই ভগবানের দূতকে নির্যাতন করেছে। তাঁকে বন্দী করে রেখেছে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্ঠে।—এই জঘণ্য অপরাধের প্রতিফল পেতেই হবে, আপনাকে বলে রাখলাম উম্‌দা। ইহুদীর মত মহাত্মা গান্ধীর

নির্য্যাতনকারীদেরও একদিন বিশ্বের অভিশাপ কুড়োতে হবে।

উম্‌দা কিছুক্ষণ ঘাড় হেঁট করে কি ভাবলে।—তারপর বল্‌লে,—ক্যাম্পে না যাওতো, কিছু জমিজমা নিয়ে চাষ-বাস করনা।

নওয়ারা হাসতে হাসতে বল্‌লে,—ক্যাম্পে যাবার পথে মুসাফিরের নাকি মুস্‌কিল আছে। ভা—রী মুস্‌কিল।

—কী মুস্‌কিল? ভ্রুকুঞ্চিত করে বল্‌লে উম্‌দা।

—যদি ফাঁসি দেয়!—হেসে গড়িয়ে পড়ে নওয়ারা।

তারপর নওয়ারার সব কথা শুনে উম্‌দা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইলে সাগ্নিকের দিকে। প্রায় নিঃশেষিত জ্বলন্ত ইরাকী সিগারেটটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে গম্ভীর স্বরে বল্‌লে,—বেদুইনের মুখে এই কথা শুনলে তার প্রাণ থাকতানা এতক্ষণ।—মরণকে এত ভয়?

সাগ্নিক শিখায়িত অগ্নির মত শির উন্নত করে দৃপ্তস্বরে উত্তর দিল,—প্রাণের ভয় থাকলে অনন্তে ঝাঁপিয়ে পড়তামনা আপনাদেরই মত—যাযাবর হয়ে! আমার শুধু এই ভয় যে, প্রাণদাতার সঙ্গে শেষে শত্রুতায় না জড়িয়ে পড়ি।

সৌকত বল্‌লে,—পল্টনরা জানেইনা যে, তোমাদের প্লেনখানা কোন জায়গায় পড়েছে। সে ভাবনা করোনা হিন্দী। ইচ্ছে হয়, ক্যাম্পে ফিরে যেতে পার নির্ভয়ে।

তারপর পুরোণ একটা খবরের কাগজ নিয়ে এসে মসৃণ করতে

করতে বল্লে, বিখ্যাত মিশরীয় কাগজ এটি। আল্—আহরাম্। শোন কি লিখেছে সেদিনকার ব্যাপারে।

সে কাগজখানির ওপর চোখ রেখে ইংরেজীতে তর্জমা করে যেতে লাগল। তার সার মর্ম্ম এই ঃ—বিমানখানি জার্মাণ গোলায় ঘায়েল হয়ে আটলান্টিকে ডুবে যায়। মনে হয়, হতভাগ্য যাত্রীদের সলিল সমাধি হয়েছে, কিম্বা তারা জীবিত আছে জার্মাণদের যুদ্ধবন্দী হয়ে। আরোহীদের মধ্যে সাগ্নিকের নামও পড়ে গেল বেদুইন দস্যু।

সাগ্নিক উল্লাসে প্রায় চীৎকার করে উঠল,—এতদিন পরে আপনার হাতে কাগজখানা কি করে এল উম্‌দা?

উম্‌দা বল্লে,—অনেকদিন আগে আমার নিজের তাগিদেই এখানা যোগাড় করেছি। তোমারও যে তাগিদ্ আছে, তাতো জানতাম না!

সাগ্নিক আনন্দে গদ্‌গদ্ হয়ে বললে,—বলেন কি উম্‌দা? সাহারার নাম পর্য্যন্ত করেনিযে!
উম্‌দা বল্লে,—তাইতো দেখ্‌ছি কাগজে।

তারপর সে সাগ্নিকের পিঠ চাপড়ে বললে,—আমার মতে মরদের মতো চলে যাও ক্যাম্পে। পাওনা টাকাগুলো নিয়ে আবার সটাং চলে এস এখানে। আমি জমিজমার ব্যবস্থা করে দেব।

—অর্থ? হ্যাঁ, তারও তো প্রয়োজন। যাযাবর হলেও এতো

প্রস্তর যুগ নয়।—দূর দিগন্তের দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে রইল সাগ্নিক্।

কায়রো তাকে হাত ছানি দিয়ে ডাকছে।—আর এদিকে বেদুইন মেয়ের বন্ধন।

———

(চার)

পর্বত, মরুভূমি এবং জলধারার একত্র সমাবেশ ঃ

নীলনদের এপারে কায়রো আর ওপারে গীজাপাহাড়। গীজাপাহাড়ের অধিত্যকার ওপর মিলিটারী ক্যাম্প। শিবিরের পর শিবির। যতদূর দৃষ্টি যায় শুধুই শ্বেত বস্ত্রের শুভ্র আচ্ছাদন।

গীজাপাহাড় চলেছে আসমারা, আস্সুদ আসোয়ান পর্য্যন্ত।— চলেছে মিশরের মেরুদণ্ড ছুঁয়ে ।

সাগ্নিক গীজাপাহাড়ে মীনা শিবিরে এসে তার পার্টিতে যোগ দিল পরিচয় পত্র দেখিয়ে।

চতুর বাঙ্গালীর মুখে চাতুর্যপূর্ণ ভাষায় আরব্যোপন্যাসের মত লোমহর্ষণ কাহিনী শুনে সবাই রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

সুদক্ষ অভিনেতার মত নানা অংগভংগী করে বিশদ বিবরণ দিয়ে চললো, কি করে শত্রুর গোলা অগ্রাহ্য করে অবশেষে শত্রুর হাতেই বন্দী হয়েছিল সাগ্নিক্। চোখের সামনে সে দেখলে মার্কিণ সৈন্যদের লবণাক্ত তরংগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে অতলে তলিয়ে যেতে। তারপর একদিন শত্রুর কবল থেকে পালিয়ে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চলতে চলতে সে সাহারায় এসে পড়ে ঘটনা-চক্রে বেদুইনদের সঙ্গে মিশে উষ্ট্রারোহণে অবশেষে মিশরে আসতে সক্ষম হয়।

মীনাশিবিরে সাগ্নিক্ অভিনন্দিত হলো। তার দুর্জয় সাহসের

কাহিনী লোকের মুখে মুখে কীর্তিত হলো। মিলিটারী গেজেটের বিশেষ সংখ্যায় মিঃ এস্, রায়ের বীরত্বের কাহিনী বলিষ্ঠ লেখনীতে প্রকাশ করে অন্যান্য হতভাগ্যদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হলো।

মীনা শিবিরে এসে একদিক দিয়ে সাগ্নিক স্বস্তি পেয়েছে। আত্মপ্রচারের গৌরবময় পরিণতি দেখে বুকখানা ফুলে ওঠে। তবু এই মানুষের কলরবের মধ্যে সাগ্নিকের বুকখানা যেন এক একবার মোচড়ও দেয় কিসের অভাবে। তার চোখ দুটো করুণ হয়ে ওঠে কিসের ব্যথায়।

দিক্চক্রবালে দেখা যায় হালুয়ান পর্বতমালার অস্পষ্ট কৃষ্ণ রেখা। ঐ কৃষ্ণ রেখার নীচে অসংখ্য অদৃশ্য লোমের তাঁবু। তার মধ্যে এক রহস্যময়ী নৃত্যশীলা মরু-বালিকা। সাগ্নিকের বিরহ-ক্লিষ্ট মন ছুটে গিয়ে সেই তন্বীর কৃষ্ণবসন চুম্বন করে।

যাযাবর দস্যুরা অর্থের জন্য সব পারে। তারা একদিকে যেমন আশ্রিত-বৎসল, আর একদিকে অর্থের জন্য মানুষ খুন করে জল্লাদের মত। মেয়েরা দেহ দান করে নির্বিচারে।

সাগ্নিক এই যাযাবরীদের ভীড় করতে দেখেছে মীনা শিবিরের আশে পাশে। কুৎসিৎ নিগ্রোদের ক্ষুধিত বাহুপাশে আত্মদান করতে এতটুকু বাধেনি।

সাগ্নিকের ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি তাদেরি মধ্যে খুঁজে বেড়ায় একটা অতি পরিচিত মুখ। —নাঃ আভিজাত্য বোধ সম্পন্না সেই সম্রাট

ছুম্বিতো এদের অনেক ঊর্ধে। অনেক—অনেক।—সাগ্নিক্ একটা আরামের নিঃশ্বাস ফেলে,—আঃ!

গীজা পাহাড়ের শিলাখণ্ডে সারেংগী নিয়ে বসলো সাগ্নিক।

নিঝুম, নিস্তব্ধ—চারিদিক। অস্তমিত সূর্যের শেষ আভা আকাশে এক আঁজলা রং ছড়িয়ে দিয়েছে। দিনের শেষ আলো গাছের পাতার ওপর, পীরামিডের শীর্ষে, মহম্মদ আলি-পাশার মসজিদের চূড়ায়—শেষ রশ্মির চুম্বন এঁকে দিয়েছে। নীল নদ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরংগ তুলে সুনীল আকাশ স্পর্শ করে এক হয়ে গেছে। পালতোলা নৌকোগুলো আকাশরহস্যের সন্ধানে তর্ তর্ করে নদী বেয়ে চলেছে।

সারেংগী বেজে উঠল। বেদনায় কেঁদে উঠল। লঘু হস্তের অঙ্গুলির পীড়নে সারেংগী বেজে উঠল আর্ত ক্রন্দনে। সুরের করুণ ঝংকার বায়ুস্তরে ভেসে চলে নীল নদের তরংগের ছন্দে ছন্দে।

সুরের সমাচার পাঠিয়ে দিয়ে কখন তার মাতাল মন তাকে একেবারে টেনে নিয়ে এল হালুয়ান পাহাড়ের পাদদেশে।

আবিষ্টের মত জীপ থেকে নেমে সে একেবারে সাদা পোষাকে দাঁড়াল নওয়ারার সামনে।

নওয়ারার কাছে অদ্ভুত ঠেকলো বাঙালীর পোষাক। সাগ্নিকের গিলে করা মিহি পাঞ্জাবী দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল।—এই কি হিন্দীদের পোষাক মুসাফির? একেবারে মেয়ে সাজ সেজে এসেছো যে!

সাগ্নিক্ হেসে বললে,—এই সাজই আমাদের দেশে প্রেরণা দেয়। এই সাজেই আমাদের দেশের লোক উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়েছিল দিগ্বিজয় করবার জন্য। এই সাজেই—

—আমাকে জয় করতে এসেছ মরুসমুদ্রে ঝাঁপদিয়ে।—কি বল মুসাফির?—সাগ্নিকের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে হাসতে হাসতে বলে উঠল নওয়ারা।

সাগ্নিক্ বললে,—যদি বলি, হ্যাঁ তাই।

নওয়ারা লাস্য ভংগীতে উত্তর দিল,—আমি বলবো, তবে এতদিন ভুলে—ছিলে কি ক'রে?

সাগ্নিক্ লজ্জিত হয়ে বললে,—সত্যি বলছি নওয়ারা, তোমার হাতের আরবী মদের বিরহে ছট্‌ফট্ করছিলাম এতদিন।

—কিসের নেশা চলতো?

—কখনো স্যাম্পেন কখনো হুইস্কি।

বিলিতী মদের নামে নওয়ারার ভ্রু-ছুটি আনন্দে নেচে উঠল। সে অনুনয়ের সুরে বললে,—একদিন স্যাম্পেন খাওয়াবে মুসাফির? অনেকদিন খাইনি।

সাগ্নিক্ আনন্দে স্বীকৃত হলো। এবার যেদিন আসবে, সে নওয়ারার জন্যে স্যাম্পেন নিয়ে আসবে।

নওয়ারা খুসী হয়ে চলে গেল। একটু পরে আঙুরের রসে কাফির আরক তৈরী করে নিয়ে এসে সাগ্নিকের মুখে ধরে বললে,—খাও।

অনেক দিনের দুর্বার তৃষ্ণা। সত্যি অনেকদিন সে স্বাদ খায় নি নওয়ারার হাতে। সবটুকু খেয়ে ফেললে একনিঃশ্বাসে। লোমের কম্বলের ওপর বসে সৌকত, নওয়ারা আর সাগ্নিক্। তাদের মাঝখানে সুরুয়া পরিপূর্ণ বৃহদাকার একটি পাত্র। আর এক পাশে কয়েকটি পাত্রে দুম্বার মাংস, খুব্জ রুটি, সেলাড, পিঁয়াজ, খেজুর, কলা, আঙুর। আর কয়েকটি পাত্রে আরবী-সুরা।

সৌকত এবং নওয়ারার সংগে সংগে সাগ্নিক্ও বেদুইনদের প্রথামত একখণ্ড মাংস দাঁতে কামড়ে একটা টুকরো সুরুয়ার মধ্যে ফেলে দিল। তারপর সুরুয়ার মধ্যে হাত ডুবিয়ে অনুমানে নিজের খানা তুলে নিল প্রত্যেকেই।

আগে আগে এরকম খানাপিনায় ভারী ঘেন্না হতো সাগ্নিকের। এখন খুব ভাল লাগে।—বিশেষতঃ—নওয়ারার সঙ্গে বসে খানা-পিনা করতে।

খেতে খেতে সৌকত বললে,—কি ঠিক করলে হিন্দী? মীনা শিবিরে থাকবে, না ছেড়ে দেবে?

সুরুয়া মিশ্রিত একখণ্ড দুম্বার মাংস খুব্জ রুটির সঙ্গে গালে পুরে দিয়ে বললে সাগ্নিক্,—কাজ ছেড়ে দেব নিশ্চয়ই। তবে টাকা-কড়ি যে পাইনি এখনো।

সাগ্নিকের কথায় অবাক হয়ে যায় উম্দা। তার জামার আস্তিন খসে পড়ে যায় সুরুয়ার ওপর। ধীরে ধীরে আস্তিন গুটিয়ে

ভ্রু-কুঞ্চিত করে বললে বেদুইন দস্যু,—আচ্ছা বেইমান্ তো! খাটিয়ে নিয়ে টাকা কড়ি দিতে চায় না?

সাগ্নিক্ হেসে উত্তর দিল,—তা নয়। রেকর্ডের পাত্তা নেই।—আর তাছাড়া—মরা মানুষ ফিরে এলে চমকে ওঠাতো স্বাভাবিক উম্‌দা। বিশেষেতঃ যদি সে পাওনা দাবী করে বসে।

উম্‌দা হেসে বলে,—তা বটে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবেই খানা-পিনা হতে লাগল। স্তব্ধতা ভেঙ্গে উম্‌দা বলে উঠল আবার।

সে স্নিগ্ধস্বরে সাগ্নিক্‌কে বললে,—যদি তোমার আটকায়, আমার কাছ থেকে নিতে পার।—আবার পরে দিয়ে দেবে, কি বল?

সাগ্নিক্ উম্‌দার কথায় কৃতজ্ঞতায় গলে গেল। তেমনি কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে সে চাইল নওয়ারার দিকে।

—আপনাদের মেহেরবাণী ভুলবো না জীবনে। এখন আমার দরকার নেই কিছু। মীনা শিবিরে ডাঃ ব্যানার্জি আমায় কর্জ দিয়েছেন। এই সব হিন্দী পোষাক তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছি আমি।

সৌকত বললে,—বেশ। সুবিধে হলেই চলে এস। এবার আমরা তান্‌তায় যাব। তুমিও সেখানে নীলের খাঁড়ির পাশে ভাল জমি নিয়ে ফিলাহিন্‌দের সংগে চাষ-বাস সুরু করে দাও।—বড়লোক হয়ে যাবে হিন্দী।

বঙ্কিম কটাক্ষে সাগ্নিকের দিকে একবার চকিতে চাইল নওয়ারা।

তারপর মুখ টিপে বললে,—বড়লোক হলে আমাদেরই লাভ। আমরা লুঠ-পাট করতে পারব।

সৌকত একটু হেসে উঠে পড়লো। তারপর বাইরে চলে গেল হাত ধুতে।

উম্‌দা চলে যেতেই সাগ্নিক্ রহস্য করে বলে উঠল,—এবার আমারই লুঠ করবার পালা।

কথাটা বলেই সাগ্নিক্ উঠতে যাচ্ছিল, তার কোঁচা ধরে টেনে বসিয়ে নওয়ারা বললে,—গায়ে জোর না হলে লুঠ-পাট করা যায় না মুসাফির!

অনেকদিন বাদে কয়েক পাত্র আরবী মদ ঢক্ ঢক্ করে খেয়েছে সাগ্নিক্ খানা-পিনার সংগে। সুরার উগ্রতা উন্মাদ হয়ে ছুটোছুটি করে উত্তপ্ত রক্তস্রোতে। তীব্র জ্বালা ধরিয়ে দেয় মস্তিষ্কে। নওয়ারার অতর্কিত স্পর্শে আরও উদ্দাম হয়ে ওঠে বিষক্রিয়া।

বিহ্বল ভাবে প্রশ্ন করে সাগ্নিক্,—কি করতে হবে আমাকে?

নেশা তখনো হয়নি বেদুইন মেয়ের। সে চোখ পাকিয়ে ফলের পাত্রগুলো দেখিয়ে দিয়ে সহজ কণ্ঠেই বললে,—এগুলো সব খেয়ে ফেলতে হবে।

—উম্‌দা খেলেন না?

—অতিথির জন্যে যোগাড় করেছেন উম্‌দা। আপনাকেই খেতে হবে। ধমকের সুরে বলে সাগ্নিকের দিকে আরেকটুকু ঠেলে দিল পাত্রগুলো।

সাগ্নিক্ লুব্ধ দৃষ্টিতে নওয়ারার দিকে চেয়ে জড়িত স্বরে বললে,—তোমাকেও আমার সঙ্গে খেতে হবে নওয়ারা।

—এক সঙ্গে যা খাবার, তা এক সঙ্গে বসেই আমরা খেয়েছি। এগুলো তোমাকে একাই খেতে হবে।

—আমাদের দেশের রীতি অন্যরকম। বলে সাগ্নিক্ হাত বাড়িয়ে স্পর্শ করতে যায় স্পন্দিত রূপশিখা।

নওয়ারা সরে আসে।—আমাদের দেশে আমাদেরি নিয়ম মানতে হবে মুসাফির।

সাগ্নিক্ একাই খেতে স্বরু করে দেয় একান্ত নৈরাশ্যে। বেরিয়ে আসে একটা নিঃশ্বাস বুক থেকে। হাঁটু নাচে চঞ্চল হয়ে।

সর্বশেষে একটা আঙুর মুখে পুরে সাগ্নিক্ বললে,—আর পারছি না নওয়ারা।

—সবই খেলেন। আর আটকে পড়লেন এসে কফোঁটা মিষ্টি রসে।—নওয়ারার ভ্রু-দুটো বেঁকে যায় সকৌতুকে।

—মিষ্টি নয়। ভারী তেঁতো।—মুখখানা অসম্ভব তেঁতো করে বলে উঠল সাগ্নিক্।

—সেকি মুসাফির? আঙুর কখনো তেঁতো হয়? —বিস্ময়ে নওয়ারার ভ্রু-দুটো কুঁচকে নেচে ওঠে এবার চঞ্চল কৌতুকে।

—হ্যাঁ, হয়। তোমার ঐ ঠোঁটের কাছে।

—ঠোঁটে আমার কি আছে?

—আঙুরের চেয়েও মিষ্টি রস।

নওয়ারা হেসে গড়িয়ে পড়ে।

—সভ্যদের ভণ্ড বল, কিন্তু তুমিও তো কম ভণ্ড নও। খোসামোদ করতে তো ছাড় না। মিষ্টি রস একটুও নেই, মুসাফির।—ঐ কাফির আরকের চেয়েও ভয়ংকর বিষ আছে এই ঠোঁটে। আমরা সাপ। বিষ ছড়িয়ে দিই, জ্বালা ধরিয়ে দিই। মাতাল সাগ্নিক্‌কে আরও মাতাল করে লীলায়িত ভংগীতে নৃত্য করতে লাগল নওয়ারা। সাগ্নিক্ জড়িত লুব্ধ দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে কখন সটাং হয়ে শুয়ে পড়লো যাযাবরীর পদাংকে।

সুস্থ মস্তিষ্কে সাগ্নিক্ চমকে ওঠে প্রকৃতির কোলে পালিতা বর্বরা মেয়েটির যুক্তিপূর্ণ কথা শুনে। সাধ্য কি তার—তাকে পরাজিত করে।

অসম্ভব নয়। প্রকৃতি প্রত্যেকটি মেয়ের মুখে কথা যুগিয়ে দিয়েছেন তার বুদ্ধির উন্মেষের সংগে সংগে।

—বাংলা দেশেই এমনি কত আছে। নিরক্ষরা মেয়ের বুদ্ধির কি তীক্ষ্ণতা। সংসারে ঢুকেই অশিক্ষিতা মেয়ে কি এক ঐশী বুদ্ধির প্রেরণায় চালিত করে পুরুষকে। হোক্ সে অশেষ পণ্ডিত, কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন রাজনীতিক, সমাজনীতিক, ধনী, দরিদ্র, সবল অথবা দুর্বল। নওয়ারার প্রতিভাও তেমনি সহজাত। কোন ব্যতিক্রম নেই এখানেও।

নওয়ারাকে দেখে সাগ্নিকের মনে পড়ে কপালকুণ্ডলার কথা—সেই বন-বালিকা আর এই মরুর মেয়ের মধ্যে কিছু মিল আছে, পার্থক্যও আছে।

—কাপালিকের মতই নির্মম, নিষ্ঠুর, উম্‌দা। কিন্তু তার অন্তরের শিলারাশির নির্মম কাঠিণ্য ভেদ করে বহে যাচ্ছে স্নেহ এবং করুণার স্নিগ্ধ নির্ঝরিণী।

বনবালা প্রথমে ধরা দেয়নি পুরুষের ভুজ-পাশে। মরুবালিকা আজও দেয়নি।

সাগ্নিককে বেষ্টন করে নৃত্য করে—এক শিখায়িত বহ্নি। অসভ্য মেয়েটি জ্বালা ধরিয়ে দেয় সভ্য ছেলেটির শিবায় শিরায়। উত্তপ্ত রক্তস্রোত ছুটোছুটি করে উদগ্র কামনায়।

সাগ্নিক্ উন্মত্ত হয়ে ছুটে যায়। তুহাত বাড়িয়ে সেই আগুনে ঝাঁপ দিতে যায়। বহ্নি সরে যায়।

সাগ্নিক্ সারেংগী বাজায়। বহ্নিবালা মরীচিকার মত মায়াজাল বিস্তার করে কাছে আসে নর্তন ছন্দে—আবার নির্মম হয়ে সরে যায়।

আবার কাছে আসে—আবার সরে যায়। সাগ্নিকের নাগালের বাইরে চলে যায়।

(পাঁচ)

কতবড় প্রতিষ্ঠাবান জমিদারের ছেলে সাগ্নিক্। একটা যাযাবরীর জন্যে জঘণ্যতা এবং কদর্য্যতার শেষ ধাপে নেমে যাবে—ভাবতেই শিউরে ওঠেন ডাঃ ব্যানার্জি।

ডাঃ ব্যানার্জি একদিন সাগ্নিক্‌কে বললেন,—শোন, সাগ্নিক্! আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, ওরা বড় হিংস্র, বড় অত্যাচারী।

সাগ্নিক হাসতে হাসতে উত্তর দেয়,—আমার বাবাও কম হিংস্র নন। কম অত্যাচারী নন, ডাঃ ব্যানার্জি। তিনিও প্রজাপীড়ন করেন।

এমনি চোখা চোখা কথা সাগ্নিকের। ডাঃ ব্যানাৰ্জ্জি তবু মরীয়া হয়ে শেষ চেষ্টা করতে ছাড়েন না। তিনি সাগ্নিকের দুটো হাত নিজের মুঠোর মধ্যে পুরে স্নেহার্দ্রস্বরে বলেন,—বাবা আমি বুড়ো মানুষ। আমার কথা শোনো। বল, বেদুইনদের কাছে আর যাবেনা।

ডাঃ ব্যানার্জি বৃদ্ধ হলেও পরস্পরে কথা বলে একান্ত অন্তরংগের মত। সে পরিহাস তরল কণ্ঠে উত্তর দেয়,—বেদুইন উমদার একগাছি চুলও কালো নেই, ডাঃ ব্যানার্জি। তাছাড়া সে আমার জীবন দাতা—আশ্রয়দাতা।

জীবনদাতা!—ব্যংগস্বরে বলে ডাঃ ব্যানার্জি বললেন,—ওরা জীবন দিতেও যেমন, নিতেও তেমনি।—অনেক দেখেছি আমি।

সাগ্নিক্ ভ্রুকুঞ্চিত করে বললে,—জীবন নিতে আপনাদের সভ্য জগৎও কম নয়। এদের হাতে একটা ছুরি কিম্বা রাইফেল দেখে যাঁরা আঁৎকে ওঠেন, তাঁরাই কি করে গোটা একটা দেশ কিংবা মহাদেশ উড়িয়ে দেওয়া যায় তার জন্যে বিজ্ঞানের আরাধনা করছেন।

একটু চুপ করে আবার সে বলতে লাগল,—এদের একমাত্র দোষ এরা ডাকাত। কিন্তু, কেন ডাকাত? আমি বলবো, দায়ী আপনাদের সভ্য জগৎ—আপনাদের বহু বিজ্ঞাপিত সভ্যতা। দেশময় দারিদ্র—সভ্যতার দান। আর সেই দারিদ্রই যেমন সব দেশে তৈরী করেছে ডাকাতের দল, এখানেও হয়নি তার ব্যতিক্রম।

ডাঃ ব্যানার্জি মৃদু হেসে বললেন,—বিশ্ব পরিস্থিতির কথা নিয়ে তোমার সঙ্গে বিচার করছিনা।

—তবে কি বলছেন?

—আমি শুধু এই সোজা কথাটাই তোমায় বলতে চাই যে, তুমি বাড়ী ফিরে যাও। স্বঘরের একটি বাঙালী মেয়েকে বিয়ে করে ভবিষ্যৎকে সুন্দর করে তোলা। তোমাদের ভবিষ্যৎ মানে বাংলার ভবিষ্যৎ, বাঙালীর ভবিষ্যৎ।

সাগ্নিক্ ব্যংগের সুরে বলে উঠল,—আমি ছাড়াও বাংলার ভবিষ্যৎ ঠিক গড়ে উঠবে, ডাঃ ব্যানার্জি। নিজেদের বর্তমানের ঠিক নেই যাঁদের, তাঁরা পরম উৎসাহে ভবিষ্যৎ ঠিকই সৃষ্টি করে চলেছেন। —আপনারা উপদেশ না দিলেও।

ডাঃ ব্যানার্জি সাগ্নিকের বক্রোক্তি একান্ত সরল মনে এবং সহজ-ভাবে গ্রহণ করে বোকার মত বলে ফেললেন,—এ তোমার ভুল ধারণা সাগ্নিক। বিয়ে করলেই পংগপাল জন্মাবে, তেমন ঘরে বিয়ে করবে কেন?—অসংখ্য জন্ম, শিশু-মৃত্যু, স্বাস্থ্য-হীনতা, কেন আজ বাংলায় বলদেখি?

—ডাঃ ব্যানার্জির অত্যধিক উচ্ছ্বাস দেখে হতভম্ব হয়ে গেল সাগ্নিক।—শুনুন! —সে বললে।

ডাঃ ব্যানার্জি সাগ্নিকের কথায় কাণ না দিয়ে বললেন,—হেরিডিটি? নিশ্চয়ই!—প্রথমেই দেখবে, মেয়ের বাপের একপাল ছেলে মেয়ে হয়েছিল কিনা। ঠিকুজী কোষ্ঠীর বদলে গোষ্ঠীর এই সব হিষ্ট্রী দেখা উচিত সর্বাগ্রে। এসব না দেখে বিয়ের ফাঁদে পা দিলে জড়িয়ে পড়বে তো বটেই!

সাগ্নিক হো হো করে হেসে উঠল।—আপনি যে একেবারে জন্মতত্ত্বে চলে এলেন ডাঃ ব্যানার্জি।

—হেসোনা। আমি বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়েই বুঝিয়ে দেব।

সাগ্নিক্ বাধাদিয়ে বললে,—থামুন ডাঃ ব্যানার্জ্জি। বিবাহ এবং জন্মের ব্যাপারে উৎসাহ আমার মোটেই নেই। যাদের আছে, সেই সব অতি ভাগ্যবানদের জন্যে আপনার বৈজ্ঞানিক যুক্তি রেখে দিন।

সাগ্নিকের মন আজ ভারী চঞ্চল—আন্‌মনা। পালাই পালাই ভাব। ডাঃ ব্যানার্জির কাছ থেকে নিস্কৃতি পেলে বাঁচে। এবার আসবার সময় নওয়ারা তাকে বলেছে,—স্যাম্পেন্ এনো

মুসাফির। দাম দেব। দিল খুলে নাচবো—তখন দেখে নিও।

সাগ্নিক্ কয়েক বোতল স্যাম্পেন একটা অ্যাটাচিকেশে পুরে আর সারেংগী নিয়ে চললো হালুয়ান পাহাড়ে, সন্ধ্যের একটু আগে।

—কোথায় যাচ্ছ সাগ্নিক্? চল পিরামিড দেখে আসি —বলে পথের মাঝখানে ডাঃ ব্যানার্জি নিষ্ঠুরের মত সাগ্নিক্‌কে আটক করে জোর করে তুলে নিলেন তাঁর জীপে।

যাদুশালার সামনে এসে ডাঃ ব্যানার্জির জীপ থামলো। দ্বারদেশে জীবন্ত নর-কংকালের মত দণ্ডায়মানা মসীকৃষ্ণবর্ণদেহ হাব্‌সী দ্বার-রক্ষিণী। দীর্ঘ দেহ, কোটরগত চক্ষু, খর্ব নাসিকা এবং প্রলম্বিত অধর।

যাদুঘরের একটি কক্ষে খেদিব মহম্মদ পাশার মোমমূর্তি। তাঁর ফরাসীমন্ত্রী জেঃ সাইথের প্রতিমূর্তি। অপর দিকে সমুদ্রের বেলা ভূমিতে দণ্ডায়মানা মিশরের রাণী। মোম দিয়ে জীবন্ত করা হয়েছে রূপসী রাণী ক্লিওপেট্রার জীবন-আলেখ্য। মিশর ছাড়া আর কোথাও নাকি নেই মোম ভাস্কর্যের এমনি অপূর্ব অবদান।

তারপর পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময় পিরামিড। মিশরের বহুদূর ব্যাপী বিস্তৃত হয়ে আছে পিরামিড। মকত্তম পাহাড়ের পাঁজর ভেঙে সহস্র সহস্র বছর আগে তৈরী করেছিল ফেরায়ুনরা।

অন্ধকার, বক্র, পিচ্ছিল পাথরের সিঁড়ি দিয়ে কয়েক শত ফিট অভ্যন্তরে প্রবেশ করে চোখে পড়ে ফেরায়ুন নরপতিদের মৃতদেহ – কফিনের মধ্যে শান্তির অনন্ত ক্রোড়ে শায়িত.

একটা সোনার কফিনে টুট্‌, আন্‌থ্‌ আমুনের শব। পরপর তিনটে কফিনে আবৃত। আর একটা ঘরে টুট্‌ আন্‌থ্‌—আমুনের খাট, ছড়ি, বাক্‌স, কাঠের কাজ, হাতীর দাঁত এবং আলাবাস্তারের কারুকার্য্য।—কতযুগ পরেও এখনো আছে অমলিন।

পিরামিডের পর স্ফিংক্‌স্‌। সিংহের দেহ এবং ফেরায়ুনের মুখ-মণ্ডল। শক্তি এবং ঐশ্বর্যের প্রতীক। মিশরীয় শক্তি চূর্ণ করবার উন্মত্ততায় মদগর্বিত নেপোলিয়ঁর মিশরীয় ভাস্কর্যের ওপর অমানুষিক আক্রমণের করুণ সাক্ষী হয়ে রয়েছে স্ফিংক্‌সের কর্তিত নাশা।

কালের কবল থেকে মানুষ বাঁচিয়ে রেখেছে তার অমর ভাস্কর্য, বাঁচিয়ে রেখেছে নিজেরি মৃতদেহ, কিন্তু দিতে পারেনি প্রাণ-শক্তি। আজও সোনার কফিনে ফিরে আসেনি প্রাণের স্পন্দন।

মূক, স্তব্ধ—আজ পাষাণ স্মৃতিস্তম্ভ। কে দেবে আজ পাষাণের মুখে ভাষা! কে ফোটাবে কথা! কে শোনাবে সত্য এবং শাশ্বত বাণী!

সভ্যতা জগৎকে দিয়েছে অমর ভাস্কর্য, ঐতিহাসিক অমরত্ব, বিজ্ঞানের সন্ধান।—আবার সভ্যতাই দিয়েছে হত্যার নির্মম

উল্লাস। মানুষ সেই উল্লাসে মত্ত হয়ে প্রচার করে আত্ম-মহিমা, বিজয়গর্বে ; কিন্তু মুখ কালো করে পরাজয়ের গ্লানি বহে বেড়াচ্ছে শুধু একটি জায়গায়।—সে মৃতদেহে আবার ফিরিয়ে আনতে পারেনা প্রাণের স্পন্দন ।

সাগ্নিকের হাত ধরে পিরামিড দেখে বেরিয়ে আসতে আসতে ডাঃ ব্যানার্জি অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন,—আশ্চর্য ভাস্কর্য !

—আর সভ্যতা এবং ঐশ্বর্যের আশ্চর্য বিজ্ঞাপন—প্রায় সংগে সংগে টিপ্পনি কেটে বলে উঠল সাগ্নিক্।

ডাঃ ব্যানার্জি আহত হয়ে বললেন,—এসব ব্যাপারেও তুমি সিরিয়াস্ হবে না সাগ্নিক্ ?

—এইসব বিজ্ঞাপন দেখিয়ে আর আত্মপ্রচার করে জগৎকে ধোঁকা দিয়ে আসছে কারা ? স্বীকার করি, ভাস্কর্যের আশ্চর্য অসাধারণত্ব অপরকে করেছে বিস্মিত, রোমাঞ্চিত। কিন্তু কি লাভ হয়েছে সাধারণের ? পিরামিড্ কিংবা তাজমহলের অস্তিত্বই যদি লুপ্ত হয়ে যায়, কি ক্ষতি হবে বিশ্বের ? ঐযে স্ফিংক্সের কর্তিত নাশা মসীলিপ্ত করেছে মিশরভাস্কর্য, তাতে কি ক্ষতি হয়েছে মিশরের অধিবাসীর ?

সাগ্নিকের কথার উত্তর না দিয়ে ডাঃ ব্যানার্জি নিঃশব্দে জীপে স্টার্ট দিয়ে ষ্টিয়ারিং ধরে বসলেন। সাগ্নিক্ উঠে না এসে হাত বাড়িয়ে তার অ্যাটাচিকেশ আর সারেংগী খানা তুলে নিল।

ডাঃ ব্যানার্জি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কোথায় যাবে, এত রাত্রে ?

সাগ্নিক হেসে উত্তর দিল,—যেখানে যাচ্ছিলাম।

—এত রাত্রে? কী সর্বনাশ!

সাগ্নিক্ মৃদু হেসে বললে,—তা একটু রাত্রি হয়েছে বৈকি! আপনি না টানলে অবশ্য হতো না।

সাগ্নিকের দৃষ্টি পিরামিডগুলো ছাড়িয়ে চলে সন্ধ্যার নিবিড় অন্ধকার অতিক্রম করে।

—কি কৈফিয়ৎ দেবে ক্যাম্পে ফিরে?

—কৈফিয়ৎটা না হয় আমার হয়ে আপনিই তৈরী করে রাখবেন, ডাঃ ব্যানার্জি।

সাগ্নিক্ ডাঃ ব্যানার্জির হাত টেনে নিয়ে মৃদু ঝাঁকানি দিয়ে বললে,—আচ্ছা। বাই-বাই।

সাগ্নিক্ চলে যাচ্ছিল, তাকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকলেন ডাঃ ব্যানার্জি, সাগ্নিক্। সাগ্নিক্!

—কি বলুন! সাগ্নিক্ ফিরে এল আবার।

—না হয় কালই যেতে!

—উপায় নেই ডাঃ ব্যানার্জি। অনেকগুলো অর্ডার আছে। সেগুলো অন্ততঃ পৌঁছে দিতেই হবে।—আজই।

ডাঃ ব্যানার্জির স্থির, তীক্ষ্ণদৃষ্টি অবাক বিহ্বলতায় সাগ্নিকের মধ্যে কি যেন খুঁজে বেড়াল কিছুক্ষণ। তারপর তিনি কোমল-কণ্ঠে বললেন,—তুমি এত ভালবাস বেদুইনদের?

সাগ্নিক্ অদ্ভুতভাবে দূর-দিগন্তের দিকে চেয়ে আবেগকম্পিত স্বরে বলে উঠল,—কে না ভালবাসে এই বন্ধনমুক্ত যাযাবর শ্রেণীকে—বলুন তো! স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলেছেন,—

"এর চেয়ে হতাম যদি আরব বেদুইন,
চরণ প্রান্তে ধূসর মরু দিগন্তে বিলীন।"

গম্ভীর স্বরে আবৃত্তি করতে করতে সাগ্নিক্ নিবিড় কালো অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল

(ছয়)

ডাঃ ব্যানার্জি স্টার্টার বন্ধ করে আড়ষ্টের মত বসে রইলেন কিছুক্ষণ। কি এক গভীর বেদনায় তাঁর চোখ দুটি করুণ হয়ে উঠলো। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে অস্ফুট স্বরে বলে উঠলেন,— হতভাগ্য যুবক!

মুমূর্ষু পাণ্ডুর সন্ধ্যা। নীল নদের কলধ্বনির সংগে ভেসে চলে যেন বৈরাগ্য-সংগীত। কানে বেজে ওঠে মহম্মদ আলি পাশা মসজিদের ক্ষীণ ঘণ্টা-ধ্বনি।

নীল নদের জলস্রোতে উজান বহে চলেন ডাঃ ব্যানার্জি। খুঁজে পান কয়েকটি ফিরে আসা জীর্ণ পত্র। কত বেদনার স্মৃতি, কত হতভাগ্যের মর্মন্তুদ কাহিনী এখনো গ্রন্থি বেঁধে আছে মর্মতারে।

গত মহাযুদ্ধের মত এবারেও ডাক পড়েছে ডাঃ ব্যানার্জির। মিত্রপক্ষের সেনাবাহিনীর একটা ইউনিটে এবারেও চাকরী নিলেন। কিন্তু, এবারে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন, সে অভিজ্ঞতা না হলেই ছিল ভাল।

জেঃ রেমেলের দুর্বার জার্মাণ বাহিনী তখন ব্লীৎস্‌ক্রীগ্ আক্রমণ করে একের পর এক ঘাঁটিগুলো দখল করে চলেছে উত্তর আফ্রিকায়—বিজয়োল্লাসে। মিত্র-শক্তি পর্যুদস্ত। ফ্যাসিস্ট জার্মাণীর বিশ্বজয়ের অভিযানে দ্রুত এবং অব্যাহত গতি।

ডাঃ ব্যানার্জি তখন একটা হাসপাতাল জাহাজের মেডিকেল অফিসার। দক্ষিণ আটলাণ্টিক মহাসাগরে বিখ্যাত 'গ্রাফ্‌স্পীর" সংগে ব্রিটিশ ক্রুজারগুলোর নৌসংঘর্ষের পর ডাঃ ব্যানার্জি মেজরের পদে উন্নীত হন।

পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে ইটালিয়দরে সুরক্ষিত ঘাঁটি—স্পেজিয়া নেপ্‌ল্‌স্‌, টেরানেভা, ক্যাগ্‌লিয়ারী আর সিসিলির কাষ্টলামারী। —আর পূর্ব ভূমধ্যসাগরে বেন্‌গাজী ও তব্রুক। —চতুর্দিক থেকে সপ্তরথীর আক্রমণ চলেছে বিচ্ছিন্ন বৃটিশ ঘাঁটি মাল্টার ওপর।

অবিরাম কানে আসে, বোমারু বিমানের গোঁ গোঁ শব্দ। বোমা পড়ছে বুম্‌ বুম্‌ করছে। মাল্টার কোলাহল মুখরিত রাজপথ ষ্ট্রাডা রিয়েল এবং বারাক্কা উদ্যান আতংকে নিস্তব্ধ। মাইনের বিস্ফোরণ, জাহাজডুবি এবং মৃত্যুর হিংস্র চীৎকার। সোঁ সোঁ করে নীচে নেমে এসে জংগী বিমানগুলো শব্দজাল সৃষ্টি করতে করতে ওপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে যায় মেঘান্তরালে।

একদিকে বল্কানের ওপর নাৎসী জার্মাণীর সর্বময় কর্তৃত্ব, আর একদিকে ভূমধ্যসাগরে ফ্যাসিষ্ট ইটালীর ক্রম-বর্ধমান প্রভাব।

সারা উত্তর আফ্রিকাটা লৌহ কটাহের ওপর জ্বলছে। বিক্ষুব্ধ ভূমধ্য সাগর।

পশ্চাদপসরণের ক্ষিপ্রতা দেখিয়ে আহত সৈন্যে বোঝাই হয়ে গেছে ডাঃ ব্যানার্জির হাসপাতাল জাহাজ।

কোন সৈন্যের হাত উড়ে গেছে, কারও পা গেছে! কারও সর্বাংগ ঝলসে বীভৎস হয়ে গেছে।

সেবাপরায়ণা নার্সদের মধ্যে স্থমিতা মিত্রের নামে পুলকের হিল্লোল বহে যায়।

জাহাজখানি প্রশংসায় গুঞ্জরিত। মুমূর্ষু সৈনিকের বেদনাতুর চক্ষুদুটি সিক্ত হয়ে ওঠে অভূতপূর্ব মানসিক উচ্ছ্বাসে।

মরণের বিভীষিকার মধ্যে যেন মূর্তিমতী দেবী। করুণায় উজ্জ্বল দুটি চক্ষু স্নেহপ্রস্রবণে বিগলিত। স্নিগ্ধ স্পর্শে ঝরে পড়ে শান্তির সুষমা, আহত দগ্ধদেহের সহস্র বৃশ্চিকজ্বালার ওপর।

মুমূর্ষু নিগ্রো একটি। সর্বাংগ ঝলসে গেছে। মুখখানা বীভৎস হয়ে উঠেছে। ছটফট করছে অসহ্য যন্ত্রণায়। মৃত্যু-যন্ত্রণাকাতর নিগ্রোর শিয়রে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের মত কুমারী সুমিতা ঠায় বসে, যতক্ষণ না ঘুমে জড়িয়ে আসে—আহত সেনার চোখের পাতা দুটো।

ডাঃ ব্যানার্জি আর্দ্রস্বরে সুমিতাকে বলেন,—এযুদ্ধে মিত্রপক্ষের যদি জয় হয়, বাঙালী নারীর সেবাকাহিনী স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে ইতিহাসে।

আত্মপ্রশংসায় সুমিতার দুটি গণ্ড লজ্জায় আরক্তিম হয়ে ওঠে। সে লজ্জাবনত মুখে বল্‌লে,—স্ত্রীলোক সেবা করবে সে আর বেশী কথা কি ডাঃ ব্যানার্জি? আমি কি এই প্রথম?

—না, প্রথম নও। তবে বাঙালী নারীর ত্যাগ এবং সেবা আজ গৃহকোণের গণ্ডী ভেঙে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে, এইটেই বেশী করে বলতে চাই।

অনেকেই সেরে উঠছে। ডাঃ ব্যানার্জির চিকিৎসা নৈপুণ্যে এবং সুমিতার অক্লান্ত সেবায় মরণের দুয়ার থেকে ফিরে আসে আহত নিগ্রো। ধীরে ধীরে নিরাময় হয়ে জাহাজের ডেকে এসে বসে।

সুমিতাও কাছে এসে বসে।—এখন কেমন আছেন ?—মধুর কণ্ঠে প্রশ্ন করে সুমিতা।

—আপনার জন্যেই তো বেঁচে গেছি এযাত্রা।—সুমিতার মুখের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলে নিগ্রোসৈনিকটি।

নিগ্রোসেনানীর ভাবান্তর হয়। কিসের তরংগ খেলে যায় বুকের মধ্যে সুমিতার ঘনিষ্ঠ আলাপনে।

সুমিতা দেখে, নিঃসংগ লোকটির বিমর্ষ, ম্লান দৃষ্টি ভূমধ্যসাগরের ক্ষিপ্ত তরংগোচ্ছ্বাস অতিক্রম করে, সুনীল দিগ্বলয়ের সীমা ছাড়িয়ে এতক্ষণে হয়তো পৌঁছে গেছে বহুদূরে—কোন্ এক স্নেহ ক্রোড়ে অথবা সপ্রেম আলিংগন পাশে।

সুমিতা ধীরে ধীরে তার বুকে হাত বুলিয়ে দেয়।

ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে স্বজনবিরহবেদনাবিধুর মসী-কৃষ্ণবর্ণ লোকটি হয়তো বা অনুকম্পায় উজ্জ্বল সুমিতার দুটি আঁখি তার বিষাদক্লিষ্ট চক্ষে সৃষ্টি করে অপূর্ব মায়া-কাজল।

অবশেষে আলেজান্দ্রিয়ায় নোঙর ফেললো ডাঃ ব্যানার্জির রেড্‌ক্রশ জাহাজ রসদ নেবার জন্য।

অদূরে মিত্রপক্ষের অগণিত শিবির। সাগরের বেলাভূমি আর শুভ্রবস্ত্রবাস মিশে এক হয়ে গেছে।

ডাঃ ব্যানার্জি সুমিতার সংগে সমুদ্রতীরে বসে ফেনিল তরংগোচ্ছ্বাস দেখছিলেন। অস্তগামী সূর্য নীল আকাশের গায় আর নীল সাগরের তরংগে মুঠোমুঠো আবির ছড়িয়ে দিয়েছে।

সেইদিকে চেয়ে ডাঃ ব্যানার্জি সুমিতাকে স্নিগ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,—বাড়ীতে টাকা পাঠিয়েছ সুমিতা?

ডাঃ ব্যানার্জি সুমিতার সমস্ত অবস্থাই জানেন:

ভেড়ার পালের মত একপাল ছেলে মেয়ে আর সুমিতাকে নিয়ে সুমিতার মা তাঁর স্বামীকে হারান।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে চাকরী নিয়ে এতদূরে চলে আসতে হয়েছে তাকে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ভাবেই। কি অমানুষিক লাঞ্ছনা আজ তাকে এনেছে জন্মভূমি থেকে টেনে--অসীম নীলাম্বুর মাঝখানে।

মহাযুদ্ধের রণদামামার সংগে সংগে বেজে ওঠে চোরাকারবারী বাদ্যধ্বনি। দুর্নীতির ফাটল ধরলো সমাজে। সেই ফাটল দিয়ে সমাজদেহে এল প্লাবন। শোষণ এবং ব্যাভিচারের সর্বগ্রাসী প্লাবন তরংগায়িত হয়ে উঠল পাশ্চাত্য থেকে সুদূর প্রাচ্যে।

পাশ্চাত্যে যেমন, তেমনি প্রাচ্যেও। একটুও পার্থক্য নেই, একটুও ব্যতিক্রম নেই। বাংলাদেশও কেঁপে উঠেছে লালসার তাণ্ডবে, বাঙালীর শয়তানী নৃত্যে।

তারা বাঙালী। সৈনিক নয়। তারা অসামরিক সাধারণ ব্যক্তি। তারা ধনী কিংবা দরিদ্রও নয়। তারা আপন স্বার্থের সদা জাগ্রত প্রহরী।

সুমিতার বাপ হরিধন মিত্র কাজ করতেন কোলকাতার এক সওদাগরী অফিসে। জন্-ডিকিন্সন্ কোম্পানীর কলকাতা শাখায় সামান্য মাইনের কেরাণী ছিলেন হরিধন।

কলকাতার মেসে থেকে দারুণ দুঃখ কষ্টের মধ্যেও হরিধন বাড়ীতে সংসার খরচ পাঠাতেন নিয়মিত ভাবেই। ছেলেমেয়ে-দেরও শিক্ষা দীক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলছিলেন ধীরে ধীরে।

পাঁচ ছয়টি অপোগণ্ড ছেলেমেয়ের মধ্যে সুমিতাই ছিল সকলের বড়। বিন্ধ্যাদ্রির মত সকলের মাথা ছাড়িয়ে উঠছিল, নিঃশব্দে।

তীক্ষ্নবুদ্ধি সুমিতার। বাঁকুড়ায় রামপুরে নিজের বাড়ীতে নিজেনিজেই পড়ে প্রাইভেটে সে ম্যাট্রিক পাশ করলে। সুমিতার ভাই দিব্যেন্দুকে সুমিতা নিজেই পড়ায়। দিব্যেন্দুর তখনো দু'ক্লাশ বাকী।

ঠিক সেই সময় জার্মানীর সংগে ইংরেজ যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বাংলার গ্রামে গ্রামে দুর্ভিক্ষ এনে বাংলার আবাল, বৃদ্ধ, বনিতাকে জানাল সহাস্য সম্ভাষণ।

অনেক বড় বড় কারবার, ফার্ম, ফ্যাক্টরী হঠাৎ সংকুচিত হতে লাগল। আবার অনেক কারবার চোরাকারবারের অন্ধকার ফাটল বেয়ে রাতারাতি গজিয়ে উঠে ফেঁপে ফুলে উঠতে লাগল।

এমনি দারুণ বিশ্বপরিস্থিতিতে জন্-ডিকিন্সন্ কোম্পানীর বিশ্বব্যাপী কারবার টলমল করে উঠল। হরিধনের চাকরী গেল রিট্রেঞ্চমেণ্টে।

হরিধন মিত্রের আপাদমস্তক কেঁপে ওঠে থরথর করে। পৃথিবীময় বিপর্যয়ের মধ্যে তাঁর একমাত্র অবলম্বন ছিল চাকরী।

এবং এই চাকরীকে অবলম্বন করে তিনি এতদিন ছিলেন নির্ভীক্ শংকাহীন।

চাকরী যেতেই হঠাৎ যেন দুনিয়ার সমস্ত আলো নিভে গিয়ে হঠাৎ ঘনিয়ে এল দিনান্ত। চোখের সামনে ক্রমশঃ শীর্ণ হয়ে আসে কোলাহল মুখরিত প্রশস্ত রাজপথ। আবছা হয়ে আসে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল চিত্রপট।

হরিধনের সংগে সংগে আরও অনেকের কাঁধে ঠিকরে এসে পড়লো রিট্রেঞ্চমেন্টের তীক্ষ্ণধার কুঠার ফলক। হরিধনের স্বগ্রামবাসী বন্ধু ঘনশ্যামও পেলনা অব্যাহতি।

কিন্তু হরিধনের মত অভিভূত হয়ে পড়েনি ঘনশ্যাম। ঘনশ্যামের মনে হলো যে, তার হাত থেকে এতদিনে খসে পড়লো একটা কঠিন শৃংখলের নিগড়। তার চোখের সামনে ভেসে এল অশেষ সৌভাগ্যের এক উজ্জ্বল আলোকচিত্র।

ঘনশ্যাম হরিধনের স্বগ্রামবাসী হলেও সে বরাবর কলকাতাতেই বাসা করে আছে—স্ত্রী, পুত্র, পরিবার নিয়ে। অবসর পেলেই হরিধনের সংগে আড্ডা জমাত মেসে।

হরিধন ঘনশ্যামের চেয়ে বয়সে যেমন বড় বিদ্যায় এবং বুদ্ধিতে তেমনি ছিল শ্রেষ্ঠ, কিন্তু একটা বিষয়ে হরিধন কেন, বোধ হয় ভূ-ভারতে কেউ ঘনশ্যামের সমকক্ষ ছিল না। শয়তানী এবং কূটবুদ্ধিতে সে ছিল অদ্বিতীয়।

চাকরী যাবার অব্যবহিত পরেই ঘনশ্যাম হরিধনের মেসে এসে তার সামনে মেঝের ওপর ধপাস্ করে বসে পড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললে,—ঘাবড়াবেন না দাদা। চাকরী গেছে—না, মহারাজ ঘাড় থেকে নেমেছেন।

—মহারাজ? সে আবার কে?—বিস্ময়ে ভ্রু কুঞ্চিত করলেন হরিধনদা।

জিহ্বা এবং তালুর সংযোগে অস্ফুট শব্দ করে উঠল ঘনশ্যাম।

—মহারাজকে জানেন না? এত ভালবাসা তাঁর আমাদের ওপর।—তাঁকে চেনেন না?

নির্বাক হরিধনদা সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন ঘনশ্যামের মুখের দিকে।

ঘনশ্যাম সশব্দে হেসে উঠে বললে,—শনি?—শনি?—আমাদের ঘাড়ে চেপে যিনি মজা লুটছেন।

এত দুঃখেও হাসি পেল হরিধনের। তিনি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ঘনশ্যামের দিকে চেয়ে বললেন,—শনি নামলেন কি করে?

ঘনশ্যাম এদিক ওদিক চেয়ে চাপা গলায় বললে,—ভারী সুবিধে দাদা। যুদ্ধের বাজারে চাকরী গেছে, না আপদ গেছে।

হরিধন অসহিষ্ণু হয়ে বলে উঠলেন,—হেঁয়ালি ছেড়ে খুলেই বল না!

ঘনশ্যাম মহাবিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে বললে,—বলছি সব। এখন চাই কিছু টাকা।

—টাকা? টাকা কি হবে?

—যুদ্ধের বাজার দাদা! দেখছেন না? চাল, ডাল থেকে আরম্ভ করে কাপড়-চোপড়, ওষুধ-পত্তর, ফল-ফুলুরি, কলাটা, মূলোটা এস্তক—গুটি গুটি করে এগুচ্ছে মিলিটারী ক্যাম্পের দিকে।—তাই বলি, এখন টাকার দরকার কিছু। দু'পয়সার

মাল কিনে দু'টাকায় ঝেড়ে দিন মিলিটারীকে। তখন বলবেন, হুঁ! ঘনশ্যামের বিদ্যে নেই বটে কিন্তু বুদ্ধিতে কোন পণ্ডিতও ঘনশ্যামের ত্রিসীমানা দিয়ে যেতে পারে না।

হরিধন ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন,—মিলিটারীর দালালী করে দেশের সর্বনাশ করতে হবে পেটের দায়ে? একথা তুমি মুখে আনলে কি করে ঘনশ্যাম?

—অনেকেই তো করছে দাদা!

—অনেকে খুনী হলে আমাকেও খুন করতে হবে?

—তা যা বলেছেন দাদা। ছ্যান্ একটা বিড়ি ছ্যান। বুদ্ধির গোড়ায় ধোঁয়া দিই।

তারপর বিড়ি ধরিয়ে চোখ বুজিয়ে কয়েকটা 'রাম টান' দিয়ে ঘনশ্যাম হঠাৎ লাফিয়ে উঠল।

—ঠিক হয়েছে দাদা। থাক গিয়ে ওসব। বরং কিছু মাল কিনে ঘরেই মজুত করে রাখা যাক্। বাজারে টান ধরলে বেশী দামে ছাড়া যাবে।

হরিধন বিরক্ত হয়ে বললেন,—কি যা তা বলছো। চাকরী গেছে বলে চুরি, জোচ্চুরি, চোরাকারবারী যা খুশী তাই করে পেট চালাতে হবে?

এক একদিন এক-একটা প্রস্তাব নিয়ে আসে ঘনশ্যাম। অবশেষে একটি প্রস্তাব মেনে নিতেই হলো হরিধনকে।

—হ্যাঁ, কাজটী নতুন ধরণের এবং খারাপ নয়।—হরিধন সপ্রশংস দৃষ্টিতে ঘনশ্যামের দিকে চেয়ে বললেন।

—এর জোড়া আর খুঁজে পাবেন না দাদা।

বলতে বলতে ঘনশ্যামের ধারালো দাঁতগুলোর প্রত্যেকটি বেরিয়ে পড়ে।

—বেশ। তুমি টাকা দেবে তো?

হরিধন সতরঞ্চের ওপর বসেছিলেন। হরিধনের সামনে বসে বিড়ি ফুকছিল ঘনশ্যাম। হঠাৎ সে বিড়িটা এক পাশে রেখে হরিধনের পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে উঠল—আমার কিছু নেই দাদা। আপনারি সব থাকবে। আমি শুধু গতরে খেটে দেব।

হরিধন বল্লেন—টাকা দেও, আর না দেও, পার্টনার তোমায় হতেই হবে। তবে কি জান? ব্যবসা আমি বুঝিনা। আর আমারতো কিছুই নেই পরিবারের গহনা আর ভদ্রাসন ছাড়া। ঘনশ্যাম উৎসাহিত হয়ে বলে উঠল,—ডবল লাভ দাদা। কিছু ভাববেন না। আমি সব ঠিক করে দেব।

—গহনা বিক্রী করবো?—দ্বিধা জড়িত স্বরে আপনাআপনি বলে উঠলেন হরিধন।

হরিধনের পাদুটো আরও শক্ত করে ধরে ঘনশ্যাম বললে,—আলবৎ বিক্রী করবেন। ঝেড়ে দিন দাদা। সোনার দামতো এখন বেড়েই চলেছে।

কাজেই রাজী হলেন হরিধন। মনোরমার যথাসর্বস্ব অলংকার বিক্রী করে মূলধন দিলেন ঘনশ্যামের হাতে। স্লিটট্রেঞ্চ কাটার কণ্ট্রাক্ট নিল ঘনশ্যাম।

পার্টনারসিপ্ বিজ্‌নেস্। ঘনশ্যাম বললে,—লেখাপড়া একটু পরে হলে কোন ক্ষতি নেই দাদা। কিন্তু, রেজেষ্ট্রীর জন্যে মাটিকাটা একদিন কামাই হলে কারবার ডকে উঠে যাবে।

—মাটি কাটা আবার একটা কাজ নাকি?—বলে যে সব বড় বড় ঠিকাদার শ্লিটট্রেঞ্চ কণ্ট্রাক্টের অভিনবতা এবং অনভিজ্ঞ-তার জন্য নাক সিঁটকে ছিলেন, তাদের নাকের সামনে এই কাজের কণ্ট্রাক্ট নিয়ে মোটা টাকা পিটতে লাগল ঘনশ্যাম

হরিধনের সংগে ঘনশ্যামের লেখাপড়া হওয়া দূরে থাক, তার সংগে দেনা পাওনার হিসেব নিকেশ পর্যন্ত একটা হলোনা। তার আগেই বিশ্বদুনিয়ার সংগে সমস্ত দেনা পাওনা শেষ করে একপাল অপোগণ্ড ছেলেমেয়ে রেখে হরিধন পাড়ি দিলেন দুনিয়া-দরিয়ার ওপারে।

আর ঘনশ্যামকে পায় কে! কোন ভাগীদার নেই আর। এক পয়সাও চাইবেনা কেউ। জবাবদিহি করতে হবেনা কারও কাছে। কারবার এখন তার একার। ঘনশ্যামের অঙ্গুলি হেলনেই নিয়ন্ত্রিত হবে সমস্ত লাভ, লোকসান।—সে এখন একাই মালিক।

কলেরায় হরিধনের যখন নিদেন অবস্থা, স্বামীর মাথা কোলে নিয়ে অশ্রুর বন্যায় ভেসে যায় মনোরমা। হরিধনের শিথিল কম্পিত একটি হাত খানিকটা উঠে আবার পড়ে যায়। অনেক কষ্টে কোন রকমে বলেন,—কেঁদনা মনো। ঘনশ্যাম খুব খাতির করে আমায়। সে রইল। —কারবার রইল।

আর কোন কথা বলতে পারেনা হরিধনদা। ক্ষীণ কণ্ঠস্বর মিলিয়ে গেল শেষ নিঃশ্বাসের সংগে, আর আর্তস্বরের মধ্যে।

হরিধনের স্ত্রী মনোরমা একপাল ছেলে মেয়ের হাতধরে ঘনশ্যামের বাড়ী ঢুকতেই তার মুখখানা একেবারে ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে এবং অনেক চেষ্টায় ছল ছল দৃষ্টিতে চেয়ে ঘনশ্যাম বললে,—কাজের চাপে 'যাই' 'যাই' করেও যেতে পারিনি বৌঠান।

মনোরমা চোখে আঁচল দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বললে,—মরবার সময়ও আপনার নাম করেছিলেন।

ঘনশ্যাম হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। অবশ্য চোখে জল ছিলনা এক ফোঁটাও।—নাম করবেন না? আমরা যে দুজনে এক আত্মা ছিলাম।—আমি হতভাগা, তাই পড়ে রইলাম।—উঃ! দাদারে! একবার চোখের দেখাও দেখতে পেলাম না।

তারপর ঘনশ্যাম চোখদুটো হাত দিয়ে রগড়াতে লাগল যতক্ষণ না বেশ একটু লাল হয়ে ওঠে।

—ঠাকুরপো! তোমার ভাইপো, ভাইঝি তোমার হাতেই দিলাম।

সুমিতার ইংগিতে ছেলেমেয়েরা পায়ের ধুলো নিল ঘনশ্যামের। মাথায় দিল।

ঘনশ্যাম উর্ধনেত্র হয়ে গদ গদ স্বরে বললে,—থাক্। থাক।—আর কি ও বাড়ী যাওয়া আছে যে, তোমাদের দেখবো।—

সেই আপনাকে বিয়ের সময় একবার দেখে ছিলাম। না, বৌঠান?

মনোরমা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মাথা নীচু করলে। সেই দিকে চেয়ে হাই তুলে দু'আঙুলে তুড়ী দিয়ে বলে উঠল ঘনশ্যাম। —সব কণ্ট্রোল বৌঠান। সব কণ্ট্রোল। কলের জলটা পর্যন্ত কণ্ট্রোল দরে কিনে খেতে হয়। আমি না হয় অনেক দিন আছি, সহ্য করে আছি। আপনি থাকবেন কি করে বৌঠান?

মনোরমা চমকে উঠল। সে বললে—সেকি ঠাকুরপো? খাবার জল পর্য্যন্ত কিনে খেতে হয়?

—তবে আর বলছি কি বৌঠান! নৈলে আমার ভাইপো, ভাইঝি নিয়ে আমি থাকবো, সেতো আমার পরম ভাগ্য। আর কি সেদিন আছে বৌঠান। উঃ! কি সুখেই না আমরা ছিলাম যুদ্ধের আগে।

মনোরমা আঁচলের একটা খুঁট আঙুলে জড়াতে জড়াতে নত দৃষ্টিতে চেয়ে বললে,—দিন কাল খুব খারাপ পড়েছে, সেকথা ঠিক। তবে মাটি কাটার কাজে তোমার দাদা আর তুমি—

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়।

ঘনশ্যাম যে প্রসংগ এড়িয়ে যেতে চায়, হঠাৎ সেই প্রসংগই যে এসেপড়ে। ঘনশ্যাম শশব্যস্তে উঠে পড়ে চেঁচামিচি সুরু করে দিল।

—ওরে, কে আছিস? বাড়ীতে খবর দে, না! কত ভাগ্যি, বৌঠানের পায়ের ধূলো পড়েছে আমার বাড়ীতে।

বলতে বলতে স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনীকে এগিয়ে দিয়ে ঝড়ের মত বেরিয়ে গেল ঘনশ্যাম।

———

(সাত)

ঘনশ্যামের স্ত্রী বিন্ধ্যবাসিনী প্রথম প্রথম আদরে ডুবিয়ে রেখে ছিল মনোরমা এবং তার ছেলে মেয়েদের। ক্রমশঃ তার আচরণে ফুটে উঠতে লাগল অমানুষিক কাঠিন্য এবং রূঢ়তা।

মনোরমার আর বুঝতে বাকী রইলনা যে, সে এই সংসারের একটা বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্পষ্টই সে একদিন বললে ঘনশ্যামকে.—ঠাকুরপো! আমি তোমার সংসারে ভালই আছি। এবার আলাদা বাসা করি। ঘনশ্যাম চমকে উঠে বললে,—সেকি বৌঠান? বাড়ী ভাড়া দেবেন কোত্থেকে?

মনোরমা মাথা নীচু করে ধীরস্বরে বললে,—কেন?—কারবারের অর্ধেক অংশতো আমার আছে?

ঘনশ্যাম ভাবে কারবারের প্রসংগ আর এড়িয়ে যাওয়া যায়না। জবাব একটা তৈরী করেও রেখে ছিল মনে মনে। বৌঠান! ছিল অর্ধেক কেন?—সবই আপনার ছিল। কিন্তু, আমার পোড়া অদেষ্টে সব-ই গেল।

যেন ভীষণ বজ্রপাতের আওয়াজে চমকে উঠল মনোরমা। সে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল ঘনশ্যামের দিকে।

ঘনশ্যাম কয়েকবার কেশে গলাটা সাফ্ করে নিয়ে একটা মনগড়া কাহিনী বিচিত্র ভংগী সহকারে বলে চললো। তারপর চোখ খুলে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছেড়ে বললে,—তখনই বলে ছিলাম, হরিধনদা! "লো রেটে" টেণ্ডার দেবেন না।

কারবার ডকে উঠে যাবে। আমার কথা কানেই নিলেন না। শেষে হরিধনদা ভদ্রাসন বিক্রী করেও কাজ তুলতে পারলেন না। একটু থেমে সে আবার বললে,— এইতো সেদিন নাকচ হয়ে গেল আমাদের কণ্ট্রাকট। যার নাম বারোটা বেজে গেল জয়েণ্ট কারবারের। তখন আমার ছেলে বিরুপাক্ষ ধার ধোর করে সেই কাজেই আবার নতুন করে টেণ্ডার দিলে।— দুঃখের কথা বলতে কি বৌঠান, আমি আছি এখন ছেলের হাত তোলায়। নৈলে আমার যা হয় হোক্, আপনারাতো রাজা।

— আমার কোন অংশ নেই ঠাকুরপো? ফ্যাল ফ্যাল করে ঘনশ্যামের দিকে চেয়ে থেকে বললে মনোরমা।

ঘনশ্যাম প্রচ্ছন্ন বাংগের সুরে বললে,— অংশ?— হ্যাঁ, দেনার অংশ ঘাড়ে পড়েছে বটে।— আর নাইবা থাকলো কারবারের অংশ। তা হলে কি আমি আপনাকে ফেলতে পারি বৌঠান? না আমার বিরুপাক্ষ কোনদিন তা পারবে?— তা হলে সে আমাদের দেনা ঘাড়ে নিল কেন বলুনতো, বৌঠান? কি তার গরজ?

মনোরমা কি বলবে! ভাষা হারিয়ে ফেলে সে। একটা আতংকে তার বুকখানা কেঁপে ওঠে। তবে সে কি আজ থেকে সর্বহারা। ঘনশ্যামের অনুগ্রহ ছাড়া তার বাঁচবার কোন পথ নেই, কোন অধিকার নেই?

ঘনশ্যামের অনুগ্রহ হোক্ কিম্বা না হোক্, বিন্ধ্যবাসিনী মনোরমাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। সে একদিন দাঁতে দাঁত চেপে

কঠোর স্বরে স্বামীকে বললে,—তোমার মতলব কি বল দেখি ? ভেড়ার পালের খোরাক জোগাব আমি, আর তুমি রোজ মনের আনন্দে তোমার বৌঠানের সংগে গুজুর-গুজুর করবে ?—কেমন ?

ঘনশ্যাম মাথা চুলকিয়ে আমতা আমতা করে বললে,—কই ?—তাতো করি না ?

বিন্ধ্যবাসিনী ঝংকার দিয়ে বলে উঠল,—কর না, আর দুদিন বাদে করবে। সেইরকমই দেখছি।

ঘনশ্যাম তার কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব মোলায়েম করে তোষামোদের স্বরে বলে,—আহা !—রাগ করো কেন, বিনু ? তোমার কাজের একটা দোসর তো পেয়েছ !

বিন্ধ্যবাসিনী ভেংচিয়ে বলে উঠল,—ওরে আমার দোসর রে ?—বলি দোসর আমার না তোমার ?

সবই শুনলে মনোরমা। দুঃসহ বেদনা ও গ্লানিতে মনোরমার দুটি চক্ষে কাতর অশ্রু মুক্তার মত দানা বেঁধে উঠল। সে ঘনশ্যামের বসবার ঘরে এসে অশ্রুসজল কণ্ঠস্বরে বললে,—সর্বস্ব খোয়ালাম। ভদ্রাসন গেল। যেটুকু বাকী ছিল, অদৃষ্টে তাও হলো।

ঘনশ্যাম ইজিচেয়ারে শুয়ে আরামে চোখ বুজিযে গড়গড়া টান ছিল। উঠে বসে এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে অনাসক্তের স্বরে বললে,—বিরুর মাটা একটা পাগলী। তবে ও যখন ধরেছে, তখন মানে মানে সরে পড়াই ভাল।

—আমি কোথায় যাব, ঠাকুরপো ?

ঘনশ্যাম তর্জনী হেলিয়ে কণ্ঠস্বরে একটু বীররসের দমক দিয়ে বললে,—হতো আমাদের কারবার কিম্বা আমার বাড়ী, ঘর-দোর—কারও সাধ্য ছিল যে, ঘাড় ধরে কথা কয় ?

মনোরমা বললে,—বেশ ! আমি যাচ্ছি। তোমার কাশীপুরের বস্তির মধ্যে একটা ঘর আমায় দেও, ঠাকুরপো। অবশ্য বিনা ভাড়ায় চাইছি না।

ঘনশ্যাম অবাক হয়ে বললে,—সেকি বৌঠান ? ভাড়া দেবেন কোত্থেকে ?

—রাঁধুনি বৃত্তি করবো। আমার সুমিতাও ছেলে-মেয়ে পড়াতে পারবে।

ঘনশ্যাম বিস্ফারিত নেত্রে বলে উঠল,—তার মানে ? কতদূর পড়েছে আপনার বড় মেয়ে ?

মনোরমা ম্লান হাস্যে বললে,—জানে একটু আধটু। ম্যাট্রিক পাশ করেছে।

ঘনশ্যাম দুচোখ কপালে তুলে বললে,—অ্যাঁ ! ঐ মেয়ে ম্যাট্রিক পাশ ? তারপর বিস্ময়ের ভাব কেটে যেতে ধীরে ধীরে বললে,—বড় বাড়াবাড়ি ছিল হরিধনদার। বড় বাজে পয়সা নষ্ট করতেন এমনি করে। মেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করে কি ভাঙা ঘর জোড়া দেবে ? তার চেয়ে বিয়ে দিলে আপনার একটা অভিভাবক তো হতো ?—বলুন, বৌঠান ?

মনোরমা চিন্তাচ্ছন্ন বিষাদক্লিষ্ট মনে উত্তর দিল,—আমার স্বামী

যা ভাল বুঝেছিলেন. তার ওপর আমার বলবার কিছু নেই। শিক্ষা বিষয়ে তাঁর একটু বেশী উৎসাহ ছিল, সে ছেলেই হোক্, আর মেয়েই হোক্।

—ঐ আমাদের দোষ বৌঠান।—এইতো আমার বিরুপাক্ষ 'ক' অক্ষর গো-মাংস। কেমন ব্যবসা করছে। দাঁড়াক দিকি তার সামনে একটা বি এ, এম্ এ?—আর পড়া-শুনো?—তাওবা কম্ কিসে? রোজ খবরের কাগজ কেনে, ম্যাপ দেখে। আইন-আদালতের খবর, যুদ্ধের খবর, বাজার দর—সব ওর ঘনখস্থ। নখের আগায়-আগায়।

শ্যাম একটু চুপ করে আবার বললে,—আমি বলি, বাড়ী যান বৌঠান। সেখানে দিবুকে একটা দোকান খুলে দিন। মনোরমা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললে,—তাও যদি করতে হয়, টাকাই বা আমার কই? আর, কলকাতায় যা হবে, তাকি আর পাড়াগাঁয় করা চলবে?

ঘনশ্যাম চিন্তিত মনে উঠে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পায়চারী করে কিছু না বলেই চলে গেল।

অবশেষে সুমিতারা কাশীপুরের বস্তির একটা খোলার ঘরে উঠে এল। বিরুপাক্ষর বুকখানা এক চঞ্চল অনুভূতির স্পর্শে কেঁপে উঠল। শিকার এবার মুঠোর মধ্যে।

বহুদিন থেকেই তার লুব্ধ দৃষ্টি ছিল সুমিতার ওপর। ক্ষুধিত অজগরের মত শাণিত দুটি চক্ষু স্থির হতো এসে যৌবন তনু-

তটে—নারী দেহের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ এবং দুর্বার লোলুপতায়।

বন্ধুবান্ধব নিয়ে কামনার কুৎসিং উৎসব চলে শ্যামবাজারের বাগান বাড়ীতে। মদের ফেনিল স্রোতে এবং দুর্গন্ধ ক্লেদে পিচ্ছিল হয়ে ওঠে প্রমোদশালা।

মিঃ গফুর প্রায়ই আসেন বিরুপাক্ষের বাগানবাড়ীতে। নারী-দেহের উপঢৌকন গ্রহণ করে পরিতৃপ্ত হ'ন। তাই তাঁর অসম্ভব সুদৃষ্টি বিরুপাক্ষর ওপর কোন এক কণ্ট্রাক্টের ব্যাপারে।

সেদিন বিরুপাক্ষর বাগান বাড়ীতে ফরাসের ওপর বসে তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে মধ্যমণির মত অবস্থান করছিলেন গফুর সাহেব। তাঁর পাশে বিরুপাক্ষ এবং ইয়ার বক্সীর দল।

মদের ফোয়ারায় দাপাদাপি চলেছে ইয়ার বক্সীদের। সুন্দরী বাঈজীর অশ্লীল সংগীত। আর ওদিকে দুমুঠো ভাতের বিনিময়ে সংগ্রহ করে আনা কতকগুলো ডাগর মেয়ে। —জীর্ণ, শীর্ণ, বুভুক্ষু মেয়ে। —বোকা বোকা মেয়ে গ্রামথেকে নতুন সহরে এসেছে পেটের জ্বালায়।

গফুর সাহেব অতর্কিতে মদের গেলাসটা দেওয়ালে ছুড়ে মারলে। দেওয়ালে লেগে কাঁচের টুকরোগুলো ঝন্ ঝন্ শব্দে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। দারুণ বিরক্তিতে মুখখানা বিকৃত করে সে বললে,—রোজই একঘেয়ে। ভাল মেয়ে কি উবে গেছে দেশ থেকে?

বিরুপাক্ষ মুখখানা কাঁচুমাচু করে বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে বললে,—আজ এই চলুক স্যার। ভাল জিনিষ একদিন খাওয়াব আপনাকে। গফুর সাহেব ভ্রুকুঞ্চিত করে বললে,—আপনাদের বস্তিতে একটা ঘরে আজ কারা উঠে এলেন, বিরুপাক্ষবাবু ?

—ওরা আমাদের বাড়ীতে ছিল। ওদের ভেতরে একটি—

গফুর বাধা দিয়ে বললে,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তার কথাই বলছি। কতদিনে আনতে পারবেন এখানে? বিরুপাক্ষ মুখখানা কাঁচু মাচু করে বললে,—একটু সময় দিতে হবে, স্যার। লেখাপড়া জানে মেয়েটি।

—চাকরীর লোভ দেখান।—আঃ কিছু জানেন না!

বিরুপাক্ষ কৃতাঞ্জলিপুটি গদ্ গদ্ স্বরে বললে,—আজ্ঞে, সবই জানি। কুকুর বেড়ালে ছেয়ে গেছে দেশটা। এক এক জন এক এক রকম চায়।

পরের দিন সন্ধ্যেয় বাগানবাড়ীতে না এসে বিরুপাক্ষ সটাং চলে এল বস্তিতে।

মনে আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব: কম্পিত বক্ষ। তবু সাহস করে মনোরমার সামনে এসে দাঁড়াল বিরুপাক্ষ।

—আমার বাবা একটা চামার জ্যেঠাইমা। নৈলে কুকুর বেড়ালের মত বস্তিতে পাঠিয়ে দেয়।

মনোরমা বিরুপাক্ষকে হঠাৎ আসতে দেখে প্রথমটা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর প্রকৃত ব্যাপার একটা

অনুমান করে জিভ কেটে বললেন,—ছিঃ বাবা! বাবার নামে বলতে নেই ওসব কথা। সবই আমার অদৃষ্ট!

বিরুপাক্ষ উত্তেজিত হয়ে বললে,—হক্ কথা বলতে বিরুপাক্ষ ছাড়েনা। সে বাবাই হোন্, আর ঠাকুরই হোন্।—তবে আমি এসেছি এই জন্যে যে, আপনার রাঁধুনিগিরি করা চলবেনা। বাবার অপমান না হোক্, এতে আমার অপমান।

মনোরমা ম্লান হাস্যে বললে,—খাব কি?—আর বস্তির ভাড়া?

বিরুপাক্ষ অবজ্ঞার সুরে বললে,—এই কথা? কারবারে আপনার অর্ধেক অংশ নেই?

মনোরমা ছলছল চোখে বললে,—সে সবতো চুকে বুকে গেছে বিরুপাক্ষ?

—না চুকে যায়নি। দুবছর বাদে দিব্যেন্দু ম্যাট্রিক দিয়ে যখন কাজ দেখবে, সেই দিনই চুকবে, জ্যেঠাইমা।—এই আমি আপনার পা ছুঁয়ে বলছি,—

—বলতে বলতে বিরুপাক্ষ হঠাৎ মনোরমার পায়ের গোড়ায় বসে পড়লো।

মনোরমা শশব্যস্তে বিরুপাক্ষকে হাত ধরে উঠিয়ে তার চিবুক স্পর্শ করে সস্নেহে বললে,—না, বাবা। অবিশ্বাস করবো কেন?—সে যাই হোক্। এখন আমার চলে কি করে?

বিরুপাক্ষ মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উত্তর দিলে, আমি সেই

কথাই বলতে এসেছি, জ্যাঠাইমা। সুমিতা যদি চাকরী করে তো বলুন, জোগাড় করি।

সুমিতা বিরুপাক্ষের জন্যে চা নিয়ে আসে। মনোরমা আসন পেতে দেয়। সুমিতা চাএর কাপটা আসনের সামনে রাখতে রাখতে মনোরমার হয়েই প্রশ্নের উত্তর দিল,—ভাল চাকরী যদি হয়, নিশ্চয়ই করব, বিরুপাক্ষদা।

সুমিতার সংগে এই প্রথম আলাপনে বিরুপাক্ষের শরীরে একটা চঞ্চল শিহরণ জেগে ওঠে। উন্নত পুরন্ত বুকের ওপর শতছিন্ন বস্ত্রের ফাঁকেফাঁকে জেগেওঠা শুভ্র, সুশ্রী দ্বীপগুলো বাঁকা চোখে দেখে মাতাল হয়ে যায় বিরুপাক্ষ।

বিরুপাক্ষ আসনের ওপর বসে চা-এর কাপে একটা চুমুক দিয়ে বললে,—তবে রোজ আমার সংগে ঘুরতে হবে যে সুমিতা?—আর না হয়তো তুমি একাই যেও। আমি ঠিকানাগুলো তোমার হাতে —

সুমিতা বাধাদিয়ে বললে,—বাঃরে! আমি কলকাতার কিছু চিনি নাকি?

মনোরমা স্নিগ্ধ স্বরে বললে,—তোমার সংগে যাবে, তুমি বড় ভাই। দোষ কি বাবা বিরুপাক্ষ!

চাকরীর নাম করে ক'দিন সুমিতাকে সিনেমায় নিয়ে গেল বিরুপাক্ষ। কথার কারসাজিতে তাকে ভুলিয়ে রাখে।

—গ্যাসটন এণ্ড কোং এর ফার্মটা আজ দেখলাম খুব ভাল।

চাকরী ও একটা হতো। কিন্তু এপর্যান্ত কোন মেয়ে সম্মান রেখে চাকরী করতে পারেনি।

জীপে পাশাপাশি চলেছে দুজনে ভবানীপুরের দিকে। বিরুপাক্ষর কথা শুনে সুমিতার চক্ষু দুটি বিষণ্ণ, স্থির হয়ে যায় নিষ্কম্প দীপশিখার মত।

—তবে কি চাকরী হবেনা, বিরুপাক্ষদা ?

—হবে।—আলবৎ হবে।—তোমাকে এইজন্যে বল্লাম যে, তুমি হয়তো ভাবছ, কেন এখনো একটা অফিসেও নিয়ে যাচ্ছিনা, আমি।

—সেকথা বলেছি কোনদিন ?

—না, বলনি। তবে তোমার জেনেরাখা দরকার· কেননা, জ্যাঠাইমা জিজ্ঞাসা করতে পারেন।—মানে কথা, যেখানে চাকরী হবে বুঝবো শুধু সেইখানেই নিয়ে যাব।—অর্থাৎ যেখানে বিয়ে হবে নিশ্চয়ই—সেইখানেই কথাবার্তা।—হন্যে কুকুরের মত তোমায় ঘুরতে দেবনা অফিসে, অফিসে !

এমনি ভাবে কয়েকদিন গেল। সিনেমা দেখে বাড়ী ফেরবার আগে কিছু চক্‌চকে টাকা সুমিতার হাতে গুঁজে দিয়ে বিরুপাক্ষ বললে,—চাকরী হলেই শোধ দিও সুমিতা।

ক'দিন বিরুপাক্ষর আর দেখাই নেই। চিন্তাচ্ছন্ন হয়ে বসে আছে মনোরমা।

সুমিতাকে মনোরমা জিজ্ঞাসা করলে,—হ্যাঁরে, বিরুপাক্ষর দেখা নেই—কি হলো বল্, তো ?

সুমিতা বিষণ্ন শূন্যদৃষ্টিতে মার দিকে চেয়ে বললে,—কি জানি?—চাকরীর চেষ্টা করা ছাড়া, নিজের কাজকর্ম্মও তো আছে, মা।

মনোরমা কি ভেবে ধীরে ধীরে বললে,—ছেলেটি খুব ভাল।—সত্যি কথা বলতে কি, আমি ভেবেছিলাম অন্য রকম। বুকটা কেঁপেও উঠেছিল।

সুমিতা মনোরমার মুখে হাত চাপা দিয়ে তিরস্কারের স্বরে বললে;—কি বলছ মা, যা, তা! বিরুপাক্ষদার মত এমন মহৎ আর হবে না, মা।—আমি দেখছিনা?

এমন সময় দোর ঠেলে কে ঝড়ের মত এসে ঘরে ঢুকলো।

সুমিতা গালে আঙুল দিয়ে হাসতে হাসতে বললে,—আপনার নাম হচ্ছিল বিরুপাক্ষদা। অনেকদিন বাঁচবেন।

মনোরমা স্নিগ্ধ-স্বরে প্রশ্ন করলে,—এতদিন আসনি কেন বাবা?

বিরুপাক্ষ হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তর দিল,—চাকরীর জন্যে।—একটা চাকরী জোগাড় করেছি এতদিনে।

সুমিতা আহ্লাদে গদ্‌গদ্ স্বরে বললে,—সত্যি, বিরুপাক্ষদা?

বিরুপাক্ষ উত্তর দিল,—হ্যাঁ গো, হ্যাঁ। তা নয়তো কি মিথ্যে?—জ্যাঠাইমা এক কাপ চা নিয়ে আসুন।

মনোরমা চলে গেলে বিরুপাক্ষ বললে,—একশো টাকা মাইনে। এই নেও আগাম পঞ্চাশ টাকা। —কাজ রাত্তিরে।

—দিনে নয়? প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে প্রশ্ন করলে সুমিতা।

মনোরমা চা নিয়ে এল। বিরুপাক্ষর শেষের কথা শুনে মনোরমাও সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলে,—দিনে কাজ নয়?

বিরুপাক্ষ হা হা করে হেসে বললে,—সেদিন নেই জ্যেঠাইমা। এযে যুদ্ধের সময়। দিন রাত কাজ হচ্ছে এখন। তবে আমায় যদি বিশ্বাস করেন তো বলতে পারি, কোন ভয় নেই সুমিতার। মনোরমা জিভ কেটে উত্তর দিল.—সেকি বাবা! নিজের মেয়েকে অবিশ্বাস করতে পারি, কিন্তু তোমায় পারি না।

সেই রাত্রেই বিশ্বাস, অবিশ্বাসের পালা শেষ হয়ে গেল। মিথ্যার নগ্নমূর্তি এবং পশুত্বের স্পর্ধা দেখে ঘৃণায় সুমিতার সর্বাংগ রি-রি করে জ্বলে উঠল।

ব্ল্যাক আউটের অন্ধকার। সারা কলকাতা যেন কালো কাপড় দিয়ে মোড়া। যানবাহনের চলাচলও ক্রমে মন্থর হয়ে আসছে। শ্যামবাজারের উপকণ্ঠে নির্জন পল্লীর মধ্যে নিশীথ রাত্রে বিরুপাক্ষর জীপ থামতে সুমিতা পাংশুমুখে বললে,—এতদূরে অফিস? আর এত নিরালায়? চারদিকে তো জংগল?

বিরুপাক্ষ সুমিতার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললে,—ভয় কি সুমিতা?

সুমিতার মনে হলো বিরুপাক্ষর কণ্ঠস্বর কেমন যেন অস্বাভাবিক। স্পর্শে যেন জ্বলন্ত উত্তাপ।

বিরুপাক্ষ হো-হো করে হেসে উঠে বললে,—খুব ভয় পেয়েছ, সুমিতা। যুদ্ধের অফিস নিরিবিলি না হলে বোমার ভয় নেই?—আর যতটা ভয় করছো, ততটা নির্জন নয়। ব্ল্যাক-আউট বলে মনে হচ্ছে ওরকম।

সুমিতা বিরুপাক্ষের কথা শুনে লজ্জিত হয়ে উঠল মনে মনে।

বিরুপাক্ষর হাত ধরে হেসে এগিয়ে গেল বাগান বাড়ীর মধ্যে।

তারপর স্তম্ভিত হয়ে গেল সুমিতা। তার পায়ের তলায় মাটি দুলে উঠল। বিশ্বাসের পৃথিবী যেন ভেংগে চুরমার হয়ে গেল।

অর্গলবদ্ধ ঘরে সুমিতার দুদিকে দুটো ক্ষুধিত মাতাল। তাদের প্রসারিত বাহু সুমিতাকে দলে পিষে ফেলবার জন্যে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

সুমিতা আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠল,—বিরুপাক্ষদা!—একি?

বিরুপাক্ষ জড়িতস্বরে বললে,—কেন? খারাপটা কি হয়েছে শুনি?—চাকরী করবে বলে আগাম দিয়েছি! এবার কর চাকরী?

—মাইরী! শ্মশ্রুশোভিত চিবুকটি দুলিয়ে বললে, গফুর সাহেব।

সুমিতা রূঢ়-স্বরে বললে,—আপনার টাকা ফিরিয়ে দেব বিরুপাক্ষদা।

বিরুপাক্ষ সব্যংগে বললে,—আর খেপে-খেপে যে টাকাগুলো নিয়েছ, সাড়ী নিয়েছ? —কে দিয়েছেন জান?—আমার দয়াল মনিব গফুর সাহেব।—বলে ইংগিতে বিরুপাক্ষ দেখিয়ে দিল গফুরকে।

গফুর মদের বোতলটী সুমিতার সাম্নে ধরে বললে,—পেয়ালায় সরাব ঢেলে মুখে ধর মাইরী।

সুমিতা ত্রস্তা হরিণীর মত চঞ্চল পদক্ষেপে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

গফুর ছুটে গিয়ে সুমিতাকে জাপ্টে ধরে বললে,—কোথায় পালাবে যাত্ন ?

তারপর ত্নজনে ধরাধরি করে সুমিতাকে ফেললে ফরাসের ওপর। আলু-থালু বেশ সুমিতার। ধস্তাধস্তিতে শিথিল কবরী। মুহুর্তের মধ্যে সর্বনাশ হয়ে যাবে।

সুমিতা সাহসে বুক বাঁধলো। মূহুর্তের জন্য বিত্ন্যতের ঝিলিক খেলে গেল ত্নটি ভীরু চোখে।

সুমিতা ওষ্ঠপ্রান্তে মিষ্টি হাসি জোর করে টেনে এনে বললে,—দিন্, বোতল দিন।

গফুর সাহেব সুমিতাকে ছেড়ে দিয়ে হেসে বললে,—তবে ন্যাকামি করছিলে, কেন বিবিসাহেব ?

বিরুপাক্ষ অট্টহাসি হেসে বলে উঠল।—সতী-পানা হচ্ছিল !

—না, ভাই ?

হ্যাঁ।—বলে গ্রীবা বেঁকিয়ে মৃত্ন হেসে গ্লাসে মদ ঢালতে আরম্ভ করলে সুমিতা।

গফুর এবং বিরুপাক্ষ ত্নজনে ভাল করেই জানে অর্থের কাছে কতক্ষণ নারীর সতীত্ব। অর্থনৈতিক ত্নর্দিনে এরা পণ্যদ্রব্যের মত নারীর দেহ নিয়ে বেচা-কেনা করছে আজও।

জানোয়ার ত্নটোর অশ্লীল বেসুরো সংগীতে কুৎসিৎ নোংরা হয়ে ওঠে আবহাওয়া। উল্লাসে তারা আত্মহারা।

হঠাৎ সুমিতা ত্নহাতে ত্নটো বোতল নিয়ে প্রচণ্ড শক্তিতে ছুড়ে মারলো উন্মত্ত পশু ত্নটোর মাথা লক্ষ্য করে।

জানোয়ার দুটো আর্তনাদ করে পড়ে গেল।

মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা না করে সুমিতা ঘরের কপাট খুলে ঝড়ের মত বেগে ছুটে বেরিয়ে এল রাস্তায়।

(আট)

ঘনশ্যামের তর্জন গর্জনে বস্তির মধ্যে ভীড় জমে গেল।

বিরুপাক্ষর মাথায় বাঁধা রক্তাক্ত ফেট্টির দিকে অংগুলি নির্দেশ করে ঘনশ্যাম ক্রুদ্ধস্বরে বললে,—ভাড়া চেয়ে পাঠিয়েছিলাম বলে কি করে খুন করেছে—দেখ, তোমরা!

জনতার ভেতর থেকে এক ব্যক্তি বললে,—হঠাৎ কি হলো বাবু? উনি তো পেরায়ই ছুঁড়ীটাকে নিয়ে বেড়াতে যেতেন।

ঘনশ্যাম বললে,—ছেলে আমার খুব পরোপকারী, তাই মেয়েটাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াত চাকরীর সন্ধানে। তা চাকরী না হলে ভাড়া চাইতে পারব না, এ কোন্ দেশী কথা? না হয়, না-ই দিলি! তাই বলে এমন মারলি যে, একেবারে খুন করে ফেললি?

ঘনশ্যামের চরিত্রের কথা অবিদিত নয় কারও। কে একজন ভীড়ের মধ্যে মাথা লুকিয়ে সব্যংগে বললে,—ফৌজদারী করুন, বাবু।

ঘনশ্যাম হাড়ে হাড়ে জানে, ফৌজদারী করলে উল্টো চাপ কোন্ দিকে পড়বে। তাছাড়া জেরার চোটে পার্টনারসিপ্ বিজ্‌নেস ব্যাপারের অনেক গ্রন্থি খুলে যাওয়াও একেবারে বিচিত্র নয়।

ঘনশ্যাম বললে,—কোটে আমার চোদ্দ পুরুষ কখনো যায়নি, আর আমি যাব?—বিচারকর্তা যিনি, ঠিক বিচার করবেন তিনি। তবে আমার বস্তিতে এই খুনেদের কিছুতেই রাখব না, তা স্পষ্টই

বলছি। আজ আমাদের ছেলেকে মেরেছে, কাল তোমাদের মারবে।

সমবেত জনতার ভেতর থেকে পুনরায় প্রচ্ছন্নভাবে থেকে পূর্বোক্ত লোকটি বলে উঠল,—মেয়েদের নিয়ে চাকরী-বাকরী খুঁজে বেড়ালে ওরকম একটু আধটু মারধোর হয় বৈকি! আমাদের ও বালাই নেই, আমরা মার খাব কেন?

ঘনশ্যাম ক্রোধান্ধ হয়ে চীৎকার করে উঠল,—কে! কে!—কে কথা কইছে? দূর করে দেব না, বস্তি থেকে!

তারপর ঘনশ্যাম সদলবলে সুমিত্রাদের বাড়ীর ভেতর হানা দিয়ে হাতের কাছে যা পেল—বাক্স, প্যাঁটরা, বালিশ, বিছানা—সব নির্মমভাবে তছ্‌নচ্‌ করে ছুড়ে ফেলে দিতে লাগল। সুমিত্রার তথাকথিত অপরাধে কৈফিয়ৎ না চেয়ে তার ভায়ের চুল ধরে হিড় হিড় করে টেনে এনে ফেললো রাস্তায়।—তারপর চেঁচামেচি সুরু করে দিল।

—কবে থেকে বলছি, বাড়ী ছেড়ে দিতে! কথা কানেই যায় না! ভাড়া চেয়েছি বলে ছেলে খুন! দেখি, উঠে যাস্‌ কিনা? আজ তোদের একদিন কি আমার একদিন।

ক্ষমতার দম্ভ এবং পশুত্বের স্পর্ধা দেখে পাথরের মত শক্ত এবং আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইল মনোরমা। তারপর ছেলে মেয়ের হাত ধরে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল বস্তি থেকে।

নিরাশ্রয়ের পরম আশ্রয় শিয়ালদহ স্টেশন। আর্ত হাহাকার আর তীব্র জ্বালা অন্তরে নিয়ে যাত্রীর সহস্র কুৎসিৎ দৃষ্টির সামনে আশ্রয় পায় সর্বহারার দল।

অনাহারে কাটলো একদিন।

মনোরমা বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে সুমিতাকে বললে,—বাড়ী ফিরেই যাই আবার। নৈলে এখানে শৃগাল-কুকুরের মত মরতে হবে।

বেদনা এবং অনুশোচনায় নিষ্প্রভ সুমিতার দুটি নেত্র। সে রুক্ষস্বরে বলে উঠল,—ঐশ্বর্যের লোভে সবই তো হারিয়েছ, মা। ঐশ্বর্যের বাড়া যে সম্বল সেটুকুও হারাতে বসেছিলাম আমি। এখন খাবে কি বাড়ী গিয়ে? আর বাড়ীই বা কোথায়?—সেতো বাঁধা পরের কাছে।

মনোরমা বললে—একদিনতো না খেয়েই কাটলো।

সুমিতা দৃঢ়স্বরে উত্তর দিল,—এসেই যখন পড়েছ, তখন এখানে থাকতেই হবে। মরলে এখানেই মরতে হবে। তবু কেউ জানতে পারবে না।

একটু থেমে সে আবার বলতে লাগলো,—গ্রামে গিয়েও কি নিষ্কৃতি আছে মা? দুর্ভিক্ষ লেগেছে গ্রামে। মানুষ ছুটে পালাচ্ছে গ্রাম থেকে সহরে। ক্ষিদের জ্বালায় ছুটে আসছে কাতারে-কাতারে। সহরের রাজপথে বুভুক্ষুর মিছিল। ফ্যান খেয়ে, ডাষ্টবিন থেকে খাদ্য-সংগ্রহ করে—কিংবা দেহ দান করে একদিকে বাঁচবার জন্যে আকুলতা; আর একদিকে রাস্তায়, ফুটপাথে, পার্কে, ময়দানে ছটফট করতে করতে পথিকের নিষ্করুণ দৃষ্টির সামনে বুভুক্ষার চিরসমাপ্তি।—ছিয়াত্তরের মন্বন্তরেও এমন হয়নি মা! তখন আতিথ্য-ধর্ম, স্নেহ, মমতা, দয়া, মায়া, সেবা—সবই ছিল; কিন্তু, আজ মানুষ পশুত্বের

ধাপে নেমে এসেছে। কারও জন্যে কারও চোখের জল পড়ে না।—আর্ত হাহাকার দেখে ব্যংগ করে শুধু উল্লাস এবং কৌতুকের অট্টহাসি। একজনের দুঃখে আর একজন আহ্লাদে নেচে ওঠে।—বলতে বলতে সুমিতা প্লাটফরম থেকে বেরিয়ে এসে রাস্তায় নামলো।

মনোরমা এগিয়ে এসে কম্পিত স্বরে জিজ্ঞাসা করলে,—কোথায় যাচ্ছিস সুমি?

—রাস্তায় যখন বেরিয়েইছি, তখন আর জিগ্যেস করা কেন মা?—অদ্ভুতভাবে কথাটা বলে সুমিতা জন সমুদ্রের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

সেইদিকে চেয়ে এক ভয়াবহ কল্পনায় শিউরে উঠে কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়লো মনোরমা। নিজের অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে লাগল মনে মনে।

বিকেলে ছুড়তে পুড়তে মুখ রাঙা করে ফিরে এল সুমিতা। চোখের কোণে একটুকরো পরিতৃপ্তির আলো। মায়ের রুক্ষ মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে বললে,—চল মা। বাসা পেয়েছি।

মনোরমাকে দ্বিতীয় কথা বলবার অবসর না দিয়ে এক ভাইকে কোলে নিয়ে আর দিব্যেন্দুর হাত ধরে এগিয়ে চললো সুমিতা। হায়াৎ খাঁ লেনে রাস্তার ধারে ছোট একতলা বাড়ী। ঘরের সজ্জা মোটামুটি। সুমিতার হাতেও আছে কিছু টাকা।

মনোরমা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুমিতার দিকে চেয়ে রূঢ়স্বরে বললে,—সুমি! গংগায় কি জল নেই?

সুমিতা হেসে বললে,—তোমার মেয়ে যদি সেইরকমই হবে, তবে আর সেদিন ছুটোকে ঘায়েল করে বাড়ী ফিরতো না; কিংবা তোমাদেরও কাশীপুর ছাড়তে হতো না, মা! আমি মিলিটারী ক্যানটিনে দু এক মাসের জন্যে একটা কাজ পেয়েছি।

মনোরমা হর্ষোৎফুল্ল হয়ে বললে,—অ্যাঁ! সত্যি!

সুমিতা উত্তর দিল,—হ্যাঁ, মা সত্যি। তোমার গুণধর "দেওরপোটির" সংগে না বেরিয়ে নিজে রাস্তায় বেরুলে বোধহয়, ভালই হতো। এখন তা-ই ভাবছি।

—কিন্তু, বেশীদিনের তো চাকরী নয় মা?

—খবরের কাগজে দেখলাম, যুদ্ধের জন্যে অনেক নার্স চাই। জরুরী দরকার বলে একটু-আধটু ট্রেনিং দিয়েই কাজ দেবে। রোজ বিজ্ঞাপন দিচ্ছে মা। এটা শেষ হয়ে গেলে নার্শের কাজে ঢুকবো, ভাবছি।

মনোরমা আঁৎকে উঠে বললে,—লড়ায়ে গেলেতো ফিরে আসে না অনেকে!

সুমিতা মনোরমার পায়ের ধুলো নিয়ে বললে,—তোমার আশীর্বাদ থাকলে শুধু ফিরে আসবো না নয় মা, ফিরে এসে দেখবো যে, দিবু ম্যাট্রিক পাশ করে আমাদের ভার নিতে পেরেছে।

তারপর সুমিতা দিব্যেন্দুকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললে,—কিরে দিবু! পারবি তো ভার নিতে?

দিব্যেন্দু ছলছল চোখে উত্তর দিল,—পারবো।

সুমিতা দিব্যেন্দুকে স্কুলে ভর্তি করে দেয়। তারপর ক্যান্টিনের চাকরীর পর যথাসময়ে ট্রেনিং শেষ করে ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগ দেয়।

মাল্টার ইম্‌টার্কা হাসপাতালে কিছুদিন চাকরী করে সুমিতা বদলি হয়ে এল ডাঃ ব্যানার্জির অধীনে।

ভারতবর্ষ ছেড়ে অনন্ত মহা-সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দিয়ে তার বুকটা প্রথমে কেঁপে উঠেছিল। তারপর সে অনন্তের মাঝখানে প্রথম সূর্যোদয়ের মত নিরীক্ষণ করে এই পলিতকেশ বৃদ্ধটিকে।

ডাঃ ব্যানার্জি ভাবেন, আগুনে পুড়ে মেয়েটির চরিত্রে এবং স্বভাবে খাঁটি সোনার বর্ণ এবং ঔজ্বল্য যেন ঠিকরে পড়ছে। সুদূর রণাংগণে আহত এবং মুমূর্ষুদের মধ্যে যে মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে অভয়দাত্রী দেবীর মত; সুযোগ পেলে সেকি হতে পারতোনা একটি ক্ষুদ্র সংসারের অন্তঃপুরে আপন মহিমায় মহিমান্বিতা মহিষী?

ডাঃ ব্যানার্জি খুব ভালবাসেন সুমিতাকে। অবসর সময়ে সুমিতার বাড়ীর খবর নেন, সান্ত্বনা দেন, উপদেশ দেন।
সেদিন আলেকজান্দ্রিয়ার সমুদ্রসৈকতে বসে এমনি কথা বার্তা হচ্ছিল দুজনের মধ্যে।

ডাঃ ব্যানাজির এমনি প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে সেদিন সুমিতা বললে,—
হ্যাঁ, আজই টাকা পাঠিয়েছি, ডাঃ ব্যানার্জি।

ডাঃ ব্যানার্জি জিজ্ঞাসা করলেন,—যুদ্ধ থেমে গেলে কি করবে, ভেবেছ সুমিতা ?

সুমিতা হেসে বললে,—যুদ্ধের যেরকম পরিস্থিতি, তাতে যুদ্ধ থামবে বলে বিশ্বাস করেন কি, ডাঃ ব্যানার্জি ? জার্মানীতো অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে আসছে মিশরের দিকে।

নীলসমুদ্রের ওপর প্রায় অপস্রিয়মান সূর্য্যের ম্লান আলোর তরংগ। সেইদিকে স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে ডাঃ ব্যানার্জি বললেন,—আমি তোমার কথা অস্বীকার করি না, সুমিতা। সিরিয়ার ফরাসী বাহিনী ফ্রান্সের যুদ্ধবিরতির পরও তুমুল সংগ্রাম করেছে। কালকের খবরে শুনলাম, জেঃ মিটেলহ্সা ব্লীৎস্ক্রীগ্ আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে অবশেষে যুদ্ধ প্রত্যাহার করেছেন। মিত্রপক্ষের ডানহাত খসে গেল। রেড্ক্রশ জাহাজগুলো পর্যন্ত শত্রুর হিংস্র আক্রমণ থেকে পাচ্ছে না নিষ্কৃতি। তবু আমি আশাবাদী। আমি বিশ্বাস করি, বিশ্বজয় করেও শেষ পর্যন্ত নাৎসীদের হারতে হবে।

সুমিতা হেসে বললে,—আপনার বিশ্বাসই ঠিক হোক্। কিন্তু অদ্ভুত আপনার বিশ্বাস।

ডাঃ ব্যানার্জি বললেন,—একটা মূর্খেও বলবে, এক্সিস পক্ষের এযুদ্ধে জয় হবে। কিন্তু আমি বলবো, এক্সিস পক্ষের জিত্ হতে পারেনা যতক্ষণ তার মূল নীতি ফ্যাসিজ্ম্। স্বেচ্ছাচারের কিছুতেই জয় হতে পারেনা। আজ তুমি যাকে বলছো জয়, আমি বলব, সেটা জয় নয়কো, ব্লীৎস্ক্রীগ প্যারাসুট এবং

পঞ্চম বাহিনী-আক্রমণের ধোঁকাবাজীতে অভিভূত হয়ে আছে জনগণ। যেদিন জনগণের মোহ কেটে যাবে, প্রকৃত ব্যাপার উপলব্ধি করবে, সেইদিনই জনশক্তির প্রচণ্ড বিক্ষোভে চূর্ণ হয়ে যাবে অপরাজেয় নাৎসী শক্তির প্রমত্ত দম্ভ।

সুমিতা হেসে বললে,—সে যাই হোক্, যুদ্ধ না থামলেই ভাল, ডাঃ ব্যানার্জি। স্বীকার করি যুদ্ধ সর্বনাশ ডেকে এনেছে দেশে; কিন্তু আর একদিক দিয়ে বেকার সমস্যার করেছে সমাধান। নৈলে আজ আপনার বাংলার ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের দলকে ফ্যান খেয়ে ফুটপাথে ছট্‌ফট্‌ করে মরতে হতো।

ডাঃ ব্যানার্জি আর্দ্রস্বরে বললেন,—সেকথা আমি মানি, সুমিতা!

অন্ধকারে না হলে ডাঃ ব্যানার্জি দেখতে পেতেন এক জ্বালাময়ী দৃষ্টি সুমিতার চোখে। সে বললে,—রাস্তায় মেয়েদের ছটফট করে মরা অম্লান বদনে সহ্য করবেন, কিন্তু বাঁচবার জন্যে তাদের অন্য পন্থা কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না—এমনি নীতি বাগীশদের কি আখ্যা দেওয়া যায়, বলুনতো ডাঃ ব্যানার্জি?

স্তব্ধ হয়ে রইলেন ডাঃ ব্যানার্জি। চারিদিক নিস্তব্ধ। নিবিড় হয়ে আসছে রাত্রি। নিষ্প্রদীপ আলেকজান্দ্রিয়া সহরটা মিশে গেছে রাত্রির কালো অন্ধকারে।—সেই নিশীথ নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু জেগে আছে বাতাসের ঝাপ্টা আর ভূমধ্যসাগরের তরংগ ধ্বনি।

সমুদ্রের সৈকতভূমির নিঝুম নিস্তব্ধতায় গা ছম্ ছম্ করে ওঠে সুমিতার।

—চলুন, ডাঃ ব্যানার্জি। আর এখানে থাকা ঠিক নয়।

সুমিতা চঞ্চল হয়ে উঠে পড়ে এগিয়ে যায় ডকের দিকে।

পাশাপাশি চলতে চলতে ডাঃ ব্যানার্জি বললেন,—ভয় কি সুমিতা?—শত্রু তো নিশর অবরোধ করেনি।

—আমাদেরই অবরোধের ভয় বেশী ডাঃ ব্যানার্জি। আর আলেকজান্দ্রিয়ার ঐ আলখাল্লাধারী ভয়ংকর লোকগুলোকে বেশী ভয় করে আমার।

সত্যই কয়েকটি অস্পষ্ট মূর্তি পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছিল। ক্লান্তসন্ধ্যার কুণ্ডলিত কুয়াশা ভেদ করে জ্বল্ জ্বল্ করছিল অনেকগুলো ক্ষুধিত চক্ষু।

সুমিতার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই কে যেন তার ওপর লাফিয়ে পড়লো হিংস্র ব্যাঘ্রের মত। কে তুমি?—ইংরাজীতে ক্ষিপ্র কণ্ঠে বলে উঠলেন,—ডাঃ ব্যানার্জি।—সংগে সংগে তাঁর হাতের টর্চের আলো ঠিকরে পড়লো।

ডাঃ ব্যানার্জির হাত থেকে একজন টর্চখানা ছিনিয়ে নিল। মুহূর্তের আলোয় সুমিতা ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে দেখলে আক্রমণ-কারী আর কেউ নয়। সেই নিগ্রোটি—যার প্রাণদাত্রী সুমিতা নিজে।

উঃ কী বীভৎস মুখখানা! কালো, পোড়া মুখখানা লালসার আগুনে পুড়ে আরো বীভৎস হয়ে উঠেছে।

সুমিতা আর্তস্বরে বলে উঠল,—আমি সুমিতা মিত্র। আমি আপনার সেবা করেছি। আপনার প্রাণ বাঁচিয়েছি। আমি—আমি—

আর কথা বেরুলোনা। পৈশাচিক অট্টহাসি করে একদল পশু সুমিতার মুখ বেঁধে ফেললে তারই পরণের শাড়ী দিয়ে।

নিগ্রোদের সংগে তুমুল ধ্বস্তা-ধ্বস্তি চললো ডাঃ ব্যানার্জির। অবশেষে একজন তাঁকে ঠেলে ফেলে দিয়ে পদাঘাত করতে লাগল উপর্যুপরি।

যখন জ্ঞান হলো, তখন তিনি একা পড়ে আছেন সমুদ্র সৈকতে। কাণে আসে ক্ষীণ আর্ত চীৎকার ধ্বনি। নারীদেহ নিয়ে চলেছে বিজিত নিগ্রো সেনাদের পৈশাচিক বিজয়োল্লাস। অদূরে বিক্ষুব্ধ নীলাম্বুর নীল ললাট ঝল্‌সে ওঠে ক্রুদ্ধ বিদ্যুৎ রেখায়।

———

(নয়)

সুমিতা আর তাঁর জাহাজে ফিরে আসেনি। ডাঃ ব্যানার্জি আর তার কোন সন্ধানও পাননি। হয়তো উৎসবের পর অচৈতন্য রক্তাক্ত নারীদেহটা ভূমধ্যসাগরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে জীবনদাত্রীর পরম উপকারের শোধ দিয়েছিল নিগ্রোর দল।

ডাঃ ব্যানার্জির মন ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় দুঃসহ বেদনায়। সুমিতার প্রতি তাঁর প্রত্যেকটি সান্ত্বনা, প্রশংসা এবং আশ্বাস-বাণী মূর্ত হয়ে উঠে তাঁকেই ব্যংগ করে ওঠে।

ডাঃ ব্যানার্জি ভাবেন, সুমিতার সংগে সমুদ্র সৈকতে না বেড়ালে এই মর্মন্তুদ ঘটনা কখনো ঘট্‌তোনা। সুমিতাকে তিনি মিথ্যা আশ্বাস দিয়েছিলেন। সেই নিগ্রোটাকে কোর্টমার্শালে সাজা দিয়েও সুমিতাকে আর ফিরে পাওয়া যায়নি। তাঁর বুকের ভেতর আজও মোচড় দেয় সুমিতার স্মৃতি। সুমিতার নিঃসহায় মা, ভাই, বোনের কথা ভেবে আজও ডাঃ ব্যানার্জির চোখ দুটো জলে টল্ টল্ করে।

তারপর ঘটনা স্রোত আর এক বিচিত্র খাতে বহে যায়। তখন প্যালেষ্টাইনের ব্যাপার নিয়ে ইটালীয়ানরা বেশ ক্ষেপিয়ে তুলেছে অসভ্য বেদুইনদের।

ডাঃ ব্যানার্জি স্থল বাহিনীর ক্লিয়ারিং হস্‌পিটালের চার্জ নিয়েছেন। ইটালীয়ান বাহিনী বিজয়গর্বে মিশর সীমান্ত পর্যন্ত

এগিয়ে এসে সোল্লুম অধিকার করে নিয়েছে। ডাঃ ব্যানার্জির ক্লিয়ারিং হস্‌পিটাল পশ্চাদপসরণরত বাহিনীর সংগে সরে যায় মাসামাক্রূর দিকে।

হঠাৎ মরুর নৈশ অন্ধকারে ডাঃ ব্যানার্জির ট্রাক মূলবাহিনী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। চাকা বেকায়দায় পড়ে বসে যায় বালিতে। ট্রাকের মধ্যে ছিলেন ডাঃ ব্যানার্জি এবং লাইন অফ্ কমিউনিকেশনের মেডিক্যাল ইউনিটের জনকয়েক অফিসার,—মেজর স্মিথ এবং একটি য়ুরোপীয় নার্স।

যেন মহাভারতীয় যুগের পুনরাবৃত্তি। ভাগ্য বিড়ম্বিত। মেদিনীর ক্ষুধিত গ্রাস থেকে রথচক্র উদ্ধারের জন্য ব্যর্থ হলো সমবেত শক্তির প্রচেষ্টা। মরুর হিমশীতেও গলদঘর্ম যাত্রীর দল। বুঝিবা ট্রাকখানি তলিয়ে যায় বালুরাশির অতল গর্ভে।

মরুরাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে গর্জে উঠ্‌লো কতকগুলো রাইফেল এক সংগে,—গুড়ূম্! গুড়ূম্!

তারপর অতর্কিতে এসে পড়লো বেদুইনের দল। ডাঃ ব্যানার্জি অন্ধকারে গা ঢাকা দিলেন বালিয়াড়ির অন্তরালে।

তাঁর চোখের সামনে নির্মমভাবে নিহত হলো য়ুরোপীয় অফিসারের দল। নারীর ওপর অত্যাচার করে হত্যা করা হলো। তাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে মিলিটারী ট্রাক ভেঙে

চুরমার করে প্রোথিত করা হলো মরুসমুদ্রের অনন্ত গভীরতায়।

কি মধুর স্বভাব ছিল মেজর স্মিথের। শান্ত সৌম্য মুখখানি সদা প্রসন্নতায় জ্বল্ জ্বল্ করতো। এমন কর্তব্য-পরায়ণতা খুব কমই দেখা যায়। নারীর শ্লীলতাহানির অপরাধে একটা নিগ্রোকে সর্বসমক্ষে পদাঘাত করে তিনি চাব্‌কে দেন।

মেজর স্মিথের সেই লোমহর্ষণ হত্যার স্মৃতি আজও মনকে চঞ্চল করে তোলে। মহাত্মা যীশুর মত তিনি শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত অকম্পিত হয়ে উর্ধের দিকে চেয়ে ছিলেন।

সন্ধানী ট্রাকগুলো আসবার আগেই বোধহয় সরে পড়ে নৃশংস বেদুইন ডাকাতের দল ডাঃ ব্যানার্জির জ্ঞানহীন দেহটা নিয়ে। যখন জ্ঞান হলো, তখন তিনি বেদুইনদের একটা তাঁবুর মধ্যে পড়ে আছেন। হাত পা দড়ি দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধা। সামনে দাঁড়িয়ে ভীষণাকৃতি বেদুইন্ উম্‌দা। আপাদমস্তক আলখাল্লা। ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বাজর্খাই গলায় সে বললে,—ইংরেজ হলে এতক্ষণ তুমি এখানে না এসে কবরে শুয়ে থাকতে।—মুক্তির জন্যে কত মূল্য দিতে পারবে?

ডাঃ ব্যানার্জি বললেন,—আমি এই মরুভূমির মধ্যে টাকা পাব কোথায়?

উম্‌দা শাণিত দৃষ্টিতে ডাঃ ব্যানার্জির দিকে চেয়ে রুক্ষ স্বরে বললে,—তা আমি জানিনা; ঠিকানা দিচ্ছি, সেই ঠিকানায় টাকা আনিয়ে দাও।

অবশেষে ডাঃ ব্যানার্জি বাধ্য হলেন কায়রোর এক মিশরীয় বন্ধুকে চিঠি লিখতে। চিঠি নিয়ে গেল পঞ্চমবাহিনীর এক বিশ্বাসঘাতক।

কি সাংঘাতিক হিংস্র এই উম্‌দা। ডাঃ ব্যানার্জির কাছ থেকে মুক্তিপণ নিয়ে প্রাণ ভিক্ষা দিল বটে, কিন্তু তাঁকে নির্মমভাবে সঁপে দিল ইটালীয়ানদের হাতে।

উম্‌দা সব্যংগে বললে,—তোমাকে ইংরেজের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আমি আরবের দুষমণী করতে পারব না। তোমাকে প্রাণে মারিনি এই যথেষ্ট, ইচ্ছে হয়, ইটালীয়ানদের কাছে চাকরী কর।

ডাঃ ব্যানার্জি ঘৃণাভরে প্রত্যাখান করলেন উম্‌দার প্রস্তাব। অবশেষে তিনি যুদ্ধবন্দী হয়ে রইলেন সিদিবার্‌নীতে।

অবশ্য বেশীদিন যুদ্ধবন্দী হয়ে থাকতে হলোনা। জেঃ ওয়াভেলের অতর্কিত আক্রমণে সিদিবারনী অধিকৃত হোল,—বিশহাজার ইটালীয়ান সৈন্য ইংরেজের হাতে হোল বন্দী। ডাঃ ব্যানার্জিও ছাড়া পেলেন।

মুক্তি পেয়ে মাসা-মাত্রূর বদলে তিনি চলে এলেন কায়রো। কারণ, সিদিবার্‌নী অধিকৃত হলেও ফিল্ডমার্শ্যাল রেমেলের আফ্রিক্‌ বাহিনীর পাল্টা আক্রমণের দাপটে তখন মিশর সীমান্ত বিপন্ন।

ডাঃ ব্যানার্জির সংগে যখন সাগ্নিকের সাক্ষাৎ হয়, তখন বিজয়-লক্ষ্মী মিত্রপক্ষের প্রতি সুপ্রসন্না। জেঃ আচিনলেকের ব্রিটিশ

অষ্টমবাহিনী ফিল্ডমার্শ্যাল রেমেলের পিছু ধাওয়া করেছে প্রচণ্ড বিক্রমে। এক্সিস্‌পক্ষের আটলান্টিক ওয়াল প্রকম্পিত। ভূমধ্যসাগরে ইটালীয়ানদের সৌভাগ্যরবি অস্তমিত প্রায়।

নিজের জীবনের ঘটনাবলী বিবৃত করে ডাঃ ব্যানার্জি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে সাগ্নিককে বলেন,—একদিন তুমি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে বেদুইন দস্যুর নৃশংসতা, যেমন আমি করেছি।

সাগ্নিক্ বলে,—আমি অস্বীকার করিনা। কিন্তু তারা আশ্রিত-বৎসল। আপনি তাদের আশ্রিত ছিলেন না।

ডাঃ ব্যানার্জি বলেন,—যারা সমাজ মানেনা, শৃংখলা মানে না, তারা কৃপার পাত্র।

সাগ্নিক্ প্রতিবাদ করে বলে,—যারা সুমিতার দেহ নিয়ে ছিনিমিনি খেলে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে, তারা সমাজ এবং শৃংখলা মেনে কি শ্রেষ্ঠত্ব দেখিয়েছে বেদুইনদের চেয়ে ?

ডাঃ ব্যানার্জি বর্ণিত বেদুইন্ উমদা নৃশংস সন্দেহ নেই, কিন্তু সৌকতের উদারতা এবং অনুকম্পা অস্বীকার করতে পারেনা সাগ্নিক্। সে ভাবে, বেদুইনরা আশ্রিত-বৎসল, এবং কোন কারণ না হলে তারা নৃশংস হয় না। তাছাড়া নওয়ারা সকল নৃশংসতা, সকল রূঢ়তার অনেক ঊর্ধে। নওয়ারার মদির সান্নিধ্য সাগ্নিকের জীবনকে করেছে মধুময়।

*　　*　　*　　*　　*

হালুয়ান পাহাড়ের সানুদেশে এসে স্তম্ভিত হয়ে গেল সাগ্নিক্। একটা তাঁবুও নেই বেদুইনদের। প্রকৃতির মতই দুর্বোধ্য প্রকৃতির কোলে পালিত এই বেদুইনের দল। কি আশ্চর্য! —কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁবু নিয়ে? কোন্ দূর প্রদেশে—ফাইয়ুম অথবা দূর দামাস্কাসে?

কেন গেল নওয়ারা তাকে কথা দিয়ে? না-না-না সাগ্নিকের জীবনের মরুপ্রান্তে ওয়েসিসের মত এসে দাঁড়িয়েছিল মরু-বালিকা। মরুভূমির বুক চিরে সে তাকে খুঁজে বেড়াবে। সে আর কায়রোয় ফিরে যাবেনা।

হালুয়ান পাহাড়ের গা ঘেঁসে একটা পথ গেছে, সেই পথ দিয়ে এগিয়ে চললো সাগ্নিক্।

কৃষ্ণপক্ষের জ্যোৎস্না। চাঁদ উঠেছে এতক্ষণে। রাত্রির অন্ধকার ধুয়ে মুছে ভরে গেছে জ্যোৎস্নার আলোকিত শুভ্রতায়। চারিদিকে আলোকের তরংগোচ্ছ্বাস। জ্যোৎস্নালোকে দেখা যায় রাস্তার দুধারে কৃষ্ণচূড়ার রক্ত স্তবক। আর একধারে খর্জুর কুঞ্জ।

সাগ্নিক্ অবসন্ন হয়ে বসে পড়ে এক শিলাখণ্ডের ওপর—উইলো গাছের তলায়। হাতের সারেংগী আবার বেজে উঠল মাতাল হয়ে আকুলতায়, উন্মাদনায়। অন্তরের যে ক্ষুব্ধ আবেগ জমাট বেঁধে ছিল; সুর এবং সুরার স্পর্শে লঘু হয়ে ছড়িয়ে পড়লো আকাশে বাতাসে।

কখন পা টিপে টিপে এসে সাগ্নিকের অংগ সংলগ্ন হয়ে বসেছে যাযাবরী।

যখন চমক ভাংলো, তখন তার কাণে এলো যাযাবরীর প্রশ্ন, —তোমার বাজনায় কি কোন যাদু আছে মুসাফির?

সাগ্নিক্ অবাক হয়ে যায়। সত্যিই তো! কোন্ মায়ামন্ত্র টেনে নিয়ে এল যাযাবরীকে এই নিভৃত কুঞ্জবনে? তার সারেংগীতে কোথা থেকে এল এত সুর? শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীতে কি এমনি সুর ছিল, না হ্যামেলিনের বাঁশীওয়ালার বাঁশীতে এত আকর্ষণ ছিল? এত কাছে কখনো আসেনি।—আর এত নির্জনে।—উঃ কি ঘেঁসে বসেছে!

নওয়ারা বললে,—তান্‌ভায় যাচ্ছিলাম। তোমার বাজনা শুনে পথ থেকে ছুটে এলাম।

সাগ্নিক্ বললে,—উঃ কি যে ভাবনায় পড়েছিলাম।

নওয়ারা আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে মধুর স্বরে বললে,—তোমার কথা মত সারা সন্ধে ছটফট করেছি, মুসাফির!

—সত্যি? সাগ্নিকের থর-থর আঙুল দুটি স্পর্শ করে নওয়ারার দুটি রক্তিম গণ্ড।

আশ্চর্য! আজ আর বাধা দিলে না নওয়ারা। ধীরে ধীরে তার মাথাটা হেলে পড়ে সাগ্নিকের কাঁধের ওপর।

তারপর আরবী সুরা পানপাত্রে ঢেলে সাগ্নিকের মুখের সামনে ধরে বললে নওয়ারা,—পার্টিতে কি তুমি এমনি বাজনা বাজাও, মুসাফির?

সাগ্নিক্ চোঁ-চোঁ করে সবটুকু মদ নিঃশেষিত করে বললে,—তোমার স্পর্শে আমার সারেংগী যে প্রাণ পেয়েছে নওয়ারা।

—তবে বাজাও।

—তুমি নাচ।

নওয়ারা উর্বশীর মত দৃপ্ত ভংগিমায় দাঁড়িয়ে সাগ্নিকের সামনে পান-পাত্র বাড়িয়ে দিল।—সরাব দাও, মুসাফির।—বীণা-বিনিন্দিত স্বরে বললে নওয়ারা।

পাত্র পরিপূর্ণ সুরা টলমল করে উঠল বেদুইন মেয়ের হাতে। ঢক্ ঢক্ করে সবটুকু সে খেয়ে ফেললে এক নিঃশ্বাসে। তারপর নৃত্যের হিল্লোলে পা দুটো কেঁপে উঠল অশান্ত আবেগে।

সারেংগীর ঘুমন্ত সুর জেগে উঠেছে আবার। অরণ্যের নির্জনতায় জেগে উঠেছে সুরবালিকা।

ক্লিওপেট্রার সৌন্দর্য বুঝি আবার জেগে উঠেছে। ফেরায়ুনদের অশরীরি আত্মা জেগে উঠেছে। পাথরের নির্মম কাঠিন্যেও বুঝি অশ্রু জেগে উঠেছে রূপসীর কোমল চরণাঘাতে

সাগ্নিকের সারেংগী থেমে যায়। সে নিজেকে হারিয়ে ফেলে উগ্র আরবী সুরার বিষক্রিয়ার মধ্যে—নিজেরি উদ্দাম রক্তস্রোতে। তার সামনে আগুন জ্বলে উঠেছে। আজ সে ঐ আগুন বুকে জড়িয়ে পুড়ে মরবে।

ঢক্ ঢক্ করে সুরা পান করে অবিশ্রান্ত নেচে চলেছে যাযাবরী। রঙীন ঘাঘরা ফুলে ফুলে উঠছে। অশান্ত দুটি পরিপুষ্ট জংঘার শুভ্রতার অনেকখানি যেন দুর্বার বিদ্রোহে মিশে যেতে চায়

জ্যোৎস্না ধোয়া রাতের রজতধারায়। ফিন-ফিনে রেশমী আবরণ ভেদ করে ফুটে ওঠে ছুটি সন্থ ফোটা স্বর্ণকমল। নর্তনের তালে তালে বিলোল কটাক্ষের অপরূপ ভংগিমায় যেন ফুটে ওঠে কিসের আবেদন, কিসের কাকুতি।

সাগ্নিক্ ছুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে যায়। ঘন কুঞ্জের দিকে এগিয়ে যায় কম্পমান বিদ্যুৎ-শিখা।

ক্ষুধিত আলিংগনের বজ্রপাশে থরথর দেহের কাঁপুনি। রসাল ঠোঁটে দ্রাক্ষার বিগলিত ধারা। পা দুটোয় নৃত্যের অশান্ত উন্মাদনা তখনো দুরন্ত আবেগে হিল্লোলিত। বহুদিনের ক্ষুধা। স্তব্ধ হয়ে যায় উন্মত্ত হিল্লোল দুরন্ত বিক্রমে।

কতক্ষণ বাদে চাঁদ আকাশে হেলে পড়ে। —ধরিত্রীর ঢুলু-ঢুলু আঁখি। স্তিমিত জ্যোৎস্নায় নিস্তব্ধ প্রকৃতি। হিমশীতল মরুরাত্রি। উত্তপ্ত মরুদেহ বিগলিত হয়ে শুভ্র শীতল তুষার কণায় ভরে গেল।

শ্রান্ত ক্লান্ত বেদুইন মেয়ের থেমে গেছে অশ্রান্ত নৃত্য। যাযাবরের নগ্ন বাহুর উপাধানে রঙীন স্বপ্নের আবেশে সুখনিদ্রায় ঢলে পড়েছে যাযাবরী।

চারিদিকে ফুটে আছে লাল হাসিস্ আর হলদে পপি। বেদুইন মেয়ের দুটি ওষ্ঠ তখনো ঈষন্মুক্ত।

তখনো তার রক্তিম অধরে মিলিয়ে যায়নি প্রেমাস্পদের চুম্বন রেখা।

(দশ)

এক্সিস্ পক্ষের সৈন্যবাহিনী ছিন্ন ভিন্ন।

পরাজয়ের গ্লানি এবং অপমানের বোঝা মাথায় করে জার্মাণীতে পালিয়ে এসেছেন ফিল্ডমার্শ্যাল রেমেল।

হিডাউস্ এবং লংস্টপ্ পার্বত্য ভূখণ্ডে তুমুল যুদ্ধের পর মার্কিণ সেনা বাহিনী এবং ব্রিটিশ প্রথম ও অষ্টমবাহিনী একযোগে দখল করে নিল মাটিউর, টিউনিস এবং বিজার্তা। ভূমধ্যসাগরের উপকূল ভীষণ ভাবে অবরুদ্ধ। অবশেষে জেঃ ফন্ আর্নিম্ কয়েক লক্ষ জার্মাণ সৈন্য নিয়ে বাধ্য হলেন আত্মসমর্পণ করতে। "ভি-ডে" প্রতিপালিত হবে টিউনিসে: বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত টিউনিস্। আলোক-সজ্জায় সুসজ্জিত নগরী নগরব্যাপী উল্লাস উন্মাদনা এবং আলোকোৎসবের সমারোহ। প্রতি শিবিরে দীপ সজ্জা, বাদ্য ধ্বনি এবং আনন্দের হর্‌রা। নৃত্য এবং গীতি-চঞ্চল অপেরাগৃহ।

সাগ্নিকেরও পার্টি এল টিউনিসে।

সাগ্নিকেরও সারেংগী বেজে উঠল উৎসব মঞ্চে। তার মর্মতারেও বেজে ওঠে সুরের ঝংকার। সারেংগীর সুরে জেগে ওটে অপূর্ব মূর্ছনা মর্মগীতির ছন্দে-ছন্দে। তার শিরায় শিরায় উৎসবের রক্তস্রোত বিজয়োল্লাসে চঞ্চল।

শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ, পুলকিত। ঘন ঘন করতালি ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে ওঠে প্রেক্ষাগৃহ।

প্রেক্ষাগৃহের বহির্দ্বারে কে সাগ্নিকের পথরোধ করে দাঁড়াল।

—নমস্কার, মিঃ রায়!

বিস্মিত সাগ্নিক্ প্রতি নমস্কার জানিয়ে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। খাসিয়া তরুণী। পরণে খাকী ইউনিফরম্। সুশ্রী এবং গৌরাংগী।

তরুণী ম্লান হাস্যে বললে,—আমি একজন নার্স—নাম নিচিবো। সুদূর টিউনিসে এসে বাঙালী হয়ে যে গৌরব আজ আদায় করলেন, তার জন্যে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সাগ্নিক্ বিনীতভাবে বললে,—আপনারাও—

বাধা দিয়ে নিচিবো বললে,—আমাদের কথা থাক্। আমরা মুখ পুড়িয়েছি। অবশ্য জানি না, কে দায়ী? আমরা না আপনারা! না, ইকনমিক্ ডিপ্রেসান্!

সাগ্নিক্ হতভম্ব হয়ে বললে,—ব্যাপারটা কি?—খুলে বলবেন, মিস্ নিচিবো?

—পারবেন কি কোন প্রতিবিধান করতে?—

বলতে বলতে নিচিবোর চোখের দুফোঁটা জল মুক্তোর মত দানা বেঁধে উঠল।

তারপর সে সাগ্নিকের হাতে একখানা লেফাপা দিয়ে বললে,—নিজে পড়বেন। এই আনন্দোৎসবের মধ্যে অন্ততঃ দুফোঁটা চোখের জলও ফেলবেন। আর যদি পারেন, পাঠিয়ে দেবেন কোলকাতার প্রেস মারফৎ ভারতের ভাই বোনদের কাছে—

যাঁরা আপনারই মত অনাগত দিনের বিজয়োৎসবের অপেক্ষা করছেন। আচ্ছা নমস্কার। বেশীক্ষণ আলাপ করতে—

নিচিবোর মুখের কথা শেষ না হতেই একটি পানোন্মত্ত শ্বেতাংগ সৈনিক এগিয়ে এসে তার হাত চেপে ধরলো। —ডার্লিং! তুমি এখানে? আর আমি তোমায় খুঁজে খুঁজে হয়রান।

বলতে বলতে মাতাল সৈনিকটি মেয়েটাকে হিড়হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল।

টলতে টলতে ক্যাম্পে ফিরে এল সাগ্নিক্। দুর্বিষহ বেদনায় সে অবসন্ন হয়ে এলিয়ে পড়লো শয্যায়।

নিচিবোর চিঠিখানা লেফাফা থেকে টেনে বার করলে কম্পিত হস্তে। অবরুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়ে গেল চিঠিখানা।

এক মর্মান্তিক যুক্ত আবেদন ভারতবাসীর প্রতি। শুধু ভারত-বাসী নয়, বিশ্ববাসীও জানুক:

খাসিয়া নার্সদের কিভাবে চালান দেওয়া হয়েছে সাগরপারে। কিভাবে বাধ্য হতে হয়েছে সৈনিকদের মনোরঞ্জন করতে। কি অমানুষিক লুণ্ঠন হয়েছে তাদের ওপর। কি ভয়ানক মূল্য দিতে হয়েছে এক একটা উৎসবে!...

একি? অনীতার নামও আছে? অনীতা? —যার জন্যে সে আজ যাযাবর? সে কি করে এলো!

সাগ্নিক্ থরথর করে কেঁপে উঠল। তার হাত থেকে চিঠিখানা খসে পড়ে গেল।

যখন ঘুম ভাংলো, তখন সমুদ্রবায়ুর স্নিগ্ধস্পর্শে সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। থেমে গেছে অশান্ত ঝড়। নীলাম্বুর ওপর সূর্যোদয়ের রক্তাভা।

সাগ্নিক্ ক্যাম্প থেকে বেরিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে বস্‌লো বেলাভূমির ওপর। স্থির, প্রশান্ত দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো নবীন সূর্যোদয়।

শান্ত তরংগোচ্ছ্বাসের ওপর প্রভাত সূর্যের আলোক চুম্বন। ধীরে ধীরে বহে যায় শান্ত প্রভঞ্জন। রাত্রির রাশি রাশি বিক্ষুব্ধ তরংগ চূর্ণ করে ধীরে ধীরে জেগে ওঠে নূতন ধরণী। —শান্ত, সুন্দর, মৌন, আলোকস্নাতা ধরিত্রী।

সাগ্নিক্ ভাবে, আবার সমুদ্র পুরোণ হবে। আবার পৃথিবী পুরোণ হবে। মহাসাগরের বিক্ষুব্ধ হুংকারের সংগে সংগে পাশবিক তাণ্ডবে নেচে উঠবে সারা পৃথিবী।

কিন্তু, কেন এই দ্বন্দ্ব নবীনের সংগে পুরাতনের? প্রভাতের সংগে মধ্যাহ্নের? কবে স্তব্ধ হবে মহাসমুদ্রের বীচিবিক্ষোভ? —কবে স্তব্ধ হবে পৃথিবীর পাশবিক তাণ্ডব?

———

(এগার)

প্রাচীন কপটিক যুগে ছোট গ্রাম তান্‌তা। নীলনদের অববাহিকার পাশে শস্য শ্যামল প্রান্তর। মিশরের উপত্যকায় যেন এক মনোরম নির্জন নিকুঞ্জ।

পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ জলস্রোত—নীলনদের স্ফীত জলোচ্ছ্বাসে বৃষ্টিহীন মরু প্রদেশের এক চতুর্থাংশ পরিণত হয়েছে উর্বরা কৃষিক্ষেত্রে। অসংখ্য গভীর এবং অগভীর খালের পথে প্রবহমান বন্যার বিপুল স্রোত মিশরকে দিয়েছে প্রাণশক্তি। যে বন্যা দেশকে করে বঞ্চিত, বিপন্ন, সেই বন্যাই আবার পরম করুণায় নিঃসহায় মিশরকে দিয়েছে অতুল স্বর্ণসম্পদ।

কায়রোয় ফিরে এসে চাষ বাস করবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে সাগ্নিক্ চলে এল তান্‌তায়! কিন্তু, কি আশ্চর্য! তার দুমাসের এই সংকীর্ণ অনুপস্থিতিতে কোথায় উবে গেল এই যাযাবরের দল?—বেদুইনের তাঁবুর চিহ্নমাত্র নেই তান্‌তায়। উম্‌দা যেখানে তাঁবু ফেলেছিল, সেইখানেই অবসন্ন হয়ে বসে পড়ে সাগ্নিক্।

একি করে বসলো নওয়ারা? এখানে এসে সাগ্নিকের জন্যে যে তার অপেক্ষা করবার কথা!

টিউনিসে যাবার আগের দিনও সাগ্নিক্ নওয়ারার কাণে কাণে মৃদু-গুঞ্জনে বলেছিল,—আর তুমি যাযাবরী নও, নওয়ারা। আমারও যাযাবর জীবনের হলো এবার অবসান। আমি টিউনিস্ থেকে ঘুরে এসে ঘর বাঁধবো তান্‌তায়। আমরা শৃংখলা

মানবো, সমাজ মান্‌বো, যে কোন একটা ধর্ম মান্‌বো।—আমরা মানুষের মধ্যে থেকে আর কিছু না হই মানুষ হব। তুমি আমার অশ্রান্ত অভিযানের যে উদ্দাম স্রোতকে বেঁধে ফেলেছ নওয়ারা; এস! সেই অবরুদ্ধ স্রোতের স্নিগ্ধ জলধারায় আমাদের জীবনের উত্তপ্ত মরু-প্রান্তর পরিপ্লাবিত করে রচনা করি এক ছায়াশীতল মরুদ্যান।

নওয়ারা হাসতে হাসতে বলেছিল,—তাই হবে, মুসাফির! তারপর তুমি নীল নদের ওপার থেকে আমার নাম ধরে ডাকতে ডাকতে ফিরে এসে দেখবে, আমি ইসাডোরার মত জলে ডুবে গেছি। তখন, তুমি নীলের ধারে নওয়ারার জন্যে তৈরী করো খুব ভাল একটা সমাধি মন্দির।

সাগ্নিকের গা ছম্‌ ছম্‌ করে উঠল। তবে কি নৃশংস উম্‌দা, মেয়েকে হত্যা করে তার লাল রক্ত ভাসিয়ে দিয়েছে নীলের জলে?

ভারাক্রান্ত মনে সাগ্নিক্‌ ক্যাম্পে ফিরে এল। বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল সাগ্নিক্‌। ইভা এসেছে তার ক্যাম্পে। সে-ই বিমান বালিকা।—একি! মিস্‌ ইভা, আপনি কোত্থেকে এলেন? আপনাকে ছেড়ে দিয়েছে বেদুইনরা? বললে সাগ্নিক। ইভা মুখ টিপে একটা প্রচ্ছন্ন ব্যংগের সুরে বললে,—চিরকাল কি কেউ কাউকে ধরে রাখতে পারে, মিঃ রায়? ছাড়া আমি অনেকদিনই পেয়েছি।

সাগ্নিক্‌ ইভার ব্যংগ না বুঝতে পেরে সরল ভাবেই প্রশ্ন করলে,—কাজে যোগ দিয়েছেন?

ফিক্ ফিক্ করে হাসতে হাসতে ইভা বললে,—আমি তো আপনার সংগে পরামর্শ না করে কাজে যোগ দিতে পারি না, মিঃ রায়! প্লেনখানা মরুভূমির ওপর পড়লো, তারপর আমরা কে কি করলাম, মার্কিণ সৈন্যদের কি হলো, আপনি যা বলেছেন, আমাকেও তো তাই বলতে হবে মিঃ রায়?

সাগ্নিক্ বললে,—আমি কি বলেছি, জানেন না, মিস্ ইভা?

—জানি। তবু আপনার মুখ থেকে সমস্ত কথা না শুনে কি করে কাজে ফিরে যাই বলুনতো?

—কোথায় আছেন?

—কন্টিনেন্টাল হোটেলে।

ক্যাম্পের মধ্যে মুখোমুখি দুজনে বসলো বেতের চেয়ারে। মাঝখানে বেতের টিপয়।

সাগ্নিক্ সরলভাবে সমস্ত কাহিনী বিবৃত করে সিগারেট কেশটা ইভার সামনে খুলে ধরে প্রশ্ন করলে,—বেদুইনদের খবর জানেন কিছু, মিস্ ইভা?

সিগারেটের কেশ থেকে একটী সিগারেট তুলে নিয়ে রক্তিম ওষ্ঠের ফাঁকে চেপে ধরে অলস ভংগীতে বললে ইভা,—উম্‌দা বেল-হাজিয়ায় মারা যেতেই দলটা ভেঙে গিয়ে কে কোথায় ছট্‌কে পড়েছে।

ইভার মুখের সিগারেট নিজের হাতে ধরিয়ে দেয় সাগ্নিক্। তারপর নিজেরটা ধরাতে ধরাতে সে বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করে উঠল,—বেল্‌হাজিয়া?

—সেকি ? জানেন না ? নীল নদের পোকা থেকে এই রোগ হয়। রক্তস্রাবী রোগ।—আর ভারী মারাত্মক ?

ইভা টিপয়ের ওপর ডান হাতের কনুইটা ঈষৎ বংকিম ভাবে রেখে গালে হাত দিয়ে হেলে পড়লো। তারপর ভ্রুদুটা ঈষৎ বেঁকিয়ে তির্যক্ ভাবে ধীরে ধীরে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ফিস্ ফিস্ করে বললে,—আপনার নওয়ারা একটা বেদুইন ছোঁড়াকে জুটিয়ে নিয়ে ফাইয়ুমের দিক চলে গেছে!

ইভার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই টিপয়ের ওপর সজোরে ঘুসি মেরে সাগ্নিক্ বলে উঠল,—মিথ্যে কথা!

ইভার ওষ্ঠপ্রান্তে ব্যংগ হাসি ফুটে ওঠে। সে বংকিম কটাক্ষে একবার সাগ্নিকের দিকে চাইল। তারপর সিগারেটের কুণ্ডলীকৃত বিপুল ধোঁয়া ছেড়ে ভ্যানিটী ব্যাগ থেকে একখানা চিঠি বার করে সাগ্নিকের হাতে দিল।

—এই চিঠিখানা আপনার হাতে দেওয়ার স্বর্তে মুক্তি পেয়েছি, মিঃ রায়!

সাগ্নিক্ উপবাসী উন্মাদের মত ইভার হাত থেকে চিঠিখানা ছিনিয়ে নিয়ে পড়ে ফেললে এক নিঃশ্বাসে। তারপর সে খানা খসে পড়ে গেল আড়ষ্ট হাত থেকে।—সে অদ্ভুত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শ্বেতাংগিনী মেয়েটির দিকে।

ইভা জ্বলন্ত সিগারেট খানা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

—উতলা হবেন না মিঃ রায়। বেদুইনরা নোম্যাডিক্। তাদের

কাছে আপনি মুসাফির। আর কি ব্যবহার পাবেন মিঃ রায়।—আচ্ছা, আর এক সময় আসব।—বলে অর্থপূর্ণ হাসি হেসে ইভা তার সুডৌল হাতখানি বাড়িয়ে দিল।

—আসবেন।—বলে করমর্দন করলে সাগ্নিক্।

ইভা চলে যাবার প্রায় সংগে সংগেই ডাঃ ব্যানার্জি এসে শ্বেতাংগিনীর পরিত্যক্ত চেয়ারখানি অধিকার করে হাসতে হাসতে বললেন,—কিহে সাগ্নিক্? টিউনিসে সারেংগী বাজিয়ে কিরকম "ভি-ডে" অবজার্ভ করলে, কোন খবরই দিলে না?

সাগ্নিকের নিঃশেষিত প্রায় সিগারেটখানা অ্যাসট্রের ভেতর পুড়ে ধোঁয়া উঠছিল কুণ্ডলী পাকিয়ে। সেইদিকে ম্লান, বিমর্ষ দৃষ্টিতে চেয়েছিল সাগ্নিক্।

সে গম্ভীর ভাবে উঠে এসে অ্যাটাচিকেশ থেকে নিচিবোর চিঠিখানা বার করে এনে ডাঃ ব্যানার্জির হাতে দিয়ে বললে—আপাততঃ খবর এ-ই!

চিঠিখানা গম্ভীর হয়ে পড়ে ডাঃ ব্যানার্জি ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন,—দেশের কাগজে না হয় ছাপালে। কিন্তু, সেখানে কি সবাই সাধু?—আমারই গ্রামের ফুড্ কমিটির কয়েকটি সভ্যের নামে কুৎসিৎ অপরাধের এমন অভিযোগ একটা চিঠিতে আমি পেয়েছি—

সাগ্নিক্ বাধা দিয়ে বললে,—সেই কথাইতো বলতে চাইছি আমি! আর এই কথাই সেদিন বলতে চেয়েছিলাম

আপনাকে? সভ্যতা কি দিয়েছে আপনাদের?—যুদ্ধ কি দিয়েছে দেশকে?

ডাঃ ব্যানার্জি সব্যংগে বললেন,—তুমি নিজের দিকে চেয়ে বলছো তো সাগ্নিক্?

সাগ্নিক্ জ্বলন্ত দৃষ্টিতে ডাঃ ব্যানার্জির দিকে চেয়ে বললে,—ঐশ্বর্য এবং আভিজাত্যের লুব্ধ দৃষ্টিতে আহত হয়ে অনীতা আজ নিরুদ্দেশ। আপনাদের সমাজ এবং সভ্যতা আমাদের সম্ভাবিত সুখনীড়ে নির্মম ভাবে আঘাত করেছে। তাই আজ আমি ছন্নছাড়া, যাযাবর।—আমার বেদনার সুরে বাঁধা জীবনের সংগে অন্য কারও তুলনা করবেন না, ডাঃ ব্যানার্জি।

ডাঃ ব্যানার্জি স্নিগ্ধ-স্বরে বললেন,—নিচিবোর বর্ণিত ঘটনা হয়তো ঠিক। কিংবা কিছু অতিরঞ্জিত। কিন্তু, কে পারবে যুগে যুগে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে? ইতিহাসের পাতা উল্টে যাও। —পৌরাণিক ঘটনায় যাও। যুগে যুগে যুদ্ধের প্লাবন এসেছে এমনি। নানা বর্ণ সমন্বিত নানা নদ নদীর জলোচ্ছ্বাস দেশে এনেছে প্লাবন। সেই প্লাবনে ভেসে গেছে ন্যায়, অন্যায়, সুন্দর এবং কুৎসিৎ। তারপর জন্ম নিয়েছে সুন্দর, শ্যামল পৃথিবী।—যুগে যুগে পৃথিবীতে গ্লানি আসবে, এসেছে। যুদ্ধ আসবে, আবার শান্তিও হবে! আবার হবে এর পুনরাবৃত্তি। আবার—আবার। প্রকৃতির এই স্বাভাবিক গতি কেউ রোধ করতে পারবে না।

ডাঃ ব্যানার্জি উঠে পড়লেন।—আচ্ছা! আসি, সাগ্নিক্।

আজ আমি ভীষণ ব্যস্ত। আহত সৈন্যে বোঝাই হয়ে গেছে হাসপাতাল।—অন্য সময়ে আসব।

মেজর ব্যানার্জি জীপ থেকে নেমে এলেন। হাসপাতালের দ্বারপথে সান্ত্রী রাইফেলখানা বাঁহাতে ধরে "অ্যাটেন্‌সন্" হয়ে যুদ্ধ কায়দায় "স্যালুট্" দিল।

মেজর ব্যানার্জিও "স্যালুট্" জানিয়ে অধীনস্থ মেডিক্যাল অফিসারদের সংগে গম্ভীর পদবিক্ষেপে ধীরে ধীরে হাসপাতালের মধ্যে প্রবেশ করলেন।

গীজাপাহাড়ের এক বিচ্ছিন্ন, নির্জন অংশে অনেকগুলি তাঁবুর হাসপাতাল। তার সর্বময় কর্তৃত্ব মেজর ব্যানার্জির।

ইতালীয় যুদ্ধ বন্দীদের কাতর আর্তনাদ এবং ক্ষতবিক্ষত দেহের মর্মন্তুদ্ দৃশ্যে করুণ, বীভৎস হয়ে গেছে হাসপাতাল।

রাষ্ট্রযুদ্ধের মর্মান্তিক পরিণতি।—এদেরি রুধিরে রণক্ষেত্র হয়েছে রঞ্জিত। ফ্যাসিষ্ট ইটালী এদেরি জীবনপণে বিশ্বজয়ের স্বপ্ন দেখেছিল নাৎসী শক্তির সহযোগে।

ডাঃ ব্যানার্জি মেডিক্যাল অফিসারদের সংগে একের পর এক রোগী দেখে চলেছেন। কাকে কি ইন্‌জেকসন্ দেওয়া হবে, ওষুধ দেওয়া হবে, কিংবা হাত পায়ের কোন্ অংশ অ্যাম্‌পুটেট্ করা হবে—উপদেশ দিতে দিতে এগিয়ে চলেছেন।

কোন রোগীর শ্বাস উঠেছে।—স্যালাইন্ ইন্‌জেকসন্ দিয়ে অক্সিজেন দিয়ে ব্যর্থ চেষ্টার পর পার্টিসন তুলে দিতে বলে আবার এগিয়ে চলেন ডাঃ ব্যানার্জি।

কোন রোগীর কাছে বেশীক্ষণ দাঁড়াবার সময় নেই, শক্তিও নেই। এখনো অনেক—অনেক রোগী হাতে।

ফিমেলওয়ার্ডে একটি রোগিণীর দিকে অংগুলি নির্দ্দেশ করে য়ুরোপীয় নার্স বললে,—বোধ হয় বেশীক্ষণ বাঁচবেনা। ডাঃ ব্যানার্জি ভ্রুকুঞ্চিত করে বললেন,—ওরকম অনেকেই বাঁচবেনা।—পার্টিসন্ তুলে দিন।

বলতে বলতে ডাঃ ব্যানার্জি এগিয়ে যান আর একটি রোগিণীর দিকে।

নার্স বিবর্ণ মুখে ডাঃ ব্যানার্জিকে বললে,—কিছুক্ষণ আগেও জ্ঞান ছিল। আপনার নাম শুনে হঠাৎ ভেঙে পড়ে এইরকম হয়ে যায়।

ডাঃ ব্যানার্জি বিরক্তি প্রকাশ করে এগিয়ে গেলেন সেই মূমূর্ষু রোগিণীর কাছে। সর্বাংগে কুৎসিৎ ক্ষত। বিশ্রী দাগ মুখে। ঘৃণাভরে রোগিণীর বাঁহাতখানা তুলে নিয়ে নাড়ী টিপে ধরে বিকৃত মুখে বললেন,—কখন এসেছে?

নার্সটি রোগিণীর বালিশের তলা থেকে একটা চিঠি বার করে ডাঃ ব্যানার্জির হাতে দিয়ে বললে,—পেশেণ্ট এই চিঠিখানা আপনাকে লিখেই বিছানায় ঢলে পড়ে যায়।

ডাঃ ব্যানার্জি চিঠিখানা নার্সের হাত থেকে নিয়ে পড়তে লাগলেন অনিচ্ছায় এবং অবজ্ঞায়। পড়তে পড়তে তাঁর নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এল। একটা প্রহত গ্রহের মত পৃথিবীটা

যেন তাঁর সামনে ভীষণ হুলে উঠল।—একি! সুমিতা! —সুমিতা মিত্র!

দীর্ঘ, করুণ চিঠি একখানি।—* * * ডাঃ ব্যানার্জি! সেদিন আপনি বাঁচাতে পারেননি, আজও সে চেষ্টা করবেন না। * * * সেই পরম কৃতজ্ঞ নিগ্রোটি এবং তার দলবলের কামনা কামিনীতেও পরিতৃপ্ত হলোনা। আমাকে বেচে দিল আলেক-জান্দ্রিয়ার এক আলখাল্লাধারীর কাছে। তারপর বোরখায় ঢেকে নানা জায়গা ঘুরিয়ে আমাকে বেচে দেয় বর্দিয়ায় ইটালীয় সামরিক বেশ্যালয়ে।—ডাঃ ব্যানার্জি! আপনার ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলকে বাঁচাবার জন্যে ইনজেক্সনের সিরিঞ্জ নিয়ে এগিয়ে আসবেন না—এই আমার একান্ত মিনতি। আমার লজ্জাকর জীবনের ওপর এইখানেই যবনিকা পড়ে যাক্। বরং আমার সংসারে যারা রইল, তারা যাতে বেঁচে থাকে তার জন্যে এতটুকু চেষ্টা করলেই আমি সান্ত্বনা পাব মৃত্যুর ওপারে। * * * * ইতি—সুমিতা মিত্র।

ডাঃ ব্যানার্জি চিঠিখানা শক্তকরে মুঠোর মধ্যে ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন, স্থির দৃষ্টিতে রোগিণীর মুখের দিকে চেয়ে।

ধীরে ধীরে মৃত্যুর ছায়া নেমে আসছে। কুৎসিৎ মুখের চোয়াল দুটো বেরিয়ে এসেছে। গায়ে ক'খানি মাত্র হাড়।—চেনা যায় না আর সুমিতাকে।

চোখ খুলেছে। ঘোলাটে চোখের কোণ দিয়ে দুফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ে শীর্ণ গণ্ড বেয়ে। নির্বাণোন্মুখ দীপশিখা।

ডাঃ ব্যানার্জির হুটি চক্ষু বাষ্পার্দ্র হয়ে ওঠে।

সহকারী মেডিক্যাল অফিসার মৃত্নস্বরে ডাকলেন,—স্যার।

ডাঃ ব্যানার্জি তেমনি অপলক দৃষ্টিতে সুমিতার দিকে চেয়ে বললেন,—চুপ ঃ শান্তিতে মরতে দিন।

ডাঃ ব্যানার্জি ভাবেন, সুমিতা সংসারকে ভালবেসেছিল, দেশকে ভালবেসেছিল, আর্ত, বিপন্নকে বুক দিয়ে সেবা করেছিল। এইকি তার সম্ভাবিত পরিণতি? দেশ থেকে বিদেশে পালিয়ে এসেও সে নিষ্কৃতি পেলনা কেন?

ডাঃ ব্যানার্জি কিছু আগেও বলেছিলেন এইটেই প্রকৃতির স্বাভাবিক গতি। কিন্তু তিনি কাকে জিজ্ঞাসা করবেন,—কেন এই অস্বাভাবিক নিয়ম?

সুমিতার গলার কাছে ঘড় ঘড় করে উঠল। শ্বাস উঠল।—তারপর হিম শীতল হয়ে গেল সর্বাংগ।

হাত হুটো পিছমোড়া করে নিঃশব্দে সরে গেলেন ডাঃ ব্যানার্জি। কয়েকটি দীর্ঘনিঃশ্বাসের গুমোটে থম্ থম্ করতে লাগল তাঁবুর ভেতরটা।

————

(বার)

সন্ধ্যার জমাট অন্ধকারে নির্জন নদীতীরে গীজাপাহাড়ের এক শিলাখণ্ডে অবসন্ন হয়ে একা বসে আছে সাগ্নিক। ক্লান্ত, শূন্য দৃষ্টি তার দিক্‌হারা তরণীর মত ভেসে চলে নীল নদের স্রোতে।—হারিয়ে যায় অন্ধকারের নিবিড়তায়।

কায়রো ছেড়ে না গেলে পাগল হয়ে যাবে সাগ্নিক্।

—উঃ! কি সাংঘাতিক এই যাযাবরী। উগ্র কালকূট সর্বাংগে ছড়িয়ে দিয়ে নতুন শিকার মুখে করে সরে পড়েছে!

হঠাৎ সাগ্নিক্ চমকে ওঠে। কখন কাছে এসে ঘেঁসে বসেছে সেই বর্ণ বিদ্বেষী মেয়েটা।

তেমনি রুজ্, পাওডার, লিপষ্টিকে রঞ্জিত অধর। যেমনটি সে দেখেছিল বিমানে। নৈশ বিলাসের ভংগী। গাউনের বদলে পরণে শুধু স্কার্ট। বিচিত্র প্রচেষ্টায় দেহটাকে লোভনীয়, উত্তপ্ত করে তুলেছে।

সেণ্টের গন্ধে স্থানটি আমোদিত হয়ে যায়। দুটি একটি নিগ্রো কিংবা মার্কিণ দৈবাৎ এসে পড়লে ঘাড় ফিরিয়ে হেসে চলে যায়।

সাগ্নিকের গায় উড়ে আসে ইভার রেশমী চুল। কি নরম আর সেণ্টের কি মিষ্টি গন্ধ! তার কানের কাছে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে রক্তিম ওষ্ঠ।

—ডার্লিং! বেদুইনদের কবল থেকে তোমার এবং আমার

মুক্তি বুঝিবা ঈশ্বরের কোন এক নির্দিষ্ট বিধান। আমার যে দেহ সেদিন ফিরিয়ে এনেছ মরণের সিংহদ্বার থেকে, সেই দেহ বিধাতার বিধানে আজ ফিরে এসেছে তোমারই কাছে। কলকাতায় নিয়ে চল আমায়। চার্চে গিয়ে ধর্ম সাক্ষী করে আমরা দুজনে নীড় বাঁধি।—এমনি গুঞ্জনে সাগ্নিকের কানে কানে আবেদন জানিয়ে চললো ইভা।

বিমূঢ় সাগ্নিক্ মুহূর্তের জন্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে ইভাকে কাছে টেনে নিল। ইভা লাস্য ভংগীতে সাগ্নিকের কোলে লুটিয়ে পড়লো। পেলব বাহু বিস্তার করে তার কণ্ঠবেষ্টন করে বললে,—চল প্রিয়তম! এল্-এলামিন্ ক্লাবে!

হঠাৎ এক উন্মাদ অট্টহাসিতে বুঝি পাহাড় ফেটে পড়ে!—সাগ্নিক্ চমকে ওঠে।

বেদুইনদের তাঁবুতে আকণ্ঠ বিষপান করে, কালসাপিনীর বিষাক্ত ফনা বুঝি দংশন করে এবার সাগ্নিককে। সে ইভার বাহুপাশ থেকে নিজেকে ধীরে ধীরে মুক্ত করে উঠে দাঁড়াল।
—এই হতভাগাকে ভালবেসে কিছু পাবেন না মিস্ ইভা। আমি শুধু বেদনা, গ্লানি এবং নৈরাশ্যের বোঝা বয়েই বেড়াচ্ছি।—শান্ত অকম্পিত স্বরে বলে সাগ্নিক্ অদৃশ্য হয়ে গেল পাহাড়ের জমাট অন্ধকারে। ইভা সেইদিকে তীক্ষ্ণ, ক্রুর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

তারপর বিদায়ের অতি করুণ সুর বেজে ওঠে। শুধু সাগ্নিক

নয়, অনেকেই ছুটি নিয়ে ফিরে চলেছে দেশে. আফ্রিকার বিজয় গৌরব বহন করে।

আল্-বদিয়া-কসিনো অপেরা। আলোকোজ্জ্বল প্রেক্ষাগৃহ। নানাবর্ণের সামরিক এবং অসামরিক নরনারী বিদায় অনুষ্ঠানে সমবেত আজ কায়রোর অপেরা গৃহে।

গীতাভিনয়ের পর নৃত্যাভিনয়। নানা জাতির তরুণীর নৃত্য। ভারতীয় নৃত্য, কানাড়ীয় নৃত্য এবং গর্ব্রা নৃত্য, বরোদা, সিংহল এবং জাভার নৃত্য বৈচিত্র স্বষ্টি করে মঞ্চের ওপর। ফরাসী নগ্ননৃত্যে নৃত্য মঞ্চে জ্বলে ওঠে দেহের আবেদনের বহ্নিবলয়। তারপর শেষবারের মত সাগ্নিকের সারেংগীর ঘুমন্ত স্বুর আবার জেগে ওঠে করুণ মূর্ছনায়। স্বুরের ঝংকার ভেসে চলে বায়ু স্তরে। বিদায়ের করুণ স্বুর ভেসে চলে আকাশে বাতাসে, মরুপ্রান্তরে. নীল নদের তরংগে-তরংগে কি এক মর্মস্পর্শী ব্যাকুলতায়।

নিস্তব্ধ প্রেক্ষাগৃহ। নিস্তব্ধ আল্‌বদিয়া-কসিনো অপেরা। নিস্তব্ধ বুঝি নীল নদের তরংগধ্বনি। সমাগত নরনারীর অন্তরে বিচ্ছেদের করুণ স্বুর যেন সত্য এবং জীবন্ত হয়ে ওঠে। আঁখি পল্লব আর্দ্র হয়ে ওঠে মর্মস্পর্শী উচ্ছ্বাসে।

ধীর পদবিক্ষেপে মঞ্চের ওপর-কে এগিয়ে যায়। এক তরুণী রুগ্ন-কৃশদেহ। স্নিগ্ধস্বরে ডাকলে,—সাগ্নিক্‌দা!

সাগ্নিক্ চমকে উঠলো।—কে এ?—অনীতা? ······

একি হয়েছে অনীতার? কংকালসার দেহের ওপর কোনরকমে

লেপ্টে আছে রঙীন সাড়ীখানা। দেহের চেয়ে সাড়ীর ঔজ্বল্যই যেন বেশী।

মনে পড়ে নিচিবোর চিঠির কথা। কত দীর্ঘ রাত্রির অত্যাচার বহে গেছে ঐ দেহের ওপর দিয়ে। কত ক্ষুধিত পশুর দংষ্ট্রাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন, কলুষিত এবং অপবিত্র হয়েছে দেবপূজার নৈবেদ্য।

সাগ্নিকের হাত থেকে সারেংগী খসে পড়ে গেল। ধীরে ধীরে উঠে এসে অনীতার হাত ধরে সে বললে,—অনীতা! এসেছ? আঃ!

তুজনের চোখ দিয়ে টস্ টস্ করে জল পড়তে লাগল।

প্রেক্ষাগৃহ তখনো নিঃস্তব্ধ। সারেংগীর করুণ সুরে তখনো বাতাস আর্দ্র হয়ে আছে। সমবেত নর-নারীর মনের মধ্যে বিদায়ের বিষণ্নতা তখনো জমাট বেঁধে রয়েছে।

(তের)

সাগ্নিক্ অনীতাকে সংগে নিয়ে দেশে ফিরে এল একই জাহাজে—একই কেবিনে।

অনীতাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করে গদ্ গদ্ স্বরে সাগ্নিক্ বললে,—এতদিন পরে এলে অনীতা। আমি যে তোমারি খোঁজে বেরিয়েছিলাম।

অনীতার চোখের জলে সাগ্নিকের বুক ভিজে যায়।

—আমায় তুমি ছুঁয়েছ, সাগ্নিক্দা! তুমি এত মহৎ?

—ছিঃ কেঁদনা অনীতা। অনীতার চোখের জল সস্নেহে মুছিয়ে দেয় সাগ্নিক্।

তবু অশ্রু বাধা মানে না। সাগ্নিকের পায়ের গোড়ায় বসে পড়ে অনীতা বললে,—আমি যে অসতী সাগ্নিক্দা।

অনীতার হাত ধরে তুলে স্নিগ্ধস্বরে সাগ্নিক্ বললে,—আমিও সৎ হয়ে থাকিনি, অনীতা। এবার তুমি আমার যাযাবর মনকে শাসন কর।

তবু আর্তনাদ করে ওঠে অনীতার মন। জগৎ আজ তার কাছে অতি বিস্বাদ। মরণই আজ অতি মধুর তার কল্পনায়।

সাগ্নিকের দেহে নেই উত্তাপ, চোখে নেই নেশা। স্যাম্পেন খেয়েও বাড়ে না উত্তেজনা। তবু সে আজ অনীতাকে আশ্রয় করে বিস্মৃতির অতলে ডুবে যেতে চায়।

অনীতাকে সস্নেহে কাছে টেনে আনে সাগ্নিক্। অমনি এক

ভীষণ অট্টহাসির তীক্ষ্ণ আওয়াজে যেন কেঁপে উঠল জাহাজখানা। সাগ্নিক্ সচকিত হয়ে ছুটে বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। তার মনে হলো গাউন পরা এক শ্বেতাংগিনীর ছায়ামূর্তি যেন সাগ্নিকের সাড়া পেয়ে সাঁ করে সরে গেল অন্যদিকে।

অনীতাকে নিয়ে সাগ্নিক্ ফিরে এল দেশে। ঘুমন্ত পল্লী জেগে ওঠে আবার সোনালী আলোয়। নহবৎ বেজে ওঠে।

কাল শাস্ত্রমতে সাগ্নিকের বিবাহ অনীতার সংগে। সাগ্নিকের বাবা নেই। তাই সাগ্নিক্ নিজেই এই বিবাহে উদ্যোগী।

জমিদারের বিবাহ। তাই মধুর রাগিণীর ছোঁয়াচ লেগেছে পল্লীর মনে, লতাবনে, আম্র কাননে। শানায়ের মধুর উল্লাস যেন জানিয়ে দেয় পল্লীদেবীর আগমনী উৎসব।

পাশের গ্রামে সাগ্নিকের আর একটি বাড়ী অনীতার জন্যে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। দাসদাসীর পরিবেষ্টনের মধ্যে সেই বাড়ীতেই থাকে অনীতা। সেখানেই বিবাহ হবে। সেখান থেকেই সাগ্নিক্ শাস্ত্রাচারে বিবাহ করে অনীতাকে নিয়ে আসবে বল্লভপুরে।

লোহার গেটওয়ালা প্রকাণ্ড বাড়ী—বল্লভপুরের জমিদার বাড়ী। বাড়ীর সামনে ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তা। পেছনে লতা-গুল্মাচ্ছাদিত উপবন। তার পেছনে ধূ ধূ করছে মাঠ।

কাল বিবাহ। তবু অনীতা রোজই আসে। সাগ্নিকের কথায় আসে। কুঞ্জবনে বসে দুজনে কথা কয়, গান গায়, কাঁদে, হাসে।

আজও আসবে অনীতা। সাগ্নিক্ সাগ্রহে অপেক্ষা করছিল আর ছটফট করছিল। আঃ! কখন আসবে অনীতা।--অনেকদিন বাদে সে আবার সারেংগী বাজাবে। সারেংগীর ঘুমন্ত সুর আজ আবার জেগে উঠবে অনীতার সান্নিধ্যে।

দরওয়ান এসে সেলাম দিল,—মা-জী আয়া।

সাগ্নিক্ সারেংগী নিয়ে উর্ধশ্বাসে ছুটে বেরিয়ে এল। অনীতা বুঝি মৌন ইসারায় এগিয়ে চল্লো আম্র নিকুঞ্জের দিকে। সুর্যের সোণালি আভা তখন হারিয়ে গেছে আম্র নিকুঞ্জের নিবিড় অন্ধকারে। বুনো পাখীর কলরব তখন ডুবে গেছে নিঝুম নিস্তব্ধতায়। সেই নিস্তব্ধতা ভংগ করে শুধু কানে আসে ঝিঁ ঝিঁ পোকার অবিশ্রান্ত ঝিল্লীরব।

সাগ্নিক্ বিস্ময়ে এগিয়ে যায়।—চঞ্চল হয়ে এগিয়ে যায়। ছায়া-মূর্তিও এগিয়ে যায়। সেই নিবিড় অন্ধকারে ছুটে গিয়ে সেই অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিকে নিবিড় ভাবে জড়িয়ে ধরে সাগ্নিক্ বলে,—ছি! অনীতা! আজ তুমি দরওয়ান দিয়ে ডেকে পাঠালে কেন? এত লজ্জা! আমাদের বিয়েতো কবেই হয়ে গেছে। শুধু বাকি আছে এই লোক দেখান লোকা-চার?

—মুসাফির!

—কে এ!

সেই বীণাবিনিন্দিত উদ্ধত কণ্ঠস্বর! কিন্তু কোথায় সেই অনন্ত বিস্তৃত মরু প্রান্তর, আর কোথায় এই শস্য শ্যামল

বংগভূমি। এতদূরে মরুবালিকা? না এ তার অশরীরী আত্মা দেহধরে ছুটে এসেছে। —স্তব্ধ সাগ্নিকের হাতদুটো শিথিল হয়ে পড়ে যায়।

—মুসফির! কথা কও!

একি স্বপ্ন?—না, না না, এযে জীবন্ত সত্যি!

শাড়ীখানা খসে পড়ে গেল।—সেই রঙীন ঘাগড়া: বুকে তেমনি রেশমী বাঁধন। মাথায় কাল ওড়না। নৃত্যের ছন্দে হিল্লোলিত দেহ। ঠিক সে-ই!

স্তম্ভিত, বিস্মিত সাগ্নিক্ জড়িতস্বরে প্রশ্ন করে উঠল,—তুমি এখানে কেমন করে এলে, নওয়ারা?

— কেমন করে এলাম?

নওয়ারার অট্টহাসির বিকৃত চীৎকারে চমকে উঠল সাগ্নিক্। এমনি হিংস্র হাসি সে এর আগেও শুনে চমকে উঠেছিল। —পাহাড়ে, জাহাজে, অপেরা হাউসে। নওয়ারা বললে,— তোমাকে ছায়ার মত অনুসরণ করে এতদূর এসেছি।—সব দেখেছি। সব। স—ব।

—সব দেখেছ?—হতভম্ব হয়ে আড়ষ্টস্বরে আবার প্রশ্ন করে সাগ্নিক।

—হ্যাঁ, সব দেখেছি। তাই তো খুন করেছি ইভাকে। তার বড় সাধ ছিল সে তোমাকে ফাঁসি কাঠে লটকাবে।

অ্যাঁ! ইভা! —সাগ্নিক্ শিউরে ওঠে। সংগে সংগে চমকে ওঠে যেন স্বপ্নাবেশে। তার মনে পড়ে যায় কেবিনের সামনে সেই অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির কথা। ব্যংগ অট্টহাসি হেসে সরে পড়ে সেখান থেকে—সেকি এই ছদ্মবেশিনী যাযাবরী?

সে মৃদু কম্পিত স্বরে বললে,—কিন্তু ইভার হাতে তুমি যে চিঠিটা—

নওয়ারা বাধাদিয়ে বলে উঠল,—জাল চিঠি। আল্ট্রা-ভায়োলেট রে দিয়ে জাল করেছিল আমার সই।—আমি তোমায় চিঠি লিখেছিলাম দামাস্কসে যাবার জন্যে; কিন্তু সে চিঠি তোমার হাতে দেয় নি। আমি অনেক, অ—নেক অপেক্ষা করেছি; তারপর ফিরে এসে দেখি যে, সে আমার চিঠি তোমার হাতে না দিয়ে ফাঁদ পেতেছে তোমায় ধরবার জন্যে।

কথা কইতে কইতে কখন দুজনে মাঠের ওপর নেমে এল।

সাগ্নিক্ সজোরে মাথানেড়ে বললে,—তুমি ফিরে যাও নওয়ারা। বড় দেরীতে এসেছ। আজ আমি একটা বন্ধনে জড়িয়ে পড়েছি। ক্ষুদ্র পর্ণকুটীরে সে এক মধুর, অবিচ্ছেদ্য বন্ধন।

—বন্ধন যদি না থাকতো?

—তবে আমি যাযাবর থেকে যেতাম. যাযাবরী!

চক্ষের পলকে নওয়ারা কটিদেশ থেকে নিষ্কাশিত করলে এক তীক্ষ্ণধার ছুরিকা। তার শাণিত ফলক ঝলসে উঠল দ্বীপান্বিত আকাশের ক্ষরিত আলোয়। অন্ধকারের বিপুল বন্যায় শুধু জেগে ওঠে এককালি চাঁদের স্তিমিত আঁখি, আর অসংখ্য মণিদীপ।—আর সুন্দরী নিশাচরীর দুটি হিংস্র চক্ষুর রক্তাভা।

—মার, নওয়ারা। মার। বুক পেতে দিচ্ছি। আমায় নির্মমভাবে মেরে সাজা দেও, যাযাবরী।

নওয়ারা খিল খিল করে হেসে উঠল আবার। সেই উন্মাদ অট্টহাসি।—গা শিউরে ওঠে।

—এই ছুরি তোমার জন্যে নয় মুসাফির। তোমার আর আমার দুষমনের জন্যে। এই ছুরি ইভার বুকে বসিয়েছি। এই ছুরি নিয়ে দামাস্কস থেকে সুদূর প্যারিসে ছুটে গেছি।

—অ্যাঁ! ক্লারা?—অস্ফুটস্বরে আর্তনাদ করে উঠল সাগ্নিক্।

নওয়ারা পৈশাচিক উল্লাসে খিল্-খিল্ করে হেসে নেচে ওঠে। হাতে নেচে ওঠে উলংগ ছুরিকা।

—সেদিন বলিনি?—আমরা সাপ? —আমাদের ঠোঁটে মধু নেই, আছে শুধু বিষ?—এখনো কয়েক ফোঁটা রক্ত লেগে আছে ছুরিতে। এখনো শুকিয়ে যায়নি।—চিন্‌তে পার, কার রক্ত?

—কার?—অবরুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করে উঠল সাগ্নিক্।

—যে আমার সবচেয়ে বড় দুষমন্।—যে আমার কল্‌জে ভেঙ্গে দিয়েছে।—আমার বুক থেকে আমার প্রিয়তমকে ছিনিয়ে নিয়ে টেনে এনেছে এতদূরে। বেদুইনের মেয়ে এতদিনে তার খুন নিয়ে খুব খুসী হয়েছে।—খুব খুসী আমি আজ। এবার তুমি চলে এসো, মুসাফির! চলে এস।

—অ্যাঁ! অনীতাকে খুন করেছ তুমি!—আমার অনীতা? আর্তস্বরে চীৎকার করে উঠল সাগ্নিক্। সেই অসীম উন্মুক্ত প্রান্তরে প্রতিধ্বনি মাত্র ফিরে এল ব্যংগ করে।

যাযাবরীর আবার সেই অট্টহাসি। আবার—আবার। ঝোলা থেকে সে সুরাপাত্র বার করে সাগ্নিকের মুখে ধরলো।

—উঃ সেই উগ্র আরবী সুরা! কী উগ্র জ্বালা! সামনে জ্বালাময়ী বহ্নি! সাগ্নিক্ আবার আত্মবিস্মৃত হলো। অতীত এবং ভবিষ্যৎ এক সংগে মরে গেল তার কল্পনার চিত্রপটে।

—নওয়ারা চীৎকার করে উঠল—পালিয়ে এস মুসাফির। আমরা খুনী। আমরা দুজনেই দুষমন মেরেছি।

সাগ্নিক্ মুহূর্তের জন্যে কি ভেবে সারেংগীখানা তুলে নিয়ে এল কুঞ্জবন থেকে। তারপর উন্মত্ত ব্যাকুল স্বরে বললে,—তাই চল নওয়ারা! সমাজে থাকবার কোন অধিকার নেই আমাদের —শোন, নওয়ারা! শোন! আমি ভুল বুঝে ছিটকে এসে পড়েছিলাম বন্ধনের মধ্যে। তোমার শাণিত ছুরিকা আমার সমস্ত বন্ধন নির্মম ভাবে কেটে ফেলে আজ যখন বহে এনেছে মুক্তির আস্বাদ, তখন তুমিই আমায় পথ দেখিয়ে নিয়ে চল। নির্জনপুরী অতিক্রম করে, গিরি, কান্তার, সাগর অতিক্রম করে—নির্জন পথ ধরে, রাত্রির অন্ধকার পথ ধরে আবার আমায় নিয়ে চল সেই মরুপ্রান্তে।

সারেংগীর সুর আবার বেজে উঠল উন্মত্ত আবেগে। নৃত্যশীলা বেদুইন মেয়ের হাতে নিষ্ঠুর হয়ে নেচে ওঠে রক্ত রঞ্জিত ছুরিকা।

অশান্ত নৃত্য।—তার পেছনে উন্মত্ত পদক্ষেপ। যাযাবরীর পেছনে পেছনে ছুটে চলেছে যাযাবর—দিগ্বলয় লক্ষ্য করে। আকাশে চাঁদ এবং নক্ষত্রের অবাক দৃষ্টি।

অসীম প্রান্তরের পর অসীম সমুদ্র, তারপর অন্তহীন মরু-

প্রান্তর। দীর্ঘ ছায়াপথ ধরে ছায়ামূর্তির পেছনে প্রধাবিত ছায়াপুরুষ।

যুগ-যুগান্ত কাল ধরে যাযাবরীর পেছনে পেছনে এমনি ছুটে চলেছে যাযাবর। এমনি সুরের মধুর ঝংকার, অশান্তনৃত্য, উন্মত্ত কামনা।

সামনে এখনো অনন্তকাল।—এখনো অনন্ত পথ। কবে দেখা যাবে অনন্তকালের সীমা রেখা? কবে দেখা যাবে দীর্ঘপথের শেষ সীমা?

কবে শেষ হবে যাযাবর এবং যাযাবরীর অশ্রান্ত অভিযান?—

কবে? —কবে?

যাযাবরী—২

গোপীমোহন ভট্টাচার্য

পশ্চিমের নাম করা জংসনের মুসাফিরখানা। ষ্টেসন সীমানার মধ্যে হলেও ষ্টেসন থেকে বেশ খানিকটা দূরে একঘরের মত পড়ে আছে দূয়োরাণীর মত। নিত্য নতুন যাত্রী ছাড়াও তার শতছিদ্র টিনের ছাউনীর তলায় আশ্রয় নেয় ষ্টেসনের ভিখিরী থেকে রাস্তার লোমওঠা কুকুর পর্যন্ত। তৃতীয় শ্রেণীর বিশ্রামাগার বলেই বোধহয় এর দিকে বড়কর্তাদের নজর একটু কম তাই সারা ছাউনীটা ময়লা, মাছি আর আঁস্‌টে দুর্গন্ধে ভরপূর হয়ে আছে। তবুও এরই মধ্যে কেউবা শুয়ে কেউবা বসে সময় কাটাচ্ছে গাড়ীর অপেক্ষায়। কারো বা কয়েক ঘণ্টার জন্মে ছোট খাটো সংসার বেশ মুখর হয়ে উঠেছে। শির মালিশ থেকে মঙ্গমওলা পর্যন্ত বিকৃত কণ্ঠে নিজের নিজের মহিমা প্রচার করে যাচ্ছে খদ্দেরের আশায়। এপাশে দাড়ি জটার জংগলে এক সাধু বাবা পঞ্জিকার আরাধনায় ব্যস্ত। দু'একজন দেহাতী ভক্তও তার জুটে গেছে তিন পাশে। উবু হয়ে বসেছে তারা বাবার সামনে পরম ভক্তিভরে এককণা কৃপা ভিক্ষার আশায়। বাবার ভোলানাথী দৃষ্টি কিন্তু তাদের প্রতি প্রসন্ন নয়! শিবনেত্র দুটি একদৃষ্টে চেয়ে আছে সামনের দিকে···সেখেনে এক রমণী তার শিশু সন্তানকে স্তন্যদান করছে অনাবৃত বক্ষে। স্বভাব সুলভ লজ্জার বশে যখনই সে চাইছে আশে পাশে, বাবার দৃষ্টি তখনই নেমে আস্‌ছে ভক্তবৃন্দের দিকে। ভেতরের আবছা অন্ধকারে কে একজন ঘুমুচ্ছে আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বোধহয় ভিখিরী হবে। তার গায়ের চাদরখানার সবটাই ঢেকে দিয়েছে মশা

আর মাছি। একোণে এক বৃদ্ধ যাত্রী বিনা পয়সায় মলম মালিশ করাচ্ছে বোধহয় মাড়োয়ারী হবে কিংবা ভাটিয়াও হতে পারে। তোব্ড়ানো গালে খোঁচা খোঁচা পাকাদাড়ি আর ঢোকানো চোখ নিয়ে তার দৃষ্টিও ছোটাছুটি করছে স্তন্যদানকারিণীর পরিপুষ্ট নগ্ন বক্ষের ওপর। এদের লোভাতুর দৃষ্টিপাতের মাঝে রমণী আর বেশীক্ষণ ওভাবে থাকতে পারলো না। একরকম জোর করেই শিশুর মুখ থেকে স্তনাগ্রভাগ ছিনিয়ে নিয়ে বস্ত্রাভ্যন্তরে ঢেকে রাখলো। অবাধ্য শিশুও বুকের কাপড় টানাটানি করে কান্নায় ফেটে পড়ল। বিরক্ত রমণী তাতে আরো বিরক্ত ও বিব্রত বোধ করল। সাধু বাবার গঞ্জিকা বোধহয় তেমন জম্‌লো না তাই তিনি এগিয়ে দিলেন ভক্তবৃন্দের দিকে। বৃদ্ধ যাত্রীর মাথা ধরাও সেই সময় সেরে গেলো। মলম প্রচারক হতাশ হয়ে উঠে গেলো অন্য খদ্দেরের আশায়। ঘোড়ার খুর লাগানো জুতোর খট্ খট্ আওয়াজ করে দুজন সিপাই এলো ষ্টেসনের দিক থেকে। কোনদিকে না তাকিয়ে তারা সোজা এগিয়ে গেলো আব্ছা অন্ধকারে ঘুমন্ত ভিখিরীর কাছে। লাঠির খোঁচা দিতেই এক ঝাঁক মশা-মাছি ভন্‌ভন্ করে উড়তে লাগ্‌লো।

—এই আভিতক্ নেই গিয়া?

হতভম্বের মত ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে থাকে সে সিপাইদের দিকে অনেকটা বোবার মত। সে দৃষ্টিতে বেদনাও আছে ব্যক্তিত্বও আছে।

আবার লাঠির খোঁচা দেয় সিপাই। ধড়্মড়্ করে উঠে বসে সে।

—আর দু'একদিনের মধ্যেই চলে যাবো।

—নেই তুম্ আভি চলা যাও হিঁয়াসে। বড়া সাব্ বহুৎ গোঁসা হো গিয়া।

—আচ্ছা।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে ময়লা চাদরটা গুটিয়ে নিল সে। খৈনীতে চাপড় মার্তে মার্তে চলে গেলো সিপাই দুজন বাজারের দিকে। এ ঘটনায় মুসাফিরখানার সকলেই যেন কৌতূহলী হয়ে উঠ্লো। দেখ্লে মনেই হয়না ও একজন ভিখিরী। নিশ্চয় ও অবস্থা বিপাকে পথের ধূলোয় নেমে এসেছে। অথবা পেছনে কোন রোমাঞ্চকর ইতিহাসও লুকিয়ে থাক্তে পারে। উদাসী যুবকটি কিন্তু চেয়ে আছে মহাশূন্যের মেঘমালার দিকে। সাধু বাবা ভক্তদের দিকে ফিরে বললেন, 'দাগী আছে।' আর সকলের মনে কেমন একপ্রকার থম্থমে ভাব বিরাজ করতে লাগলো। এমন কি মলম প্রচারকও তার একঘেঁয়ে বক্তৃতা ভুলে গিয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো উদাসী যুবকের মুখে। হঠাৎ আগের চেয়েও জোরে হাঁক্ দিতে লাগলো ঃ—ম-ল-ম চাই ম-ল-ম।

কিন্তু একটু নজর রাখলেই দেখা যায় আড় চোখে যুবকের দিকে নজর রাখতে তার এতোটুকু ভুল হোচ্ছে না।

ধীরে ধীরে মুসাফিরখানা ত্যাগ করে রাস্তায় নেমে পড়ল যুবক। ওর পা টেনে টেনে চলার ভংগীতে বোঝা যায় অনেক দুর্বল হোয়ে গেছে ও। একরাশ রুক্ষ্ম চুল মুখের ওপর পড়ে আরো

বিমর্ষ করে তুলেছে ওকে। একটু গেলেই নির্জন মাঠ; চুপ্‌চাপ্‌ বসে পড়লো সেখেনে দুটো হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে।

—এই শোন—

গায়ে ঠেলা দিয়ে ডাক্‌লো সেই মলমওলা। চম্‌কে উঠ্‌লো যুবক। উজ্জ্বল চোখের তারা মেলে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলো সে মলমওলার দিকে। হঠাৎ যেন ভয় পেয়ে বলে উঠ্‌লো,

—হ্যাঁ হ্যাঁ আমি এখুনি চলে যাচ্ছি।

তার কাঁধে একটা হাত রেখে প্রাণখোলা হাসিতে ভেঙে পড়্‌লো মলমওলা। সে হাসি যেন আর থামবে না। গলার শিরা দুটো মোটা দড়ির মত ফুলে উঠেছে। চোখ দুটো যেন এখুনি ঠিক্‌রে বেরিয়ে আস্‌বে এমনই সে হাসির বেগ। ভয়ে আর বিস্ময়ে যুবক বুঝে উঠতে পারলো না কে এই রহস্যময় আগন্তুক।

অতো প্রচণ্ড হাসি হঠাৎ থেমে গেল। পটপরিবর্ত্তনের মত একরাশ গাম্ভীর্য এসে সারা মুখখানা ছেয়ে ফেল্‌লে।

—নাম কি তোমার? 'তুমি' বল্‌ছি বলে কিছু মনে কোর না; বয়সে নিশ্চয়ই আমি তোমার চেয়ে অনেক বড় হবো।

—অজিত সেন।

অনেক ইতস্ততঃ করে বললে যুবক তার নামটা।

—ঠিক ধরেছি বাঙালীর ছেলে। বাড়ী নিশ্চয়ই কোল্‌কাতায়?

—বাড়ী কোথাও নেই তবে কোল্‌কাতাতেই থাকতাম্‌।

কথাটা শেষ করেই দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল অজিত সেন। বিশ্রী লোকটার সান্নিধ্য যেন একমুহূর্তও সহ্য করা যায় না।

—না না উঠো না বোসো।

অসহায়ের মত অজিত সেন পথের দিকে নজর দিল।

—কিন্তু আমিতো আপনাকে চিনি না।

—তাতে কি হয়েছে আমি তোমাকে চিনি, তোমার সব কথা জানি। পুলিশে খুঁজে বেড়াচ্ছেতো কেমন? চম্‌কে উঠ্‌লো একথায় অজিত সেন। চারপাশ তাকিয়ে সে হঠাৎ মলমওলার হাত দুটো ধরে ফেল্‌লে।

—দোহাই আপনার, আমাকে আর যাই করুন জেলে দেবেন না।

বলার ভংগীতে অব্যক্ত বেদনা ঝরে পড়তে লাগ্‌লো।

—এটুকু বিশ্বাস তুমি আমাকে করতে পারো যাতে তোমার খারাপ হয় এমন কিছু আমি কোর্‌বনা তবে একটু আগে যা বলছিলাম—আমি তোমার সব কথা জানি। দেখো অজিত, সৎকাজ করলে তার পুরস্কার স্বরূপ মধ্যে মধ্যে এমন ফেরারী আসামী হয়ে ঘুরে বেড়াতে হয়। তুমি আর কদিন ঘুরছো, আমি পঁচিশ বছর ধরে লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। অবশ্য লুকিয়ে থাক্‌লেও কাজ বন্ধ নেই। বিস্ময় বিমুগ্ধ স্বরে অজিত সেনের গলা থেকে বেরিয়ে এলো:

—আপনি!

হঠাৎ গলার স্বর অনেকটা খাদে নামিয়ে প্রায় ফিস্‌ ফিস্‌ করে

মলমওলা অজিত সেনের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বল্‌লে ঃ

—আমার নাম বদ্যিনাথ রায়·········

তড়িতাহতের মত চম্‌কে উঠল অজিত সেন।

—আপনি সেই বদ্যিনাথদা! আমরা তো একরকম ধরে নিয়ে ছিলাম আপনি আর বেঁচে নেই। সত্যি আপনার আর কোন খবর তারপর থেকে কেউ পায়নি। আপনার সারা জীবনটাই একটা আদর্শ! দেশের কাজে এতোখানি ত্যাগস্বীকার বোধহয় আপনি ছাড়া আর কেউ করেনি। কিছু মনে কোরবেননা, আপনার নামই শুনেছি কিন্তু আপনাকে দেখবার সৌভাগ্য আমার এই প্রথম হোল সেজন্যেই চিন্‌তে পারিনি।

—খুব স্বাভাবিক। আমরা যখন বিপ্লবীর জীবনে প্রবেশ করি তখন তোমরা কোথায়! অগ্নিযুগের কথা মনে হলে আজও শরীর রোমাঞ্চিত হযে ওঠে। বৃটিশের জেল বেয়নেটই ছিল তখন আমাদের লক্ষ্য এখন হাওয়া বদ্‌লে গেছে তাই পন্থাও পাল্‌টাতে হয়েছে দেশ কাল পাত্র ভেদে। আজ তুমি জেলকে ভয় করছ কারণ জেল আমাদের লক্ষ্য নয় তাই লুকিয়ে থেকেও কাজ বন্ধ করতে পাচ্ছি না। আমাদের এখন একমাত্র কাজ দেশের প্রত্যেকটি লোকের জীবন যাত্রার মান বাড়ান, আত্মঘাতী যুদ্ধে শক্তিক্ষয় করা নয়। মতবাদ জর্জরিত দেশের পক্ষে একমাত্র কাজ জনসাধারণের মধ্যে সদ্ভাব ও সম্প্রতি প্রতিষ্ঠা করা, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার

উপাসনা করা। স্বাধীনতা বঞ্চিত জাতির মর্মবেদনা যে কত তীব্র তা আমরা অনুভব করেছি ক্লাইভ্ থেকে ভাইকাউন্ট মাউন্ট-ব্যাটেন পর্যন্ত হয়ত নাৎসীদের পদানত হয়ে য়ুরোপও এতোখানি ভোগ করেনি। যাক্‌গে, ওসব কথা আলোচনার সময় বা স্থান এটা নয়। তুমি তো এখানে প্রায় দিন পনের ঘুরে বেড়াচ্ছো, নাওয়া খাওয়াও হোচ্ছে না, কিছু খাবে?

—নাখেয়ে খেয়ে ক্ষিধেটাকে একরকম জব্দ করে এনেছি। তার ক্ষিধে তেমন টের পাইনা।

—যা বলেছো, আমিও এক সময় এক নাগাড়ে একুশ দিন না-খেয়ে কাটিয়ে দিয়েছি। কি জানো অজিত, বিপ্লবীর জীবনে এটুকু কষ্ট সহ্য করতে না পারলে তার পক্ষে বিপ্লবী না হওয়াই উচিত। আচ্ছা তোমার সংগে বোধহয় কিছু নেই মানে পয়সা কড়ি······

—না। এক কাপড়েই চলে এসেছি। যা দু'পাঁচ টাকা ছিল তাও চুরী হয়ে গেছে মুসাফিরখানায়।

—একেই বলে সময় খারাপ হলে কানা কড়িটিও হারাতে হয়। তোমার সংগে আর বেশী কথা বল্‌বোনা; শত্রুর তো অভাব নেই এখেনে। তার চেয়ে এক কাজ কর তুমি সোজা আমার বাসায় চলে যাও, সব কথা আলোচনা করা যাবে সেখেনে।

—কিন্তু আমাকে আশ্রয় দিয়ে আপনি যে আরো বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বেন।

—না হয় একটু হলাম। একই পথের পথিক আমরা, পরস্পরের সংগে সহযোগিতা করে না চল্‌লে আমাদের অমরাবতীতে পৌছুব কি করে। ওসব কিছু মনে কোরনা। এই নাও আমার ঠিকানা। বাসায় আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই। আর দেখো, পথের মধ্যে কাউকে কিছু জিজ্ঞেস্ কোরনা। তোমায় যে ভাবে এঁকে দিলাম নিশ্চয়ই তোমার পক্ষে বাসাটা খুঁজে নিতে খুব কষ্ট হবে না।

—কিন্তু এতো সুরেন কুণ্ডুর বাসার ঠিকানা দিলেন।

—ওঃ এটুকুও বোঝনা ঢের ছেলেমানুষ হে ঢের ছেলে-মানুষ!

—এবার বুঝতে পেরেছি আমায় ক্ষমা করুন।

—আর একটা কথা। বাড়ীতে গিয়ে ভেতরকার কথা যেন কিছু বোলনা। শুধু বোল দাদা পাঠিয়ে দিলেন। স্ত্রী আমার বেশ একটু কড়া মেজাজের. তুমি কিন্তু ভাই একটু সাম্‌লে নিও কেমন? হঠাৎ যেন রাগ.টাগ্ করে অন্য কোথাও চলে যেওনা। তোমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা আমিই ঠিক করে দোব। অন্য কাউকে যেন আসল নামটা বলে ফেলোনা।

—আচ্ছা। কিন্তু আপনি কখন যাবেন দাদা?

—আমার যাওয়ার কোন ঠিক নেই। জানোইতো মলম বেচাটা নিতান্তই গা ঢাকা দিয়ে থাকবার একটা আবরণ মাত্র। তবে খুব চেষ্টা কোরব যাতে তিন চারদিনের মধ্যে তোমার সংগে দেখা করতে পারি।

বিশ্বনাথ রায়ের পেছন পেছন অজিত সেনও এগিয়ে চল্‌ল বাজারের দিকে—খানিকটা ব্যবধান রেখে। মিনিট দশেক হেঁটে গেলেই উত্তরমুখো বড় রাস্তার দুধারে বাজার। আয়তন খুব বড় না হলেও এখানে ওর নাম বড়বাজার। বাঁয়ে ঢুকতেই মস্ত বস্তীর অনেকটা জুড়ে ভগবান সিংএর হিন্দু হোটেল। রংচটা সাইন বোর্ডের একদিকের তার ছিঁড়ে যাওয়ায় এক পাশে হেলে পড়েছে বোর্ডটা. এতেই বোঝা যায় হোটেলটি খুব নতুন নয়। ডানদিকের বস্তীগুলোর গড়ন পেটনে বোঝা যায় যে, সন্ধের পর এখানটা টক্‌ গন্ধ আর দর কষাকষিতে মাতোয়ারা হোয়ে ওঠে। দিনের আলোতেও কয়েকজন দাওয়ার ওপর বিজ্ঞাপনের মত স্খলিত বসনে বসে আছে নানারকম হাতছানী দেওয়ার ভংগীতে।

—এসো কিছু খেয়ে নেওয়া যাক্‌।

অজিত সেন বাজারের মধ্যে খুব বেশীক্ষণ থাক্‌তে চায় না।

—আমার কিন্তু এখন না খেলেও চল্‌তো দাদা।

—মাইরী আর কি! পনেরো দিনে শরীরের কি চেহারা হয়েছে দেখো আয়নাতে······

অজিত সেনের হাতধরে টেনে নিয়ে হোটেলের একটা নির্জন ঘরে ঢুকে পড়ল বিশ্বনাথ রায়।

—বসো, এখানে কোন ভয় নেই, ভগবানও আমাদের দলে।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বল্‌লে বিশ্বনাথ। অজিত সেনের বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমশঃ বেড়ে যেতে থাকে।

—তাই নাকি!

—থাক্ ওকথা, হোটেলে অনেকরকম লোক থাকে। ওহে সিং, গরম গরম কিছু দিয়ে যাও ক্ষিধেয় প্রাণ গেলো।

ছুটি শাল পাতায় গরম রুটি আর ডাল নিয়ে এলো ভগবান। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা। চুলে পাক ধরলেও চোখে মুখে একটা দৃঢ়তার ছাপ। কথা বললেই সামনের তিনটি দাঁত ভাঙা দেখা যায়। বাঁহাত থেকে পাঁজর অবধি কয়েকটা ছুরী খাওয়ার দাগ সুস্পষ্ট। মস্ত গালপাট্টার নীচে ঠোঁটের খানিকটা কাটা দাগ চোখে পড়ে। এক গাল হেসে পরিস্কার বাংলায় জিজ্ঞেস্ করলে সিং:

—কোথায় নিয়ে চললেন এঁকে।

—আমার বাসায় এখন ওকে রাখবো ঠিক করেছি।

—সেতো খুব ভালো কথা তবে আমার এখেনেও রাখ্‌তে পারি যদি আপনি বলেন...

—না তাতে তোমার বিপদ আরো বাড়বে। এখেনে থাকা ওর কোন মতেই চল্‌বে না। নজর যখন একবার পড়েছে তখন আমাদের খুব সাবধানে থাকা দরকার। জানো অজিত, এই ভগবান হোল আমার ডানহাত। ভগবান না থাক্‌লে এখানকার কাজ আমি একদিনও চালাতে পারতাম না।

দুহাত তুলে নমস্কার করল অজিত সেন। প্রতি নমস্কার জানালো ভগবান বিনয়ের হাসি হেসে।

—বুঝলেন অজিতবাবু, এসব আর ভালো লাগে না। এই এক ঘেয়ে হোটেল চালানো আর পাঞ্জাবী সেজে বসে থাকা কি

আমাদের পোষায় এর চেয়ে বরং জেলে পচা অনেক ভালো। কতোবার দাদাকে বল্‌লাম অন্য কাজ দিতে কিন্তু দাদার সেই এককথা, সময় এখনো আসেনি। আচ্ছা বস্তিনাথদা, কোনদিন কি আমরা সে সুযোগ পাবো ?

একথায় বস্তিনাথ রায়ের শীর্ণ শরীরে অদ্ভুত প্রতিক্রিয়ার সঞ্চার হোল। কোথায় গেলো সেই রোগা, লম্বা, ফ্যাকাসে মলমওলা তার বদলে এলো এক শৃংখলিত সিংহ। এক হুংকারে ছিঁড়ে ফেল্‌বে লৌহ-শৃংখল তারপর ঝাঁপিয়ে পড়বে রক্তের নেশায়। দু'চোখে আগুনের ইংগিত। মুষ্টিবদ্ধ হাতের পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠ্‌ছে। তাড়াতাড়ি খেতে গিয়ে খানিকটা জল চল্‌কে পড়ে গেল কেরোসিন কাঠের নড়্‌বড়ে টেবিল্‌টার ওপর।

—নিশ্চয়ই ! নিশ্চয়ই সেদিন আসবে ভগবান। নিজেকে স্বপ্রতিষ্ঠার জন্যে মানুষের সংগ্রাম চলে আসছে যুগ যুগ ধরে তা কি কখনও ব্যর্থ হোতে পারে ? কখনই না কখনই না। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি তার আর খুব বেশী দেরী নেই। প্রভুত্ব-প্রিয়তা চরমে দাঁড়িয়েছে এবার সেই আগুনে ওদের সবাইকে উন্মত্ত পতংগের মত পুড়ে পুড়ে ছাই হতে হবে। আমাদের কিছুই করতে হবে না, ওদের বিষোদ্‌গার ওরা নিজেরাই করবে। সমগ্র পৃথিবীর ওপর যারা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করবার চেষ্টা করছে জাতিপুঞ্জ-সংঘের কাঠামোর ওপর দাঁড়িয়ে, তারা যতোই উদারতার অভিনয় করুক না কেন সত্য থেকে বিশ্ব-বাসীকে ফাঁকি দিতে পারবে না।

অজিত সেন অভিভূতের মত শুনে যাচ্ছে বশ্চিনাথ রায়ের কথা।
ঢোক্ গিলে খুব আস্তে আস্তে বল্‌লে ভগবান :

--কিন্তু আমাদের তো কেউ চিন্‌লে না দাদা।

—হ্যাঁ, এখনও হয়ত অনেকেই নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত ভুলে গেছে কেন জানো ? যশোলিপ্সায় ছদ্মবেশী হয় আপন আর প্রকৃত হিতকারী হয় অত্যুৎসাহী গায়ে পড়া বন্ধু তাই তার সান্নিধ্য কারো কাম্য নয় কিন্তু ছদ্মবেশের অন্তরালে পচনক্রিয়া স্বুরু হবেই আর তারি দুর্গন্ধে সবাইকে নাসিকা কুঞ্চিত করতেই হবে। হয়তো ছদ্মবেশীর নাসারন্ধ্রে তার এতোটুকুও প্রবেশ করবে না, কিন্তু ছদ্মবেশ খসে গেলে তারি সামনে যখন তার নিজের গলিত শব দেখতে পাবে তখন আর লুকোবার জায়গা পাবে না। আমাদের আর একটা মস্ত দোষ হোল, আমরা হট্ করে একজনকে বড় করে তুলি। এতে যে আরো পেছিয়ে পড়ি এ খেয়াল অনেকের হয় না। তবে ভগবানের কথার মধ্যে অভিমানই বেশী. কিন্তু তুমি কাদের ওপর অভিমান করছ ভগবান, শহরের কয়েকলক্ষ সুবিধাবাদীর ওপর সারা দেশটার বিচার করা চলে না। এদেশে মানুষ কোথায় যে তার ওপর অভিমান করে বসলে ? বুজ্‌রুকী আর চোখরাঙানীর ওপর যে দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হোয়ে আসছে সে দেশে হঠাৎ অবাধ স্বাধীনতা এনে দিলে তারাই বা হজম করবে কি করে! তাই আগে প্রত্যেকটি মানুষের চেতনার দ্বারে আঘাত করে করে তাদের জাগিয়ে তোল, তাদেরও যে স্বকীয় স্বত্বা আছে এটা বুঝিয়ে

দাও, তারপর দেখো কেমন তারা চিনতে না পারে। আর মানুষের মাঝে ভগবান সেজে সোনার সিংহাসনে বস্‌বার উদ্দেশ্য যখন নেই তখন মিছিমিছি নিজেকে এতো চেনাবার জন্যেই বা ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ছো কেন। মানুষ হোয়ে জন্মেছো যখন, তখন একটা আঁচড় অন্ততঃ কেটে যাও পৃথিবীর বুকে। দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়ে নিজের জগতটাকে ঘিরে রেখোনা। বিরাট সম্ভাবনার জন্যে নিজেকে সবরকম ত্যাগের জন্যে সর্বদা তৈরী রাখবে। আচ্ছা ভগবান এসব কথা এখন থাক্। অজিত বড়োই ক্লান্ত, ওকে এখুনি পাঠিয়ে দেওয়া দরকার। তিন চার দিন পরেই তো আবার মিটিং আস্‌ছে তখন এসব আলোচনা করা যাবে। এসো অজিত……

বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে উভয়েই বেরিয়ে এলো রাস্তায়। মলমের গুণকীর্তন আরম্ভ করে বাজারের আরো ভেতরে এগিয়ে গেলো বদ্যিনাথ রায়।

—ম-ল-ম-চাই-ম-ল-ম ……

নিরীহ ভিখিরীর মত ধুঁক্‌তে ধুঁক্‌তে ষ্টেসনের দিকে পা চালিয়ে দিল অজিত সেন। চাটুর ওপর খুন্তি নেড়ে রুটি সেঁক্‌তে লেগে গেলো ভগবান।

বদ্যিনাথ রায়ের এঁকে দেওয়া ম্যাপ দেখে অজিত সেন অনেক কষ্টে খুঁজে বার কোরল বাসাটা। বাড়ীটা খুব প্রাচীন তাহলেও ভেতরে বেশ মজবুত আছে। নীচের তলায় এক বুড়ী অজিত সেনকে ঢুকতে দেখে হা হা করে ছুটে এলো কিন্তু বদ্যিনাথ রায়ের নির্দ্দেশমত সে কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা উঠে গেল ওপরে। বাইরে এতো আলো কিন্তু সিঁড়ির মধ্যে মনে হয় মধ্যরাত্রি। পুরোণ আমলের গাঁথনী তাই সিঁড়ির ওপর পা দেওয়ার সংগে সংগে ধপ্ ধপ্ করে আওয়াজ ওঠে। এখনও শোনা যাচ্ছে নীচের বুড়ীর অনর্গল চীৎকার কিন্তু কেউই কর্ণপাত করছে বলে মনে হয় না, হয়ত পুরো বাড়ীটাই ভাড়া দেওয়া অথবা বুড়ীর স্বভাবই ওইরকম। তিনতলার সিঁড়ির পাশেই অসংখ বল্টু মারা আল্কাতরা মাথান পুরোণ কাঠের দরজা। মৃদু চাপ দিয়ে বুঝলো দরজা বন্ধ। বেশ ভয়ে ভয়েই অজিত সেন দুবার টোকা দিল কিন্তু কোনই ফল হোল না। কড়া মেজাজের কথা স্মরণ করে কড়া নাড়তে সাহস হোলনা তাই আস্তে আস্তে ডাক দিল ঃ

—দাদা বাড়ী আছেন—সুরেনদা—ও সুরেনদা······

কিন্তু তারও কোন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না শুধু অন্ধকার সিঁড়ির সুরকি মাজা খিলেনে ঘুরপাক খেতে লাগ্লো কথা কটা ঘূর্ণী বায়ুর মত। ভেতরে ভেতরে ঘেমে উঠ্লো অজিত সেন। উপায় নেই অগত্যা মরীয়া হোয়ে সে আরো একটু জোরে ডাক দিল ঃ

এবারে উত্তর এলো কিন্তু নেপথ্যের সেই আওয়াজ শুনে তার রক্ত চলাচল বন্ধ হবার জোগাড়।

—কে—কাকে চাই—তিনি বাড়ী নেইতো—

সারা পৃথিবীর সব কঠিনতাটুকু যেন সে গলায় বসান। অন্য কেউ হলে সে গলার স্বরে তিনলাফে তিনতলা থেকে রাস্তায় নেমে পড়তো কিন্তু অজিত সেন নিরুপায়। মৃত্যু জেনেও আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে তাকে। সশব্দে দরজা খুলে গেল। দরজা খোলার আগে পর্যন্ত অজিত সেন মনে মনে মোটামুটি খানিকটা কল্পনা কোরে নিয়েছে বদ্যিনাথদার কড়া মেজাজের স্ত্রী কিরকম হোতে পারে। হয়তো খুব রোগা, লম্বা, বছরের মধ্যে ন'মাস অম্লশূলে কষ্ট পান কিম্বা খুবই মোটা একটু নড়াচড়া করতে হলেই মেজাজটা কড়া হয়ে ওঠে। কিন্তু একি! এযে সম্পুর্ণ তার বিপরীত! কল্পনার সংগে এতোটুকু মিল নেই মহিলার। বয়সে বোধহয় বদ্যিনাথদার মেয়ের বয়সী হবে। অজিত সেনের ভালো করে চেয়ে দেখবার মত সাহস হয় না। একবার তাকিয়েই অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয় কারণ এমন কণ্ঠের যিনি অধিকারিণী তিনি যে কিভাবে অভ্যর্থনার পালাটা সাংগ করবেন তা যেন ভাবাই যায় না। কিন্তু আশ্চর্য, মহিলার গলার স্বর হঠাৎ পরিবর্তিত হয়ে গেল।

—উনি তো এখন বাড়ী নেই

সংগে সংগে জবাব দিতে গিয়ে গলায় একটা ঢোক এসে গেল অজিত সেনের।

—তা জানি কিন্তু দাদাই আমাকে পাঠিয়ে দিলেন……

—ও—। আসুন, ভেতরে আসুন। কিছু মনে কোরবেন না অনেকক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছি। আপনি ডাকছেন কি করে জানবো বলুন আমি মনে করলাম বুঝি কেষ্টটাই আবার এসেছে।

গলার স্বরে বেশ স্নেহ ঝরে পড়ছে। অজিত সেন যন্ত্র-চালিতের মত অনুসরণ করল অনবগুণ্ঠিতার পিছনে।

—দাঁড়ান্ একটু, দরজাটা বন্ধ করে দি। জায়গাটার আবার সুনাম আছে কিনা।

দরজায় আবার খিল পড়ে গেল। বারান্দা দিয়ে খানিকটা গিয়েই দাঁড়িয়ে পড়লেন মহিলা। অজিত সেন বড়োই অপ্রস্তুত বোধ করতে থাকে। সে ভাবতেই পারেনি এমন একটা পরিবেশের মধ্যে তাকে প্রবেশ করতে হবে। তার মনে সংশয় জাগে বদ্যিনাথদা কি দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে করেছেন তানইলে তাঁর স্ত্রীকে দেখে তো খুব বেশী বয়স হয়েছে বলে মনে হয় না।

—চলে আসুন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন অতো। কবিতা টবিতা লেখা অভ্যেস আছে বুঝি? আমারও একসময় লেখার বাতিক ছিল এখন অবশ্য আর লেখার তেমন ইচ্ছে হয় না।

এরই মাঝে হয়ত অজিত সেনের দু'এক কথা জিজ্ঞেস্ করবার মত ফুরসৎ আসে কিন্তু তা অনেক কষ্টে সাম্‌লে নেয় সে।

আচম্বিতে অজিত সেনের চোখে চোখ পড়ে যায় মহিলার। বিপ্লবী অজিত সেনের জীবনে কে যেন আর একটা দুয়ারে ধাক্কা মারে যার সন্ধান এতোদিন ওর নিজেরই মনে ছিলোনা।

—আচ্ছা সত্যি করে বলুন তো বাড়ী থেকে রাগ করে চলে এসেছেন কিনা ?

—না না কক্ষনো না। আর বাড়ী থাক্‌লে তো রাগ করব। অজিত সেন হাঁফিয়ে ওঠে এই সামান্য কথা কটায়।

—জামা কাপড়ের এমন ছিরি কেন। বাড়ী নেই বলে কি নিজের ওপরেই রাগ করে বস্‌লেন শেষটায় ?

একথার কোন উত্তর দিতে পারে না অজিত সেন। বদ্রিনাথ রায়ের নিষেধ তার মনে যায়। মাটির দিকে মুখ করে থাকলেও সে বেশ অনুভব করে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে একজোড়া চোখ। হয়ত পলক পর্য্যন্ত পড়ছে না। অজিত সেনের সমস্ত শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে ওঠে, স্নায়ুমণ্ডলী বার বার ঝাঁকুনী দিয়ে তাকে কাঁপিয়ে তুলতে চায়। নারীর এতো নিকটে সে আর কখনও এমনভাবে দাঁড়ায়নি। সাম্‌নেই যেন অশান্ত প্রকৃতির আসন্ন প্রলয়। তার সর্বাংগে প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা। এক মুহূর্ত দাঁড়ান যায়না। নীরব চোখে যেন আলেয়ার ইংগিত। অবাধ্য যৌবনের রণক্লান্ত আহ্বান। কপাল থেকে ঘাম টুপিয়ে পড়ে অজিত সেনের। পা দুটোও মধ্যে মধ্যে কেঁপে ওঠে অজানা ভয়ে।

—এই ঘরে আপনি থাকবেন। অবশ্য ঘরটা খুব ভালো হোলনা তা আর কি করা যাবে আমার ঘরটাতো আর ছেড়ে দিতে পারিনা।

মহিলার নির্দেশমত অজিত সেন ঢুকে পড়ল ঘরখানার মধ্যে। আস্‌বাব্‌হীন চূণবালিখসা ঘরখানাই তার কাছে আজ স্বর্গের চেয়েও দামী। তবুতো মুসাফির খানার চেয়েও ঢের ভালো।

একটা ছেঁড়া পাটি পাতা ছিল ঘরে। মুখ নীচু করে গুম্‌ হয়ে বসে পড়ল তার ওপর। এখনও যেন মনে হোর্চ্ছে উন্মুকের মত দৃষ্টি তার ওপর স্থির হয়ে রয়েছে। অনেকক্ষণ একভাবে বসে থাক্‌বার পর অজিত সেনের শ্রান্ত-ক্লান্ত শরীর ওরই অজ্ঞাতে এলিয়ে পড়ল ছেঁড়া পাটির ওপর। পনের দিনের অনিদ্রা এসে গ্রাস করে ফেল্‌লে।

হঠাৎ কিসের শব্দে তার ঘুম ভেঙে গেল। অন্য কিছু নয় এক বাল্‌তি জলের শব্দ।

—ঘুমের কম্‌পিটিসনে কুম্ভকর্ণও বোধহয় হেরে যাবে।

লজ্জায় মাটির সংগে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করে অজিত সেনের। বেশ বোঝা যায় কান দুটো জ্বালা করছে। রগের দুপাশ দিয়ে একটা গরমভাব ক্রমশঃ ওপরে উঠে যাচ্ছে। মুখ আর তুল্‌তে পারেনা, এককোণে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে অপরাধীর মত। একটা কিছু বলা দরকার মনে করে বলে :

—সত্যি বড্ড ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

সংগে সংগে জবাব আসে :

—ঘুম পেলেই মানুষ ঘুমোয়, এটা এমন কিছু লজ্জার কাজ নয়। আপনি এখনও সেই ময়লা জামাকাপড়গুলো পরে আছেন! ধন্য আপনি! অন্য জামাটামা নেই বুঝি না পর্তে মায়া হোচ্ছে! আপনার কাণ্ড দেখে মনে হোচ্ছে আপনার জন্যে আমাকেই রোগ ভোগ কর্তে হবে।

নির্বাক অজিত সেনের বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ী পেটা সুরু করে দেয়। প্রতি মুহূর্তে নব নব বিস্ফোরণের আশংকায় মনটা সচেতন হয়ে ওঠে।

—কী দাঁড়িয়ে রইলেন যে চুপ্ চাপ্? সন্ধে যে গড়িয়ে এলো। ঘরটা নয় মুছে দিচ্ছি তাবলে শরীরটা তো আর মুছিয়ে দিতে পারবোনা। ওপাশে কল ঘরে গিয়ে নেয়ে আসুন। তেল, সাবান, সব ঠিক করা আছে। মহিলার প্রতি কথায় যেন বিদ্যুতের শিহরণ। অজিত সেনের নিজস্ব চিন্তাশক্তি বা ব্যক্তিত্ব বলে যেন কিছুই নেই। নববধূর মত ওর অসংখ দোষ ত্রুটি গুলো ধরা পড়ে যাচ্ছে। ও যেন একটা মানুষই নয়। ঘেমে নেয়ে ওঠে অজিত সেন। একটা সামান্য স্ত্রীলোকের কাছে সে এতোই দুর্বল বোধ করছে নিজেকে! কিন্তু আড়ষ্ট জিহ্বা একটি শব্দও বার করতে নারাজ। ঘর মোছ্ বার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন মহিলা।

—কোই যান্, চান্ করে আসুন। গায়ের গন্ধে যে বমি উঠে আস্‌ছে।

সত্যি আজ পনের দিনেরও বেশী হবে অজিত সেনের স্নানের সংগে কোন সম্বন্ধ নেই। পথে প্রান্তরে ঘুরে বেড়িয়ে আজ তার এমনই অবস্থা যে তার নিকটতম বন্ধুও বোধহয় চিন্‌তে পারবেনা। ঘামে আর পথের ধূলোয় গায়ের আসল রং চাপা পড়ে গেছে। তারওপর একই জামা কাপড়, পরিবর্তনের ইচ্ছে থাক্‌লেও উপায় নেই। অথচ এই অজিত সেনই এক সময় রীতিমত বিলাসী ছিল। প্রেসিডেন্সীর নাম করা ছাত্র অজিত সেন, যার মুখের তোড়ে কতো অসংখ মেয়ে মুখ ঢেকে পালাতে পথ পায়নি সেই আজ একটা সাধারণ মেয়ের কাছে কতোখানি অসহায় কতোখানি বিভ্রান্ত।
আবার সেই তীব্র ঝংকার:

—কানেও দেখ্‌ছি কম শোনেন আপনি। আপনি না গেলে আমি ঘর মুছ্‌তে পাচ্ছি না। দেহটা নাহয় আপনার কিন্তু ঘরটাতো আমার। আপনি হাঁ করে চেয়ে থাক্‌বেন আর আমি ঘর মুছ্‌বো তা আমার কোন মতেই সহ্য হবে না।

অজিত সেনের গলায় যেন ঘড়্ ঘড়্ করে একটা অব্যক্ত স্বর। তার মনে হয় কে যেন একটা চড় মারলে তার গালে ঠাস্ করে। প্রায় ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে সাম্‌নের খোলা বারান্দায়। আলোবাতাসহীন ভ্যাপ্‌সা ঘর থেকে ফাঁকা

বারান্দার ঠাণ্ডা হাওয়ায় এসে অতর্কিতে তার মুখ থেকে বেরিয়ে আসে পরমতৃপ্তির নিঃশ্বাস—'আঃ'।

প্রায় সংগে সংগেই শংকিত হয়ে ওঠে ভয়ে আর ভাবনায়। গলা পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায় যদি মহিলার কানে গিয়ে থাকে কথাটা তাহলে না জানি কি অনর্থই বাধিয়ে বস্‌বেন এখুনি। পাশেই কলঘর দেখে ঢুকে পড়ে সেখেনে। আস্তে আস্তে দরজাটা বন্ধ করে দেয়। পুরোণ দরজা বন্ধ হওয়ার ক্যাঁচ্ কোঁচ্ শব্দের সংগে সংগে বর্শার ফলকের মত কানে এসে ঢোকে মহিলার কলকণ্ঠের হাসি। প্রাণখুলে নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দেয় অজিত সেন জলের মাঝে। কতোদিন যে এমনভাবে স্নান করেনি তা যেন কল্পনাই করা যায় না। সারা গায়ে এতো ময়লা জমেছে যে আর উঠ্‌তেই চায় না; আঠার মত জড়িয়ে গেছে সারা গায়ে। সাবান আর ছোবড়া দিয়ে ঘষে ঘষে তার সব্‌টাই উঠিয়ে ফেল্‌লে অনেকক্ষণ ধরে। এতোক্ষণে তার চামড়ার গোলাপী আভা আবার ফুটে বেরুল অনেকটা মেঘমুক্ত অরুণের মত। জীবনে যেন নতুন করে জোয়ার এলো। মিষ্টি সাবানের গন্ধে সমস্ত মনটা প্রফুল্লতায় ভরে উঠেছে। কিছুতেই ছেড়ে যেতে ইচ্ছে হয় না এই স্নানের আনন্দটুকু। এতোদিন পরে স্নানের আনন্দ তাকে যেন পাগল করে তুলেছে।

দরজায় ধাক্কার শব্দে সে চম্‌কে ফিরে এলো রূঢ় বাস্তবে। মনে পড়ে গেল বদ্যিনাথদার কড়ামেজাজী স্ত্রীর কথা।

—এখনও নাওয়া হোলনা আপনার! কলঘরে বসে ধ্যান কচ্ছেন না কবিতা লিখ্‌ছেন যে এতো দেরী হোচ্ছে। তাড়াতাড়ি করুন একটু দয়া করে কবিমশাই, আবার আমাকেও গা ধুতে হবে তো······

তাড়াতাড়ি কোন রকমে পরনের ভিজে কাপড়টা নিংড়ে গা মাথা মুছে নিল অজিত সেন। দরজা খুলতেই দেখে মহিলা সাম্‌নেই দাঁড়িয়ে। হাতে বোধহয় তার ময়লা দুর্গন্ধ চাদরটা। অজিত সেন আবার সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, হয়ত এই ময়লা চাদরটার জন্যেই আবার তাকে দুকথা শুনতে হবে। পলকের জন্য চোখ তুলে দেখল, ওঃ—কি উৎকট বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার প্রকাশ সে চোখে। বড় বড় চোখ দুটো যেন তার অন্তরতম প্রদেশেও হানা দিচ্ছে।

—বাঃ—সুন্দর দেখতে তো আপনি! আপনার রংটা দেখে আমার নিজেরই হিংসে হোচ্ছে।

লজ্জায় অজিত সেন এতোটুকু হয়ে যায় মহিলার সামনে। তার ফর্সা মুখখানা লাল হয়ে ওঠে। পাশ কাটিয়ে যেতে গিয়েও হাতটা মহিলার হাতের সংগে সামান্যর জন্যে ছুঁয়ে গেল। অজিত সেন এই অনিচ্ছাকৃত স্পর্শের জন্যে মোটেই প্রস্তুত ছিলনা তাই ভীতিবিহ্বল চিত্তে মনে হয় পায়ের তলার একমাত্র অবলম্বন ধরিত্রীও দুলতে আরম্ভ করেছে। মহিলা কিন্তু কিছুই বল্‌লেন না। কটাক্ষের হাসি হেসে কলঘরের

দরজা বন্ধ করে দিলেন। বন্ধ কলঘর থেকে তাঁর কণ্ঠে ধ্বনিত হোল মিহি স্বর :

—আমার এখুনি গা ধোওয়া হয়ে যাবে আপনি যেন আবার দরজার সামনে হাঁ করে চেয়ে থাক্‌বেন না। দুকান চেপে নির্বোধের মত অজিত যেন ভ্যাপ্‌সা ঘরটায় ফিরে এলো। ভিজে কাপড়েই দাঁড়িয়ে রইলো এককোণে যেন পাষাণে খোদিত মানুষের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। সে ভাবতে চেষ্টা করে কি জটিল চক্রান্তে তার জীবনটা নিয়ে ছিনিমিনি খেলা চলেছে এই পৃথিবীটার ওপর। প্রথম জীবনেই সে বাপ-মা হারা। পরের অনুগ্রহে কলেজ জীবন কেটেছে। সারা ছাত্রজীবনে একমাত্র পড়া ছাড়া অন্য কোন চিন্তাই ছিলো না তার মনে। কলেজের কোন মেয়েই তার কাছে আমল পায়নি এর জন্যে আড়ালে তারা কতো ঠাট্টা তামাসাই না করতো। শুধু দুর্বল ছিলো সরযূর কাছে। কিন্তু একটা মিথ্যে কলংকের বোঝা নিয়ে তাকে সরে আসতে হোল আশ্রয়দাতার কাছ থেকে। চাক্‌রীতে তার কোনই সুযোগ ছিলো না তাই সমস্ত দরখাস্তগুলো নামঞ্জুরের তালিকায় পড়ে গেল। সামান্য একটা স্কুল মাষ্টারের চাক্‌রীতেও যে সুপারিসের দরকার এ অভিজ্ঞতাও তার সঞ্চিত হোল। অনন্যোপায় হয়ে তখন সে ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা কোল্‌কাতার একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত। যে কোন একটা বৃত্তি গ্রহণ করতে তখন সে প্রস্তুত কিন্তু আত্মীয়পোষণনীতির চাপে তার ক্ষীণ আবেদন কারো অন্তর টলাতে পারলো না।

চতুর্দিক্ থেকে নৈরাশ্যের তীব্র কষাঘাতে তার ভাবপ্রবণ মন ধীরে ধীরে কঠিন হয়ে এলো। সারা পৃথিবীটাই তখন তার কাছে অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন। জলে ডুবে আত্মহত্যার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে গেলো গংগার ঘাটে। সেখানে শবদাহের দর কষাকষি দেখে হঠাৎ তার চোখের সাম্‌নে নতুন এক আদর্শ জন্ম নিল। জীবনের প্রতি মমতাহীন অজিত সেন পারল না আত্মহত্যা করতে। মনে মনে দৃঢ় সংকল্প কোরল 'ভেঙেচুরে নতুন পৃথিবী গড়্‌তে হবে।' তখন চলছে 'Quit India' আর 'Do or die'. গান্ধিজী বল্‌লেন—'He had no objection to Britain handing over power to Muslim League or any-other party provided it was real independence. তার পরেই ঝাঁপিয়ে পড়ল দুরন্ত গতিবেগে। দুর্জয় সাহস নিয়ে এগিয়ে গেলো সংগ্রামের পথে। জটিল আবর্তে পড়ে ঘুরতে লাগ্‌ল শনির বলয়ের মত। অন্তরে একটা বিরাট আগ্নেয়গিরি মাথা চাড়া দিতে লাগ্‌ল ক্ষণে ক্ষণে। কিন্তু অনুর্বর জমীতে চাষ কর্‌তে গিয়ে তাকেও বদ্যিনাথ আর ভগবানের মত অন্ধকারের পথ বেছে নিতে হোল।

—ভিজে কাপড়েই দাঁড়িয়ে আছেন তখন থেকে! কাপড় বোধহয় নেই···

আড়ষ্ট হয়ে যায় অজিত সেন একটু কঠিন হবার চেষ্টা করে বলে ঃ

—না, আর কাপড় নেই কিন্তু আমার কোন অসুবিধে

হোচ্ছে না। খানিক পরেই ভিজে কাপড় শুকিয়ে যাবে। একথায় মহিলার গলার স্বর আরো খন্‌খনে হয়ে ওঠে অনেকটা এক্গোছ্ কাঁসার বাসন হাত ফস্‌কে শানের মেঝেয় পড়ে যাবার মত।

—তাতো হোচ্ছে না বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছি কিন্তু ঠাণ্ডা লাগাটা তো আপনার আমার কথায় ওঠ্‌বোস্ করে না। যাক্‌গে কাপড় একটা নয় কোন রকমে দিতে পারি কিন্তু রান্না করে খাওয়াতে পারবো না সেটা আগে থাক্‌তেই বলে রাখ্‌লাম।

দম্‌কা ঝড়ের মত বেরিয়ে গেলেন মহিলা। অজিত সেনও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। পায়ের শব্দে বোঝা যায় আবার ফিরে আসছেন তিনি। চৌকাঠের ওপর একখানা পাটকরা রঙীন সাড়ী আল্‌গোছে রেখে আবার চলে গেলেন গম্ভীর হয়ে। অজিত সেনও সুবোধ বালকের মত কাপড়খানা বদ্‌লে ফেল্‌লে। সাড়ীকাপড় তাকে জীবনে প্রথম পরতে হোল। এতোখানি পরাধীনতা অজিত সেন কখনও ভোগ করেনি অন্ততঃ আজকের কয়েক ঘণ্টার মত।

সন্ধার আব্‌ছা অন্ধকার ধীরে ধীরে গাঢ় হয়ে আস্‌ছে। ঘরে ঘরে জ্বলে উঠ্‌ল বিজলীর আলো। মন্দিরে মন্দিরে বেজে উঠ্‌ল সন্ধারতির শংখঘণ্টা। এবাড়ীর মহিলাও চৌকাঠে জল ছিটিয়ে শাঁখে ফুঁ দিলেন তিনবার। তারপর কপালে হাত ঠেকালেন কার উদ্দেশ্যে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে অজিত সেন মহিলার

মুখের দিকে, তারপর আরও-আরও নীচে। হাতের প্রদীপের আলো পাত্‌লা হয়ে বাতাসের তালে তালে মহিলার রঙীন কাপড়ের ওপর ঐন্দ্রজালিক খেলা সুরু করে দিয়েছে। অসমতল সম্মুখভাগের প্রতি খাঁজে খাঁজে আলোছায়ার কি অপূর্ব পরিবেশন! প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসের উত্থান-পতনে দুরন্ত কামনা যেন সূক্ষ্ম সুতোর বাঁধনে আবদ্ধ থাকতে চায় না। ফুলে ফুলে এখুনি ফেটে পড়বে। প্রদীপের আলো আড়াল করে দাঁড়ালেন মহিলা। স্বচ্ছ আবরণ ভেদ করে ফুটে উঠলো নারীর দেহগঠনের অস্পষ্ট আভাষ। এখনও আলোর শেষ রশ্মিটুকু দূরের বেণীমাধবের ধ্বজায় লেগে রয়েছে। যবনাক্রান্ত বারাণসীর বেণীমাধবের মিনার দুটো জল থেকে সমান্তরাল হয়ে একটু হেলে গিয়ে মিশেছে ওপরের খিলেনে। তার ওপরেই রয়েছে মস্ত ভারী একটা গোলাকার গম্বুজ। তারপরে বেশ খানিকটা সরু হয়ে আবার দুপাশে বাড়তে বাড়তে ওপরে গিয়ে অনেকটা চওড়া হয়ে গেছে। আকাশস্পর্শী দুটো গোলাকার চূড়া জলের প্রতিবিম্বে ঝুলে পড়ে যেন ওপরের সমস্ত অংশটাকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছে। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অজিত সেনের দৃষ্টি স্থির হয়ে কোথায় হারিয়ে যায় কে জানে। সাম্‌নে শুধু ঘোলা জলের মত ঝাপ্‌সা আস্তরণ নেমে আসে।

খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠলেন মহিলা অজিত সেনের স্বপ্নালু চোখের দিকে চেয়ে। কোন্‌ অনন্তলোক হতে অজিত সেন আবার ছিট্‌কে পড়্‌ল এই মাটির পৃথিবীতে। লজ্জায়

চিবুকটা ঠেকে গেল কণ্ঠার কাছে। দুষ্টুমীভরা হাসির পাত্‌লা রেশ ঠোঁটে লাগিয়ে জিজ্ঞেস করলেন মহিলা :

—হাঁ করে কি দেখ্‌ছেন অতো, গাছ না পাখী!

ভ্রূদুটো কুঁচ্‌কে যায় তাঁর।

—এঁ্যা...

আবার সেই স্ূঁচের মত হাসির ফোয়ারা ছুটিয়ে, চঞ্চলা ময়ূরীর মত গ্রীবা বেঁকিয়ে চলে যান মহিলা প্রদীপ হাতে।

— দেখ্‌বেন ভালবেসে ফেলবেন না যেন।

অজিত সেনের সমস্ত শরীর শির্ শির্ করে ওঠে মহিলার বাক্যবাণে। তার ইচ্ছে হয় চীৎকার করে ডেকে বলে: 'ভালোবাসা অতো সস্তা জিনীষ নয় যে, যখন তখন যাকে তাকে ভালবেসে ফেল্‌লেই হোল।' কিন্তু নির্ভীকভাবে একথা উচ্চারণ করা তারপক্ষে সম্ভব হোলো না। মহিলার প্রতিটি কথায় যেন মনে হয় ওর মধ্যে রয়েছে একটা বিকৃত যৌন-চেতনা: দিশেহারা পতংগের মত ওর জালে জড়িয়ে পড়া খুব কঠিন নয়। স্যাঁত্‌স্যাঁতে ঘরটার মধ্যে ঝাঁকে ঝাঁকে মশার আক্রমণ এর মধ্যেই সুরু হয়েছে। নাকে কানে তাদের মুহুর্মুহু প্রবেশের চেষ্টায় অজিত সেন ছোট্ট ঘরটার মধ্যেই পায়চারী করতে বাধ্য হোল। এতো কষ্টের মাঝেও তার মনে এতোটুকু অনুতাপ আসেনি কিন্তু আজ যেন আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না। অহঃরহঃ অনুতাপে ভরে উঠ্‌ছে সারা হৃদয়। উন্মুক্ত আকাশের তলা থেকে এ রুদ্ধকারার জীবন কেন সে বেছে নিল। সাম্য

ও মৈত্রীর আজন্ম পূজারী অজিত সেন যার জ্বালাময়ী বক্তৃতায় কত লক্ষ নরনারী অস্থির হয়ে উঠেছিল একসময়; আজ তার মধ্যে এতো অত্যাচারেও একটা প্রতিবাদ ফুটে উঠ্ছে না কেন! কেন সে পুরুষত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পাচ্ছে না নিরীহ নারীত্বের সাম্‌নে। প্রগতিশীল ভাবধারার মাঝে তার জীবন আজ পরিচালিত। মনে পড়ে যায় 'গ্যটের্—'বাস্তবজগতের দিকে মুখ ফেরাও, তাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করো।' সংগে সংগে মনে হোল এখানে থাক্‌লে তা আর সম্ভব হবে না। দরজার দিকে পা বাড়াতেই দেখ্‌ল, দরজার একটু পাশে, জ্যোৎস্নার অন্ধকারে স্থির হয়ে আছে একটা ছায়ামূর্তি। দুপা পেছিয়ে আস্‌তেই ছায়ামূর্তি বলে উঠ্‌ল:

—খুব মশা কাম্‌ড়াচ্ছে তো? এই নিন্ আপনার চাদরটা শুকিয়ে গেছে। আপনারা যে কি করে দেশের কাজ করেন আমি তো বুঝতে পারি না।

এতো অন্ধকারের মাঝেও অজিত সেন স্পষ্ট দেখ্‌তে পেল মহিলার দুচোখে খেলা কর্‌ছে বিদ্রূপের হাসি।

—আপনাকে কে বলেছে আমি দেশের কাজ করি—

অজিত সেনের গম্ভীর গলায় ছোট্ট কথাটা ছোট্ট ঘরে ছট্‌ফট্ কর্‌তে লাগ্‌ল।

—সকল কথা কি আর সকলকে বলে দিতে হয়, হালচাল দেখেই ধরা পড়ে। আপনার বোধ হয় খুব রাগ হোচ্ছে কথাটা শুনে—

—রাগ করলেও আপনাকে প্রশংসা করছি, আপনি গোয়েন্দা হলে পারতেন।

—মেয়ে হয়ে না জন্মালে হয়তো তাই হতাম কিন্তু তা যখন এজন্মে সম্ভব নয় তখন আপনার প্রশংসাটা আসছে জন্মের জন্যে তোলা রইলো।

—তাহলে পরজন্মেও বিশ্বাস আছে আপনার!

—নিশ্চয়ই, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ব্যক্তিগত ব্যাপার সুতরাং এবিষয়ে আপনার কটাক্ষপাত অন্যায়। কিন্তু সে যাই হোক্, আমি আপনাকে খাওয়াতে পারবো না বলে হোটেলগুলোও কি বন্ধ হোয়ে গেছে?

—হয়তো হয়নি—

—তাহলে সেখেন থেকেও তো খেয়ে আসতে পারতেন।

—এতোক্ষণ ধরে কি আপনি আমাকে এই উপদেশ দিতে এসেছেন? আপনাকে যখন খাওয়াতে হোচ্ছে না তখন আমি খাই না খাই তার জন্যে আপনার মাথাব্যথা কেন।

—মাথাব্যথা একটু আছে বৈকি। আমার বাড়ীতে আপনি উপোস করে থাকবেন আর আমি মুখ বুঁজে থাকব? ধরুন, আপনার বাড়ীতেই যদি আমি উপোস করে থাক্‌তাম আপনি কি একটাও কথা বল্‌তেন না?

—আমার কথা ছেড়ে দিন। আপনার খুব বেশী অসুবিধে হলে বল্‌বেন আমি চলে যাবো এখেন্ থেকে। তাহলে নিশ্চয়ই আপনার কোন অসুবিধে হবে না।

—আপনার মেজাজ্‌টা বড্ড কড়া।

—আপনারটাই বা কি এমন নরম !

—আচ্ছা আমাকে আপনাদের দলে নেবেন ? আমার অনেক দিনের ইচ্ছে দেশের জন্যে একটা কিছু করে যাবো। কিন্তু কিছুতেই সুযোগ পাচ্ছিনা। যাক্‌ এ্যাদ্দিন বাদে তবু একজনকে পেলাম। সত্যি বলুন না নেবেন আমাকে ?

—আমি নিজেই দলছাড়া তাই আপনার প্রশ্নের জবাব দিতে পারলাম না বলে দুঃখিত আর তাছাড়া, দেশের জন্যে একটা কিছু কোরব বলে যাদের দম্ভ থাকে তারা কোনদিনই কিছু করে না। এটা আমার ব্যক্তিগত মত, আশাকরি মনে কিছু করবেন না।

—আপনার ব্যক্তিগত মতের ওপর আমি কিছু বলতে চাইনা, তবে একবার পরীক্ষা করেওতো দেখতে পারেন।

—সময় এবং সুযোগ এলে আশাকরি আপনাকে জানাতে ভুলবো না।

—আমার মনে হয় আপনি নিশ্চয়ই কোন মেয়েকে ভালো-বাসতেন। তারপর তাকে না পেয়ে মনের দুঃখে ভেসে বেড়াচ্ছেন এখেনে সেখেনে......

—আপনার অন্তর্দৃষ্টি যখন এতোই প্রখর তখন অনর্থক আমার সংগে কথাকয়ে সময় নষ্ট কচ্ছেন কেন, নিশ্চিন্তমনে ঘরে খিল এঁটে ঘুমোলেই তো পারেন।

মহিলা হঠাৎ হেসে উঠলেন একথা শুনে।

—আমি কিন্তু কোনদিন ঘরে খিল এঁটে শুইনা।

—তবে খিল না দিয়েই শোবেন।

—আপনি অচেনা লোক, নতুন এসেছেন আমার বাড়ীতে, আমি একলা মেয়েমানুষ, আপনাকে বিশ্বাস নাওতো করতে পারি। তাবলে যেন মনে করবেন না আপনাকে চলে যেতে বলছি।

রাগে অজিত সেনের সমস্ত শরীর জ্বালা করে ওঠে। সে একরাশ বিরক্তি নিয়ে বলে:

—তাহলে আপনার যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।

নারীকণ্ঠের হাসিতে ভরে উঠলো ছোট্ট ঘরখানা। অজিত সেনের মনে হোল ক্ষুরের চেয়েও ধার আছে ও হাসিতে। মহিলার আলোছায়ার মত ব্যবহারে সে অবসন্ন হয়ে পড়েছে। বিষাক্ত ক্ষতের মত যন্ত্রণাদায়ক মনে হোচ্ছে প্রতিটি কথা। অন্ধকারের মাঝে ওই ছায়ামূর্তিকে মনে হোচ্ছে অশরীরী প্রেতাত্মা। অভিশপ্ত জীবনের জের আজও টেনে চলেছে নব নব ছলনায়। কখনও মোহগ্রস্ত করে কখনও বা নাগিণীর মত তাড়া করে ছুটে আসে। বঙ্কিনাথদা যে কি করে এই স্ত্রী নিয়ে সুখে শান্তিতে ঘর করেন অজিত সেন বুঝে উঠতে পারেনা। আবার মনে হয়, হয়তো এই জন্যেই বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায় বেচারী মহিল আবার সুরু করলেন:

—আপনি কবি হলে এতোবড় কথাটা বলতে পারতেননা।

সন্ধে থেকে গারদ ঘরটার মধ্যে ঢুকে আছেন, বাইরে এসে দেখুন না, কেমন সুন্দর জ্যোৎস্নার আলো লুটিয়ে পড়েছে চারদিকে। আকাশে একটু ওমেঘ নেই তার ওপর এই নির্জন তেতলায় শুধু আপনি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই। বোধহয় এতোক্ষণে সারা শহরটাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কতো সুন্দর বলুনতো এই পরিবেশ। কবির কাছে এইতো স্বর্গ।

অজিত সেন সশংকিত হোয়ে ওঠে মহিলার নৈশ আবাহনে। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে ওঠে।

—আমি কবি নই।

—এক রাতের জন্যে নয় কবি হলেন তাতে দোষ কি। আমার যদি ডানা থাকত তাহলে এখুনি ভেসে যেতাম ওই নীহারিকার দেশে। আপনি বড্ড বেরসিক তাইতো বসে বসে মশার কামড় খাচ্ছেন ওই অন্ধকার ঘরে। সত্যি আসুন না একটু বাইরে, একা একা কি ভালো লাগে। প্রকৃতির এই লাবণ্যময়রূপ ধরার বুকে অবশ হয়ে ঢলে পড়েছে। ঊর্ধের ওই চিররুদ্ধ মেঘের মহল থেকে আজ ছাড়া পেযেছে ক্ষয়িষ্ণু তাই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে মিলন-সংগীতে সবাইকে ডেকে বলছে আজ আর কেউ বন্দী নয়, নিঃশেষে নিজেকে নিঃস্ব করো। অলীক ছদ্ম আবরণে অবহেলার ধূলোয় লুটিয়ে পোড়োনা। অন্ধ তমসায় যারা হৃদয়কে করে কালো, প্রেমের অমল স্নিগ্ধ আলো যারা কোনদিন জ্বালেনা, তাদের ব্যর্থজীবন

অলক্ষে রঙীন করে দেবে এই জ্যোৎস্না সায়র। চলুননা ছাদের ওপর খানিকটা বেড়িয়ে আসি।

—না।

মহিলা চমকে ওঠেন 'না' কথাটা শুনে। তবু নিজেকে সাম্‌লে নিয়ে বলেন:

—এর মধ্যে এতো বৈরাগ্য কেন?

— এর আগে এমন কতো জ্যোৎস্নালোকিত রাতকে প্রাণভরে উপভোগ করেছি; আজ আর ভালো লাগেনা।

—কেন বলুন তো?

—সেটা ঠিক আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারবোনা। আপনি কবি, আপনার কাছে এই রাত হয়ত স্বর্গ কিন্তু আমার কাছে নরক।

—নরক কেন?

—কামনার ইন্ধন জোগায় তাই—

—আপনি ফুলের মাঝে কীটকেই চিনেছেন তাই সৌন্দর্যকে কোনদিন গ্রহণ করতে পারবেন না। সৌন্দর্যকে যে আজ আপনি নরক আখ্যা দিলেন, সে শুধু সৌন্দর্যকে চিনতে পারেননি বলে। আপনি যে এতো কাজ কচ্ছেন এর পেছনে কি কোন কামনা নেই বল্‌তে পারেন?

—কামনা হয়ত আছে কিন্তু এমন একটা পরিবেশে দৈহিক দুর্বলতা আসতে খুব বেশী দেরী লাগেনা।

—আপনি বড়ো দুর্বল; সবল হবার চেষ্টা করুন।

আস্তে আস্তে সরে গেল ছায়ামূর্তি দরজার পাশ থেকে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল অজিত সেন সেই দিকে। এতোক্ষণে চারিদিক নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। ঝিল্লীর ডাক ছাড়া আর কোন শব্দই ভেসে আস্‌ছে না, হয়ত রাত্রি খুব গভীর হয়ে এসেছে। জটপাকান চিন্তার জালে অজিত সেনের অবসন্নচিত্ত ধীরে ধীরে অস্তমিত হোল ঘুমের দেশে।

শেষরাত্রে একটা অজানা আশংকায় ধড়্‌মড়্‌ করে উঠে বসল অজিত সেন ছেঁড়া পাটির ওপর। বাইরে তখন ঝড়বৃষ্টির দাপাদাপি। দম্‌কা ঝড়ের বেগে মনে হোচ্ছে পুরোণ বাড়ীটাকে যে কোন মুহূর্তে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে। ঘরের খোলা দরজাটা আছ্‌ড়ে আছ্‌ড়ে পড়ে যেন মুক্তি ভিক্ষা চাইছে প্রকৃতির কাছে। জলের ঝাপটায় ছোট্ট ঘরখানার একটুও আর শুক্‌নো নেই। গায়ের চাদরটা পর্যন্ত ভিজে সপ্‌সপ্‌ করছে। চোখ ঝল্‌সান বিদ্যুৎ চমকে ওঠার সংগে সংগে খুব নিকটেই কোথায় বাজ্‌ পড়্‌ল বিকট আওয়াজ করে। কোথায় গেল জ্যোৎস্না! অজস্র জলকণা নভোরেণুর মত নিবৃত করে দিয়েছে নিশাকরকে। সুচীভেদ্য অন্ধকারের বুক চিরে ইন্দ্রাস্ত্রের নীল আলো অজিত সেনের দুঃসাহসী মনকেও আতংকিত করে তুল্‌লো। তারপরেই বৃষ্টি নেমে এলো দ্বিগুণ জোরে। সমস্ত আকাশ বাতাস যেন আরো অশান্ত হয়ে উঠ্‌ল। এবার বেশ শীত ধরিয়ে দিয়েছে। দরজা বন্ধ

করবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই তার কানে এলো চাপা নারী-কণ্ঠের কান্নার শব্দ। যেন অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে তার কাছে। দুহাত দিয়ে ছুটো কপাটের ওপর সমস্ত শরীরের ভার রেখে স্থির হয়ে শুনতে লাগল সেই করুণ ক্রন্দন। কে যেন ইনিয়ে বিনিয়ে কেঁদে চলেছে ধোঁয়ার মত এঁকেবেঁকে। অজিত সেনের মনে হল এ নিশ্চয়ই ধরিত্রীর ক্রন্দন। অন্যায় অবিচারের ভারে আকুল হয়ে কেঁদে চলেছেন দেশজননী। দিনের আলোতে কাঁদলে পাছে কেউ টের পায় এইজন্যে সবাইকে ঘুম পাড়িয়ে কেঁদে চলেছেন কাউকে বিরক্ত না কোরে। কান্নার গতি অনেকটা দড়ির মত পাকান। হঠাৎ তার মনে হোল এ যে মানুষের কান্না! খুব কাছেই, হয়ত নাগালের মধ্যেই কে কেঁদে চলেছে অশ্রান্ত বর্ষনের মতই জমাট বেদনাকে হাল্কা করে দেবার জন্যে। কান্নার শব্দ তাকে হাতছানী দিয়ে ডেকে উঠল। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল মন্ত্রমুগ্ধের মত। মহিলার ঘরের সামনে এসে থেমে গেল পাদুটো। ভেজান দরজার ফাঁক দিয়ে ভেসে আসছে কান্নার শব্দ। মহিলাই কেঁদে চলেছেন তাহলে! অজিত সেনের সমস্ত মনটায় কে যেন নাড়া দিয়ে উঠল। বুক ঠেলে গলার কাছ বরাবর এসে আটকে গেল অব্যক্ত বেদনা। মনে হোল এ ক্রন্দন মহিলার নয়, সমস্ত নারী জাতির, সমস্ত প্রতিকারহীন অশক্তের। যুগে যুগে যারা বঞ্চিত হয়ে এসেছে সবলের কাছে, লুণ্ঠিত হয়ে এসেছে দস্যুর

কাছে, অপমানিত হয়ে এসেছে দাম্ভিকের কাছে, এ ক্রন্দন শুধু তাদেরই। আর যেন সহ্য করা যায়না। শরীরের সমস্ত কর্ম্মঠ পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে. আল্‌গা আঙুল মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আস্‌ছে। ইচ্ছে হয় এই মুহূর্তে উদ্ধার করে নিয়ে আসি ওই রুদ্ধ পাতাল-গহ্বরের বিজন-বন্দিনীকে। মহিলার ঘরের মধ্যে ঢুক্‌তে গিয়েও আস্তে আস্তে ফিরে এলো অজিত সেন নিজের ঘরে। ভিজে পাটির ওপর বসে পড়ল মাথায় হাত দিয়ে। নীরস বিপ্লবীর শক্ত বাঁধ দেওয়া জীবনের একটা দিক ধ্বসে গিয়ে হুড়্‌ হুড়্‌ করে ঢুকে পড়ল বন্যার জল। দম্‌কা হাওয়ায় ভেসে আস্‌ছে অজস্র জলকণা। কুণ্ডলী পাকিয়ে বসেও যেন শীত ভাংতে চায় না। কান্নার শব্দ এখন আগের চেয়েও ক্লান্ত হয়ে এসেছে। ঢলে পড়া চাঁদের আলো ভিজে গাছের পাতার ওপর এক একবার ঝক্‌ঝক্ করে উঠ্‌ছে। বৃষ্টির সে অবিরাম ধারা আর নেই। ছাদের কার্ণিস থেকে জল টুপিয়ে পড়ার প্রত্যেকটি শব্দ নিখুঁত ভাবে শোনা যাচ্ছে। পাখীর পালক ঝাড়ার মত বাতাসের মাতলামীতে গাছগুলোও এক একবার গাঝাড়া দিচ্ছে জলের ভার কমিয়ে দেবার জন্যে। একটা অলস ঝিমুনীর মাঝে অজিত সেন নিজের পেরিয়ে আসা পথের দিকে ফিরে চায়:

কোল্‌কাতা থেকে দেড়শো মাইল দূরে আমার জন্মভূমি নবগ্রাম। নবগ্রাম শুধু জন্মভূমি নয়, জীবনের আদর্শ প্রতিষ্ঠাতা।

পিতৃরক্ত-রঞ্জিত নবগ্রাম ভ্রমণ পথের কেন্দ্রস্থান যার প্রতিটি ধূলিকণা, আকাশ বাতাস আজও স্মরণ করিয়ে দেয় আমার সংকল্প, আমার প্রতিজ্ঞা, আমার কল্পনা। নবগ্রামকে লোকে নওগাঁ বলেই ডাকে। জায়গাটা অজ পাড়াগাঁ। ছোট্ট একটা গ্রাম অথচ ছোট্ট বেলায় মনে হোত এইটাই পৃথিবী। বেশীর ভাগ বাসিন্দাই নীচুজাতের যাদের আমরা বলি হাড়ি-মুচি-ডোম। সবশুদ্ধ মিলিয়েই হয়ত পঞ্চাশ ঘর হবে কিনা সন্দেহ। বাবাকে বিশেষ মনে পড়ে না কারণ তাঁকে জীবনে বারকয়েক মাত্র দেখেছি তাও একরকম অজ্ঞান অবস্থাতেই সুতরাং মনে না থাকাই স্বাভাবিক। মার মুখে শুনতাম তাঁর কথা। ছোট বেলায় খুব রাগ হোত বাবার ওপর মার কথা শুনে, অভিমানও কম হোতনা কিন্তু সে বয়সের রাগ অভিমান এ বয়সে গভীর শ্রদ্ধা ও অপরিসীম ভক্তিতে পরিণত হয়েছে। তিনি আমার উপাস্য দেবতার আসন দখল করে নিয়েছেন। খেলাধুলার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ না থাকলেও শিশুমন ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাক্‌তে চাইত না তাই ছুটে চলে যেতাম মাটির ঢিবির ওপর নয়ত তালপুকুরের উঁচু পাড়ে। বিশ্বরূপের বিরাটত্বে শিশুমন আপনি নত হয়ে আসত। হঠাৎ মার কথা মনে হলে আর থাকতে পারতামনা, ছুটে বাড়ী এসেই মাকে জড়িয়ে ধরতাম। মা বুকে চেপে ধরে অশান্ত মনকে শান্ত শীতল করে দিতেন। সেদিনের সেই ভীষণতা আজও

মনে আছে। সন্ধেবেলা বাড়ী ফিরে এসেই একেবারে অবাক বাড়ীর ছোট্ট উঠোনটা লোকে ভর্তি হয়ে গেছে। কিন্তু উঠোনের মাঝখানে ওটা কি। আবরণের শ্বেত বস্ত্রখানা রক্তে রাঙা হয়ে গেছে। শরীরের কোন অংশ দেখা না গেলেও বেশ বুঝেছিলাম তার তলায় একটা মানুষ চিরদিনের মত ঘুমিয়ে আছে। মানুষের এতো রক্ত সেদিনই প্রথম দেখলাম। ভয়ে আর ভাবনায় শরীরের সমস্ত রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এলো। চোখ ফেরাতেই দেখি দূর সম্পর্কের জ্যাঠামশাই হুঁকো হাতে দাওয়ার ওপর পায়চারী করে বেড়াচ্ছেন। একটা চাপা কান্নার শব্দ কানে আসতেই একছুটে দাওয়ার ওপর গিয়ে হাজির হলাম। ঘরে ঢুকেই মাকে জড়িয়ে ধরলাম প্রাণপণ শক্তিতে বোধহল মাও আমাকে পেয়ে বুকে অনেক বল পেলেন। থানা থেকে দারোগাবাবু এলেন একটু পরে।

কিন্তু আরো আশ্চর্য্য হলাম ঘরের কোণে আর একটি স্ত্রীলোককে জড়সড় হোয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। তাকে মুচিপাড়ায় অনেকবার দেখেছি বলে সে মুখ আমার অচেনা লাগলোনা। আগাগোড়া ঘটনায় স্তম্ভিত হয়ে গিস্লাম। জানবার প্রবল আগ্রহ থাকা সত্বেও মাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে সাহস হোলনা কিজানি মা যদি আরো আঘাত পান, তাই একরকম চুপ করেই পড়ে থাকলাম। ভীষণ অস্বস্তিবোধ হচ্ছিল। তারপর ধীরে ধীরে গাঢ় তমসা ধরণীর বুকে নেমে এলো। এর আগে কতো জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিকে প্রাণভরে

উপভোগ করেছি কিন্তু সে রাত্রিকে বড় ভীষণা মনে হোল। আনন্দময় দিবাবসানের পেছনেই যে এতখানি ভীষণতা অপেক্ষা করে থাকে, রবিকরোজ্জ্বল দিবাভাগ যেন তার কিছুই জানে না। বিশ্বাসই হয়না এতোখানি নিষ্ঠুরতার কথা। কালরাত্রিকবলিত মানুষ ভেবেই পায় না আবার নতুন সূর্যের আলো তার গতি পথের ওপর এই কালরাত্রির তিমির ভেদ করে জ্যোতির্ময় করে তুল্‌বে।

খড়মের খট্‌ খট্‌ শব্দ করে জ্যাঠামশাই ঘরে ঢুকে বল্‌লেন—'বৌমা আর কেঁদে কি হবে বল, যা হবার তাতো হয়ে গেছে। এখন ছেলের মুখ চেয়ে বুক বাঁধো। তার শেষ কাজটাতো করা দরকার হাজার হোক তোমার স্বামীতো তা সে যতো খারাপ কাজই করুক না কেন।' মার বুকের দ্রুত স্পন্দন কানের কাছে আজও প্রতিধ্বনিত হয়। জ্যাঠামশাই আবার বল্‌লেন,—'আহা, ভাইয়ের আমার শেষকালে অপঘাতে মর্‌তে হবে কে জান্‌তো। ওরে কে কোথায় আছিস্‌—নে বেঁধে ছেদে শ্মশানে যাবার ব্যবস্থা কর, দারোগা বাবু হুকুম দিয়েছেন।'

সেদিন যা ছিল আমার কাছে অসম্পূর্ণ আজ তা পূর্ণতা লাভ করেছে। মার মুখে কোনদিন এর প্রতিবাদ ফুটে ওঠেনি। আমার এখনও সংশয় আছে মাও কি বাবাকে ভুল বুঝেছিলেন। আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম বাবা আর নেই। তাঁর অপঘাত মৃত্যুর ইতিহাস পরে সংগ্রহ করেছিলাম। বৈষয়িক

কারণেই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল আর মৃত্যুর কারণও ছিলেন জ্যাঠামশাই।

সংসারী হলেও বাবার জীবনটা যাযাবরের মতই ছিল। নীচ-জাতীয় লোকেদের মধ্যে মিশ্‌তেন বলে তাদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল দেবতার ওপরে। এমনকি ওদের জন্যে তিনি একবারও ভাবতেন না স্ত্রীপুত্রের কথা। তিনি যে কি করে তাঁর কোমল-হৃদয় দিয়ে গ্রামের পর গ্রাম জয় করেছিলেন তা সেখেনে না গেলে বোঝা যায় না। আজ সেখেনে তাঁর নাম কর্‌লে সকলেই দুহাত কপালে ঠেকায়।

জ্যাঠামশাই ছিলেন গোঁড়া সংস্কারপন্থী। নিজের অখণ্ড প্রভাবে ভাঁটা পড়্‌তে দেখে অসচ্চরিত্রা স্ত্রীলোকের সংগে ষড়যন্ত্র করে পথের কাঁটাকে সরিয়ে দিলেন। লোকদেখান একটা মাম্‌লাও চালিয়েছিলেন তিনি। বিচারে খুনীর দশ বছর জেল হয়। তার পরিবারের যাবতীয় ভরণপোষণ তিনিই গোপনে সরবরাহ কর্‌তেন।

এই আঘাতে মার জীবনীশক্তি একেবারেই অচল হয়ে গেল। মাকে আর পূর্ণভাবে কোনদিন ফিরে পেলাম না। কয়েকমাস পরে জ্যাঠামশাই মাকে তালাচাবি বন্ধ করে রাখ্‌তে সুরু কর্‌লেন। বল্‌তেন,—'মা নাকি পাগল হয়ে গেছে।' এমন কি আমার সংগে পর্যন্ত দেখা সাক্ষাতের উপায় ছিল না। কতোদিন তাঁকে আমার নাম করে কাঁদ্‌তে শুনেছি। তখন ছিলাম কিশোর তবু ছিলনা চঞ্চলতা, ধ্যানমৌন স্থির গম্ভীর

হয়ে গিস্‌লাম সেই থেকে। বুঝেছিলাম পৃথিবীর অসারত্ব, ভংগুরতা। মার সাথে শেষ দেখা হয়নি বোধহয় জ্যাঠামশায়ের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যেই। তিনি আমাকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর কোন এক দূরসম্পর্কের আত্মীয় না বন্ধুর বাড়ী লক্ষ্ণৌ। সেখানকার জীবনটা একরকম মন্দ কাট্‌ছিল না, কিন্তু ভাগ্যবিরুদ্ধ তাই একটা মিথ্যে চুরীর সন্দেহে অভিযুক্ত হতে হল। তারপর অনন্ত পথই হোল একমাত্র পাথেয়। সরযূর জন্যে বুকের মধ্যে এখনও গুম্‌রে গুম্‌রে ওঠে একটা হতাশার তপ্তনিঃশ্বাস। ছিঃ ছিঃ যাকে ভগ্নীর স্নেহ দেওয়া উচিত তার ওপর কেন যে এখনও মন লুব্ধ দৃষ্টিতে ফিরে চায়! চাক্‌রীও মিল্‌লো না। আত্মহত্যার চেষ্টাও বিফল হোল। সারাভারত জুড়ে তখন কণ্টকে কণ্টকে মিতালীর অভিনয় সুরু হয়ে গেছে। আদর্শ খুইয়েও তখন ক্ষমতা হাতে পাওয়া চাই। অপেক্ষাকৃত ছোট দলের মধ্যেও একটা উত্তেজনার ভাব দেখা দিয়েছে। এমন সময় বিলেতের বোর্ড থেকে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন এট্‌লী,—We cannot allow a Minority to place their veto on the advance of the Mojority." অথচ সংখ্যালঘিষ্ঠদের সাহায্য করবার যথেষ্ঠ প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রকাশ কর্‌লেন আজাদ। তিনি বল্‌লেন,—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে এক বিবাহের প্রীতিভোজে সীমান্তের গভর্ণর সার কানিংহাম প্রকাশ্যে জনৈক নবাবকে লীগে যোগদান কর্‌তে বলেন এবং এই প্রদেশেরই একজন য়ুরোপীয় ডেপুটীকমিশনার ও তাঁর স্ত্রী প্রকাশ্যে লীগের

জন্যে ক্যান্‌ভাস্ করে বেড়ান।’ শোনা গেল কুখ্যাত বেন্থল সার্কুলারের লিপিকার ও গোল্‌টেবিল্ বৈঠকের চক্রী ক্লাইভ-ষ্ট্রীটের ভূতপূর্ব বস্ এবং বি, সি, এসের প্রাইজবয়, রাওল্যাণ্ডস্ নেপথ্যে সূত্রাকর্ষণ করছেন। তারপর এলো সর্বশেষ ইংগ পরিকল্পনা—খণ্ডিত ভারত। অনেকেই নাকি বলেন, অহিংসপন্থী শুক্রাচার্যই এর নিমিত্ত যদিও একথাটা একেবারেই মিথ্যে। অধ্যাপক লেমিন মৃদুহেসে বল্‌লেন, ক্রিপস্ থেকে মাউণ্টব্যাটেন পর্যন্ত ইংগনীতির একটা ধারাবাহিক কূট কৌশল ধরা পড়ে গেছে। ভাঁওতাবাজীপূর্ণ মীমাংসায় অতিষ্ঠ হোয়ে উঠলেন এমন কি সুদূর ব্রহ্মের জেঃ আউংসান্ পর্যন্ত। সাংবাদিকরা বল্‌লেন, দেশ ছাড়ার সময় একটা অংগহানি না করে তুষ্ট হবে না ইংগরা। তাই আয়ার্লণ্ডে আল্‌ষ্টারের মত ভারতে পাকিস্তানের সৃষ্টি। এ হোল ইংরেজের সনাতন ধর্ম। একে সমূলে উৎপাটন করবার যাদের ক্ষমতা নেই, তাদের অত্যাচার সহ্য করতেই হবে। বাংলা ও পাঞ্জাব উন্মাদ পাশবিকতার পরিচয় ভালো করেই পেল। তাই বাধ্য হয়েই ডিরেক্ট এ্যাক্‌শনের পক্ষপাতী ব্রুটমেজরিটির স্বৈরশাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে নিজেই নিজের গলা বাড়িয়ে দিলে হাঁড়িকাঠে। সাক্ষীগোপাল বারোজ সাহেব গোপনে মোটা খেতাব নিয়ে পাড়ি দিলেন উপসাগর থেকে মহাসাগরের বুকে। আই, এন, এর নামাবলী গায় দিয়ে বুজ্‌রুকীর দেশে একটা চমৎকার ভোজবাজী দেখিয়ে দিল সংখ্যাগরিষ্ঠরা। স্বাধীনতা না পেয়েই স্বাধীন

দেশের সংগে দূত বিনিময় হয়ে গেল। মস্কো নিতান্ত বেরসিক তাই সে ফিরিয়ে দিল মেয়ে-দূত। কোলে টেনে নিল সোনার পাহাড়ের দেশ। আটত্রিশের বর্দোলীতালুকের সভাপতির অভিভাষণ মুখ গুঁজ্‌ড়ে পড়ে গেল মস্‌নদের তলায়। ধনিকে বণিকে একটা বাহবা পড়ে গেল। সরগরম হয়ে উঠল লেক-সাক্‌সেস আর বিমান কারবারীরা।

আলীপুর থেকে ছাড়া পেয়ে পুরোণ বন্ধু সঞ্জীবের মুখে শুন্‌ল সরযূর বৈধব্য। অসম্মানের গ্লানি মন থেকে ঝেড়ে ফেলে ছুটে যেতে হোল আর একবার লক্ষ্ণৌ একটা কোমল মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে।

সহরের কাছেই তাই না সহর না পাড়াগাঁ। এই বীরবল্লভপুর। গাঁয়ের পূবদিকে বৈজ্ঞানিক যুগের অন্যতম সপ্তাশ্চর্য বাষ্পীয়-যান তার লৌহ পথের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে দেশ দেশান্তরের উদ্দেশ্যে। উত্তরে যুগ যুগান্তের সাক্ষী স্বরূপা ছোট্ট একটি নদী নিতান্ত অবলার মতই কুলু কুলু শব্দে বয়ে চলেছে সংগমের পানে। দূরে হরিৎবর্ণক্ষেত আর পল্লীর পথরেখা দিগন্তের পথে বিলীয়মান। কি শীত কি গ্রীষ্ম রাতভোর না হতেই গাঁয়ের সকলকে সজাগ হয়ে উঠতে হয় দৈনন্দিন দেনা-পাওনার তাগিদে। অনেকের মতই হারাণেরও ঘুম ভাংতে দেরী হয় তাই তাকে জোর করে না তুলে দিলে পাটগুদামের চাক্‌রীতে সময় মত হাজিরা দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব হোতনা। উনানের আঁচ্‌টা বেশ গন্‌গনে হয়ে উঠ্‌লে ভিজে চুল পিঠে ছড়িয়ে নয়নতারা ডাক্‌তে আসে দাদাকে।

—দাদা—ও দাদা—

হারাণের ঘুমের ঘোর যেন কিছুতেই কাটতে চায়না। ঘুম জড়ান গলায় বলে :

—আজ আমার ছুটি যাবনা যা।

হারাণের স্বভাব নয়নতারার অজানা নয় তাই সেও ঠেলা দেয়। বিরক্ত হয়ে ওঠে হারাণ। ভোরের আমেজ্‌টা যেন কিছুতেই কাট্‌তে চায়না তার। ধরা গলায় দু'একটা ধমকও দিয়ে দেয়। অভ্যস্ত নয়নতারা তবুও বিরক্ত হয়ে ওঠে এক-একবার। প্রাত্যহিক টানাহ্যাঁচ্‌ড়া নিতান্ত একঘেয়ে মনে হয়। এতোক্ষণে বেশ আলো ফুটে উঠেছে। স্পষ্ট হয়ে আস্‌ছে সব কিছু। ভাঙা মন্দিরটার ফোকোর থেকে

শালিকের দল চীৎকার স্থরু করে দিয়েছে। দু'একটা কাকের ডাকও শোনা যাচ্ছে এদিক ওদিক থেকে। আবার ঠেলা দেয় নয়ন-তারা।

—উঠবে তো ওঠো। রোজ রোজ এরকম ভালো লাগেনা।

একথায় হারাণ একটু নড়ে চড়ে পাশ ফিরে নেয়। নয়ন-তারাও রাগ করে বাইরে পা বাড়ায়।

—বেশ্ তো আপিস্ কামাই হোক্। সাহেবের কাছে গিয়ে তো আর আমি বকুনী খেতে যাবো না।

হারাণ পাশের বালিস্‌টাকে বেশ জোর করে আক্‌ড়ে ধরে। মুচ্‌কি হেসে নয়নতারা মনে মনে হিসাব করে দাদার বিয়েটা না দিলেই নয়। ভিজে চুলগুলো পিঠের ওপর ভালো করে ছড়িয়ে দিয়ে ফিরে আসে রান্নাঘরে পৌষের জ্যোৎস্নার মত বিমনা নয়নতারা। ফুটন্ত ভাতের ধোঁয়ায় ঝাপসা হয়ে যায় চোখ দুটো। একে একে অতীতের ঢেউগুলো ফিরে আসে বন্যার আকারে। সবইতো ছিল তার। আত্মসমর্পণ করবার মত প্রশান্তির পরিপূর্ণ উপকরণ—বাবা-মা-শ্বাশুড়ী। ছোট্টবেলায় বিয়ে দিলেন বাবা ইচ্ছে করেই। মা কতো আপত্তি না করেছিলেন কিন্তু গৌরী-দানের পুণ্যসঞ্চয়ে বাবা একেবারে দৃঢ় সংকল্প। শ্বশুরবাড়ী যাবার প্রথম দিনে কি ভয়ই না করেছিল তার। আব্‌ছা মনে পড়ে তাঁর চেহারা। একমাত্র বিধবার সম্বল ছিলেন তিনি। বিয়ের সাতদিন যেতে না যেতেই মারা

গেলেন দুরন্ত কলেরায়। তারপর একে একে জীবনের ওপর ঘনিয়ে এলো মহাকালের প্রলয়লীলা। বাবা-মা-শ্বাশুড়ী সেই বছরের মধ্যেই চলে গেলেন অনন্তধামে। বোধহয় শোকের ধাক্কা সামলাতে পারেননি কেউ। দুপক্ষের স্মৃতিস্বরূপ রয়ে গেল সে আর তার দাদা হারাণ। দাদার কথা মনে পড়লে এখনও হাসি পায়। বড্ড ছেলেমানুষ মনে হয় দাদাকে। রেগে গেলে খুব ভারিক্কী দেখায়। একদিন রাগ করে বলেছিল, 'বিয়ে আমি করতে পারি যদি তুই বিয়ে করিস্'। বিয়েটা এখনও স্বপ্নের মতই মনে হয় নয়নতারার। হঠাৎ সানাই এর মিষ্টি শব্দে চম্‌কে ওঠে ও। মনে পড়ে যায় সামনের বাড়ীর মেয়েটার আজ বিয়ে। ওদিকে চোখ পড়্‌তেই বুকের আল্‌গা কাপড়টা ঠিক করে নেয় নয়নতারা। বিয়েবাড়ীর নতুন কে একটা লোক হাঁ করে চেয়ে রয়েছে তার দিকে। মনে মনে বলে, 'ভারী অসভ্য লোকটাতো .'

কল্পনাবিলাসী চিত্ত অনেকদূর এগিয়ে চলে রাগিণীর তালে-তালে। ছিন্ন মুকুলের মত বেশ তো ছিলাম এতোদিন। সানাই আজ এতো মধুর মনে হয় কেন !

— চা করেছিস্ ?

মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে ঘরে ঢোকে হারাণ।

—এতোক্ষণে ঘুম ভাংলো ? একটু বসো, এখুনি ছেঁকে দিচ্ছি।

ক্ষিপ্র হাতে ফেন ঢেলে নিল নয়নতারা। একদৃষ্টে কি যেন

ভেবেই চলেছে হারাণ নয়নতারার নিরাভরণা হাত দুটোর দিকে চেয়ে।

—আজ বুঝি কাজে যেতে হবেনা ?

একটা হাই তুলে হারাণ না যাবার ইচ্ছেটা জানিয়ে দেয়।

—আজকে আর কাজে যেতে ভালো লাগ্ছেনা।

দুচোখে অপরিসীম স্নেহ নিয়ে তাকিয়ে থাকে নয়নতারা দাদার দিকে। বাবা বেঁচে থাক্লে আজও হয়তো পড়াশুনো করতে হোত দাদাকে। মেয়ে বলে তার নিজের ওপর অনেক সময় ধিক্কার আসে। যদি বড়ভাই হোয়ে জন্মাতুম তাহলে নিশ্চয়ই চাকৃরী করতে দিতামনা দাদাকে। পাশের বাড়ীর সানাইটা তখনও বেজে চলেছে পূরোদমে।

—একটা ভালো মেয়ে কাল দেখাতে এনেছিল কাম্নকাক।

চায়ের কাপটা এগিয়ে দিয়ে সন্তর্পণে আবার বল্লে নয়নতারা :

—চমৎকার মেয়েটি! যা মানাবে তোমার সংগে!

নিস্পৃহের মত জবাব দিল হারাণ :

—বেশ তো বিয়ে করে ফেল্।

—যাও সব সময় ঠাট্টা ভালো লাগেনা। আমি তাদের প্রায় একরকম কথা দিয়ে ফেলেছি।

—কেন কথা দিতে গেলি, জানিস্তো বিয়েতে আমার একেবারেই মত নেই।

হারাণের কথাটা বেশ রূঢ় শোনাল।

—লক্ষ্মী দাদা, অমত কোরনা। তোমার আর কি, সারাদিন আপিসে থাকো······আমি সারাদিন কি করি বলতো?

বেশ অভিমান ঝরে পড়্ল নয়নতারার কথায়।

—তোর বিয়েতে আপত্তি কেন শুনি?

মৃদু হাসি হারাণের ঠোঁটে।

—হিন্দুর ঘরের বিধবার দুবার বিয়ে হয় না।

গম্ভীর ভাবে বললে নয়নতারা।

—ও বাজে কথা আমি বিশ্বাস করি না। আত্মপ্রবঞ্চনার নাম যদি ধর্ম হয় তবে সে ধর্মেও আমার আস্থা নেই। কোই অন্য কোন সমাজে তো এমন অসংগত অনুশাসনের বালাই নেই।

উত্তেজনা প্রকাশ পায় হারাণের কথায়। চিরাচরিত নিয়মভংগের ভয়ে নয়নতারা কুণ্ঠিতা হয়ে ওঠে।

—অন্য ধর্মের কথা জানিনে, চোখের সামনে যা সকলকে করতে দেখছি তাই আমায় করতে হবে এইটুকুই জানি। সে স গ্রামই হোক্ আর শাস্তিই হোক্।

—তুই বোধহয় সমাজের ভয়েই কথাটা বল্লি?

—হয়তো তাই।

—বেশ, কারো বৈরাগ্যের মাঝে আমিও আমার ঐশ্বর্যের ডালা খুল্তে পারবোনা।

ঠাণ্ডা চাটা একটোকেই গিলে নেয় হারাণ।

—আচ্ছা দাদা বলতো, আমার বিয়ে দিলেই কি তোমার জীবনে শান্তি ফিরে আস্বে?

অনেকক্ষণ মাথা নীচু করে থাকবার পর বললে নয়নতারা।

—না না তোর কোন ওজর আপত্তি আমি আর শুন্‌বোনা। কানুকাকাকে কালই বলে দেব লক্ষ্মীগঞ্জের ছেলেটির জন্যে।

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বেরিয়ে যায় হারাণ বাজারের থলি হাতে। নয়নতারার মাথায় যেন চিন্তার পাহাড় নেমে আসে। এর আগেও কতোদিন কতোকাণ্ড হোয়ে গেছে তাদের বিয়ে নিয়ে কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়নি কিছুই। অনেক ভেবেছে সে দাদার কথা। দৈহিক অনুশাসনের প্রতিবাদ সেও আর করতে পারে না। পারিপার্শিক মিলনাহুতি দিন দি॰ প্রেরণা এনে দিচ্ছে কারণে অকারণে তারই অজ্ঞাতে। আর সকলের মত সেই বা কেন সংসার করতে পারবেনা। কীবা এমন তার অপরাধ। কেনই বা বয়ে চল্‌বে বৈচিত্রহীন ক্লান্তিকর জীবন। একটা প্রগাঢ় প্রতীক্ষায় উন্মুখ হোয়ে ওঠে সমস্ত অনুভূতি। অবাধ্য অশ্রু নেমে আসে দুই গণ্ডে।

সেদিন রাষ্ট্রের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় দিন। দিকে দিকে ভ্রাতৃহত্যার নৃশংস পৈশাচিকতা। সভ্যতার ইতিহাসে বর্বরতার কালিমা। রাজপথ হোতে অন্তঃপুর অবধি শুধুই রক্তনদীর ধারা। উন্মত্ত উল্লাসে সকলেই শুধু শোণিতের পিয়াসী। ধর্ম নেই, রাষ্ট্র নেই, নীতি নেই জ্ঞান নেই, আছে শুধু কাতর আর্তনাদ আর রক্তের চাপ। রক্তকর্দম পথে প্রান্তরে গলিত শবের ভ্রুভংগী। সশংকিত পাদক্ষেপে

প্রতিহিংসার অন্বেষণ। মানুষ আজ হিংস্র জানোয়ারে পরিণত। ধ্বংসের প্রবল বন্যায়. জীবনের গতি রুদ্ধ করাটাই আজ তার শ্রেষ্ঠ কার্য। কদর্যতা আজ হীন নয়, বর্বরতা আজ ঘৃণ্য নয়, পাশবিকতা আজ নীতিবিরোধী নয়, বরং দয়া, ক্ষমা ও অহিংসাই আজ সকলের ত্যজ্য। প্রাণের মর্যাদা সকলের উপেক্ষার বস্তু। ধ্বংসের স্বেচ্ছাচারীতায় সৃষ্টির জয়ধ্বজা আর গর্বভরে ওড়ে না। নীতিজ্ঞান বিবর্জিত মুখোসধারী সেবকের নারকীয় ঔদ্ধত্যে লক্ষ লক্ষ নরনারীর যূপকাষ্ঠে বলিদান মানুষের ইতিহাসে কোন এক প্রাগৈতি-হাসিক যুগের ক্ষমতালোভীর কথা স্মরণ করিয়ে দিল। কোথা গেল বুদ্ধ, চৈতন্য, শংকর একালের রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ। কোথা গেল ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, একালের আদর্শ, কোথা গেল সাহিত্য, শিল্প দর্শন, আধ্যাত্মিকতার উচ্চতর সোপান, তোমাদের পুণ্য পরশে হিংসার হীন অভিযান আজও কি দূরীভূত হোলনা? সংগ্রামের নামে নিরস্ত্রের রক্ত-প্রবাহ, নারীর লাঞ্ছনা, জিঘাংসার কালরাত্রি, কোন অরণ্য হোতে আবার ফিরে এলো বিংশ শতাব্দীর বুকে। মরণশীল মানুষের মাঝে মৃত্যুর এ উদ্দামলীলা মরণের ইতিহাসে এক কুটিল পরিচ্ছেদ সন্দেহ নেই।

এই ভারতের বুকেইতো একদিন সৃষ্টি হয়েছিল অশোকের ধর্মচক্র। অফুরন্ত ঐশ্বর্যের মাঝেও অনন্ত দুঃখবরণ করেছিলেন ভগবান বুদ্ধ, শুধু মানুষের হিংসা নিবৃত্তিরই কারণে। মৈত্রীর

অর্ঘ হাতে নিয়ে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন বিশ্বের সমগ্র দুঃখ মালিন্যের নিভৃততম গহ্বর অবধি। তারপর এসেছিলেন পরিব্রাজকাচার্য শংকর, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। প্রেমবিগলিত হৃদয়ে দলে দলে ছুটে এসেছিল জাতিধর্মনির্বিশেষে কোথায় সেই বিবেকানন্দের দেবপ্রকৃতি সম্পন্ন নরনারী, যারা নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত পণ কোরে অপরের উপকারে আত্মত্যাগ করেছেন। আজ যেন সবই অসুর প্রকৃতির, যারা অনিষ্টের জন্যই অনিষ্ট করে থাকে। সবই যেন দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অবিবেক, অশৌচ, নাস্তিকতা, মদমত্ততা, কাম, আশা, লোভ, অহংকার, ঐহিক সর্বস্বতার মূর্ত প্রতীক। আবালবৃদ্ধবনিতার অন্তরে শুধুই প্রতিহিংসার দাবাগ্নি। পিতার সম্মুখে পুত্রের ছিন্নশির, স্বামীর সম্মুখে স্ত্রীর ওপর পাশবিকতা, পুত্রের সম্মুখে মাতার অসম্মান, ভ্রাতার সম্মুখে ভগ্নির ধর্মান্তর, সাংসারিক জীবনকে শ্রীহীন বিপর্যয়ের চরমতম সীমায় নিক্ষেপ করেছে। কে বল্‌বে, এই সংসারই একদিন চলায়মান জগতের মুখর আনন্দ বহন করে চলেছিল। বহির্জগতের রূঢ় আবেষ্টনী থেকে ফিরে এসে পুরুষেরা পেতো নতুন অনুপ্রেরণা। নিরুদ্বেগ নিদ্রায় কেটে যেত সারাদিনের আকাংখিত মধুর রজনী সভ্যতার সুউচ্চ শিখরে পৌছে জাতির জীবনে একি নিদারুণ পরিহাস !

এক রাত্রির মধ্যে নিরীহ বীরবল্লভপুর শ্মশানে পরিণত হোল। লুণ্ঠন, হত্যা, অগ্নিকাণ্ডে, কত পুরুষের বসতি কত অল্প সময়ের মধ্যে ধংসস্তুপে এসে দাঁড়াল।

—ওঃ—কী ভয়ংকর! কী ভয়ংকর তোমার শাণিত অস্ত্র। নিষ্ঠুর তুমি, বিচার বিবেচনাহীন তুমি। তানইলে এতোগুলো সুখের নীড় ভেঙেচুরে খান্ খান্ করে দিতে তোমার একটুও বাঁধ্‌লো না। ভগবান্! ভগবান্!

দাঁতে দাঁত্‌ চেপে বিদ্রূপভরা নিস্ফল আক্রোশে ফুল্‌তে লাগ্‌ল হারাণ।

—ভগবানের বিচারের ওপর আমাদের কোন কথাই বলা উচিত নয় হারাণ। তাতে পাপ আরও বেড়ে যায়। যা হবার তাতো হয়ে গেছে। পৃথিবীর এই নিয়মইতো সত্যি বাবা। সান্ত্বনারও কিছু নেই, আফ্‌শোষেরও কিছু নেই। আজ তুই, আমি, গ্রামের সবাই, নিঃস্ব, নিপীড়িত। তবু বল্‌, ভগবান্ তুমি লীলাময়, এতেই যদি তোমার আনন্দ হয় তবে যা তোমার ইচ্ছা তাই কর·····

—না—না—না তুমি কিছু জানোনা কানুকাকা। ভগবান্ আবার কি, ওসব মনের দুর্বলতা, অন্ততঃ আমাকে ভগবানের দোহাই দিতে এসোনা। আমরাই শক্তিহীন, ক্লীব হয়ে পড়েছি তানইলে চোখের সাম্‌নে আমার ভিটেমাটি শুদ্ধা লিয়ে নয়নতারাকে ধরে নিয়ে গেল আর আমি কিছুই কর্‌তে পারলাম্‌না। ছোট বোনটির কাতর আর্তনাদ আমি এখনও শুন্‌তে পাচ্ছি। তবু তুমি বল্‌বে ভগবান! তাকে যদি আজ একবার পেতাম তাহলে দেখিয়ে দিতাম সে কতখানি শক্তি ধরে। আড়ালে থেকে কান্না শোনবার সাধ একমুহূর্তে ঘুচিয়ে দিতাম।

অঝোরে কেঁদে চলেছে হারাণ। কানুকাকা বোঝে হারাণ শোকের ঘোরে অপ্রকৃতিস্থ, নইলে এমন কথা ও মুখ দিয়ে কখনই বার করতে পার্তো না। কালকের দুঃস্বপ্নের কথা মনে হোলে রক্ত হিম হয়ে আসে। নয়নতারার মত আরো কতশত মেয়ের জীবনে যে করালছায়া কাল নেমে এসেছে তা কল্পনাতীত। সমস্ত আকাশ বাতাস যেন রক্তাক্ত কলেবরে 'রক্ষা করো' রক্ষা করো' বলে চীৎকার করে বেড়াচ্ছে। মানুষ যখনই ঘা খায় তখনই সে খাপ্পা হয়ে ওঠে ; সুখের সময়তো একবারও চিন্তা করে না ভগবানের কথা।

—ভগবানের ওপর রাগ করে কি হবে বল্, ফিরে তো আস্‌বে না কেউ। এখন ওঠ্ গাঁয়ের আর সকলের অবস্থা দেখে আস্‌বি চল্।

কোন্ প্রত্যুত্তর পাওয়া যায়না হারাণের মুখ থেকে। ফুলো ফুলো লাল চোখ দুটো শুধু স্থির হোয়ে আছে আকাশের দিকে। সমস্ত মুখখানায় প্রতিহিংসার ছাপ মাখানো। রক্তের বদলে চাই রক্ত। কানুকাকা হারাণের রুক্ষ চুলগুলোয় হাত দিয়ে খুব মিষ্টি গলায় ডাকে তবু তার কান্নার বেগ এতোটুকু কমে না। উস্কোখুস্কো মাথার চুলগুলো মুঠো মুঠো করে ছেড়্‌বার চেষ্টা করে।

—আচ্ছা কানুকাকা, কেন এমন হয় বল্‌তে পারো ? বেশ তো ছিলাম, হঠাৎ কোথা দিয়ে যে কি হোয়ে গেল কিছুই বুঝ্‌তে

দিলেনা। এমন হাসিখুশীভরা গাঁটা একরাত্রের মধ্যে শ্মশান হোয়ে গেল।

—যতো ভাব্‌না কর্‌বি ততোই কষ্ট পাবি হারাণ। হয়তো অনেক পাপ ছিল আমাদের, তার প্রায়শ্চিত্ত এই ভাবেই হোল।

—এতোবড় পৃথিবীর মধ্যে আমরাই যতো পাপ করেছি বল্‌তে চাও? এতোদিন পরে তবে এ সাজা হোল কেন। যদি পাপই করে থাকি তবে মানুষের কাজে শাসনদণ্ড নেবার অধিকার কোথা থেকে ওরা পেল। এতোপুরুষ ধরে বাস করে আস্‌ছি, দুদশটা গাঁয়ের মধ্যে কারো সংগে কারো শত্রুতা ছিলোনা আজ হঠাৎ আমরা তাদের এতবড় শত্রু হয়ে গেলাম কি করে। না না কানুকাকা ওসব পাপটাপ নয় এ শুধু কতকগুলো দস্যুর লালসা চরিতার্থ করবার জন্যে আমাদের যথাসর্বস্ব হারিয়ে পথে বস্‌তে হোল। আমরা মানুষ হোলে ওদের সাধ্য কি আমাদের চুলের ডগা ছোঁয়। আমরা ভেড়ার চেয়েও অধম, আমরা হীনবীর্য, তাই দস্যুদের এতোটুকু বাধা পর্যন্ত দিতে পারলামনা। আমাদের সোনার সংসারকে ছারখার করে অক্ষতদেহে বেরিয়ে গেল ওরা।

—মানুষই নিমিত্ত হয় হারাণ, ভগবান নিজে এসে কিছু করেন না। আমাদের স্বার্থে আজ ঘা লেগেছে বলেই আমরা ভগবানের ওপর এতোবড় অভিযোগ আন্‌ছি কিন্তু তাঁর চুলচেরা বিচারে এতোটুকু দলাদলি নেই জান্‌বি।

—ওসব তত্ব কথা আমি বিশ্বাস করি না কানুকাকা, তবে আমি

বেশ বুঝেছি আমাদের জাতের ওপর এ আঘাতটা খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এবার যদি জেগে ওঠে জাত্‌টা। কোঁচা দুলিয়ে মেয়েলী বাবুয়ানা যদি একটু কমে। মেয়েদের রক্ষা করার মত যাদের ক্ষমতা নেই তারা আবার মানুষ বলে গর্ব করে!

—এখন জাতকে গালাগাল দিয়ে তো কোন লাভ নেই হারাণ, তার চেয়ে কি করে নয়নতারার মত শত শত হতভাগিনীকে উদ্ধার করা যায় সে কথাই চিন্তা কর্।

—গালাগাল আমি কাউকে দিচ্ছিনা; চাবুক খেয়েছি তাই আর্তনাদ একটু বেরোবেই। তোমার রক্ত এখন ঠাণ্ডা তাই তুমি এমন দুর্বলের মত কথা বল্‌ছ। আমার রক্ত কিন্তু এখনও গরম, টগ্‌বগ্‌ করে ফুটছে ভেতরে। আমি এর যোগ্য প্রতিশোধ নেবই।

—হিংসার দ্বারা কোনদিন হিংসার প্রতিশোধ নেওয়া যায় না হারাণ তাতে হিংসাবৃত্তি আরো বেড়ে যায়; সারা পৃথিবীটাই হিংসার হানাহানিতে মেতে ওঠে। তোরা হোলি বাংলার যুবক, দেশের রক্ষাকর্তা, তোদের এতোখানি অধৈর্য হলে চল্‌বে কেন! আমারও কি ক্ষতি হয়নি কিন্তু তাই বলে ছট্‌ফট্‌ করে লাভ কি! যাঁর সৃষ্টি তিনিই এর বিচার কর্‌বেন।

—তোমার হয়ত সব পুড়ে ছাই হোয়ে গেছে কিন্তু চোখের সাম্‌নে বোন্‌কে তো আর ধরে নিয়ে যায়নি, তাহলে বুঝ্‌তে আমার মধ্যে কেন এতো জ্বালা। ওসব অহিংসার বুলি তোমার

মত কণ্ঠীপরা বুড়োর পক্ষেই শোভা পায়; আমাদের মত যুবকের পক্ষে ওটা ক্লীবের লক্ষণ। ওসব ভক্তিযোগের কথা পোড়া হরিসভার ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে বলোগে যাও মানাবে ভালো। তোমাদের মত কতগুকলো খোলকরতালের দলইতো আমাদের দেশটাকে ছারখার করে দিলে। খোলে চাঁটি মেরে হাত না পাকিয়ে আত্মরক্ষার জন্যে কয়েকটা যুযুৎসুর প্যাঁচ্ শিখ্তে পারোনি? অহিংসা না ছাই! যতো সব দুর্বল ফোঁটা কাটার দলের কথা। জীবনের কোন দাম নেই. যতদাম মরার পরে!

কানুকাকা এত দুঃখের মাঝেও হাসি চাপ্তে পার্লেনা, তবে সে হাসি আনন্দের নয়, করুণার।

—তুই আজ খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছিস হারাণ, তানইলে বোঝাবার চেষ্টা করতাম তোর ধারণা একেবারে ভুল। ভগবানকে ভজনা করলেই তারা অপদার্থ হোয়ে যায় না। যুগধর্মের প্রভাবে আমরা আস্তিকতাকে ভণ্ডামী মনে করি বলেই ভগবানও আমাদের ডাকে সাড়া দেননা। যাইহোক, আমি বুড়ো মানুষ, অদৃষ্টকেই বেশী করে মানি তাই হয়তো ওপারের পাথেয় সংগ্রহের দিকে নজর একটু বেশী। তোরা একালের মানুষ, সেকালের সংগে কোনদিন মতের মিল হবেনা তাই অনর্থক তর্ক না কোরে ঘরগুলো আবার বাঁধবার চেষ্টা কর্।

—এর পরেও তুমি ঘর বাঁধতে বল্‌ছ? ধন্য তোমাদের প্রেমের শক্তি! তোমাদের লীলাময়ের বিধানে কি বলে জানিনা তবে

এর পরেও যারা ঘর বাঁধতে বলে তাদের আমি কাপুরুষ ছাড়া আর কিছু বলিনা। যাদের জন্যে ঘর তাদেরই যখন টেনে নিয়ে গেল তখন ঘর বাঁধ্‌ব কাদের নিয়ে? তোমার ইচ্ছে হয় তুমি ঘর বেঁধে বসোগে যাও, আমার দ্বারা হবে না। নয়নতারাকে খুঁজে না পেলে আমার ঘর আর কোনদিনই উঠ্‌বে না।

—কিন্তু ওযে হিন্দুর মেয়ে, খোঁজ্‌ পেলেও কি আর ঘরে ফিরিয়ে আন্‌তে পার্‌বি বাবা!

কানুকাকার বুক ঠেলে একটা বিরাট দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। হারাণ একথা শুনে দাঁড়িয়ে ওঠে। তার চোখ-মুখের চেহারা দেখে কানুকাকা ভয়ে দু'পা পেছিয়ে যায়। মনেহয় ও আর স্বাভাবিক অবস্থায় নেই, উন্মাদ হয়ে গেছে। গর্জন করে উঠ্‌ল হারাণ:

—একবার কেন একশোবার ফিরিয়ে আন্‌ব তাকে। ধর্ম অত খেলো জিনীষ নয় যে, একবার হাত ধরলেই চলে গেল। লজ্জা করেনা তোমার একথা বল্‌তে। তোমাদের বিধানে যদি তার ধর্ম গিয়ে থাকে আমি তা মানিনা-মানিনা-মানিনা। এতোখানি সংকীর্ণ মন নিয়ে তোমরা আবার বিরাটের সাধনা কর, ছিঃ ছিঃ ছিঃ। আমিও তোমার কাছে বলে রাখ্‌লুম, নয়নতারাকে যদি কোনরকমে উদ্ধার কর্‌তে পারি, তাহলে তোমাদের মাঝে জায়গা না পেলেও মরুভূমির বুকে তাঁবু ফেলে বাস কোরব সেও ভালো, তবু ধর্মের দোহাই দিয়ে যারা পীড়ন করতে আসে তাদের গায়ে পড়া বন্ধুত্ব আমার সহ্য হবেনা। তোমাকে

এতোকাল শ্রদ্ধা করতাম্ কিন্তু তোমার ওই শেষ কথাটার জন্যে আর শ্রদ্ধা করতে পাচ্ছিনা।

উল্‌কার মত ছুটে বেরিয়ে গেল হারাণ। স্তম্ভিত কানুকাকার চিবুকটা কেঁপে উঠে পা ছুটো বসে গেল হারাণের পোড়া ভিটের ওপর।

অজিত সেন মাথায় হাত দিয়ে চিন্তা করতে বসে, এখনও কাটাতে হবে অন্ততঃ আরো ছুটো দিন। বদ্যিনাথদা না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে তাকে। এখানকার রহস্যপূর্ণ আবহাওয়া একমুহূর্তের জন্যও তার ভালো লাগ্‌ছেনা। বদ্যিনাথদার স্ত্রীর কড়ামেজাজে প্রথমটায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌লেও গত রাত্রের ঘটনায় তার মন সমবেদনায় ভরে উঠেছে। আকাশ-পাতাল, সম্ভব-অসম্ভব, চিন্তা করতে থাকে অজিত সেন। কি এমন বেদনা মহিলার ছোট্ট বুকখানার মধ্যে জমা হয়ে আছে যার জন্য তাঁকে সারারাত কান্নায় ভেসে যেতে হয়! প্রতিশ্রুতি না দিয়ে এলে নিশ্চয়ই সে চলে যেত এখান থেকে। এক এক সময় মনে হয় এর চেয়ে মুসাফিরখানা অথবা জেলের আত্মীয়তাও অনেক মধুর। দরজার পাশে লঘু পদশব্দে সে মাথাটাকে নীচু করে ফেল্‌লে সমবেদনার ভংগীতে।

—ও কবি মশাই, কালতো সারারাত উপবাস করেই কাটালেন, আজও কি সেই ব্যবস্থা নাকি?

গতরাত্রে অত কান্নার পরেও মহিলা যে কি করে এতো অল্প সময়ের মধ্যে নিজেকে সহজ করে ফেলেছেন অজিত সেন ভেবেই পেলো না। সকালের আচরণে এতোটুকু ধরবার উপায় নেই যে, কাল ইনি বেদনার সাগরে ডুবে ছিলেন। মহিলার জন্য খানিকটা সমবেদনা অজিত সেনের মনের মধ্যে জমা হলেও হঠাৎ সে বিরক্ত হয়ে উঠ্‌ল।

—আমার খাওয়া নাওয়ার ব্যাপারে আপনার যখন কিছু এসে

যায়না তখন সে খোঁজে তো আপনার কোন দরকার নেই। অনুগ্রহ করে একটা ঘরে থাকতে দিয়েছেন এতেই কৃতার্থ বোধ করছি।

অজিত সেন আঘাত দেওয়ার মনোভাব নিয়েই বল্লে কথাটা। মহিলার ভ্রুযুগল কুঞ্চিত লয়ে উঠ্ল প্রায় সংগে সংগে।

—এইতো কথা ফুটেছে। আমি মনে করছিলাম বোধহয় নরম মাটির ঢেলা আপনি। কিছু মনে করবেননা, আপনাকে রেগে গেলে বেশ দেখ্তে হয়।

মহিলার কথায় অজিত সেনের প্রতিবাদ কর্বার ইচ্ছে হয় না। দুহাত দিয়ে অবিন্যস্ত কেশরাশিতে কবরী রচনা করলেন মহিলা কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত পেছনের দিকে অনেকটা হেলিয়ে। অজিত সেনকে নিরুত্তর দেখে তিনি আবার বল্লেন :

—আচ্ছা, কাল রাত্রে অমন সুন্দর জ্যোৎস্নাকে আপনি নরক আখ্যা দিলেন কেন বলুন তো ?

অজিত সেন প্রায় ভুলেই গিস্‌ল কথাটা। নিতান্ত জবাব একটা দিতেই হয় তাই সে বল্লে :

—তার জবাব তো কালই দিয়েছি।

—প্রতিবাদ আজ আমি করছি আপনার কথার, যদি অবশ্য দয়া করে শোনেন আপনি।

কপট বিদ্রূপভাব খেলে গেল মহিলার চোখে।

—ব্যক্তিগত অভিমতের ওপর প্রতিবাদ চলেনা তাহলেও বলুন

আপনি, আমি যখন কালা নই তখন নিশ্চয়ই আমার কানে ঢুক্‌বে।

—দেখুন, ওভাবে কোন জিনিষের মীমাংসা হয় না, আপনি যদি উপলব্ধি করার মন নিয়ে না শোনেন তাহলে আপনাতে আর দেওয়ালে তফাৎ কোথায়।

—উপলব্ধি করার জ্ঞান সকলের সমান হয় না।

—কাল্‌কে আপনার কথার মধ্যে একটা কথা আমি বেশী করে সমর্থন করি···দৈহিক দুর্বলতার কথা। কিন্তু তার ওপরেও অনেক্‌ কিছু আছে। নেত্রসুখকর বর্ণমাধুরী আর অজানা জগতের পুষ্প-সৌরভ, বা অরূপ-রস, যাকে আমরা বলি colour ও mystic perfume তার ওপর নিখিল মানব-প্রাণের চিরন্তন আকুতি আছে আর এতে যে, গভীর ছন্দ স্পন্দিত হয় তার মাঝে হৃদয়ের ব্যাপ্তি ও গভীরতা প্রতিবিম্বিত হয় তো ? তাহলেই বুঝ্‌তে হবে, এই জগতের সবাই সৌন্দর্য পিয়াসী আর এটাই সাধারণ নিয়ম যে, যে অমৃত বা সৌন্দর্য নিজে আস্বাদন করা যায় তা অপরকে পান না করালে তৃপ্তি হয় না।

--আপনি যে বৈদান্তিক প্রেম এনে ফেল্‌লেন।

—কেন বৈদান্তিকতাই তো প্রেমিকতা আর প্রেম শুধু সুন্দরকে ঘিরেই। এই প্রেমের জিজ্ঞাসাই মানুষের চিরন্তন জিজ্ঞাসা, যে জিজ্ঞাসা মানুষ মাত্রের হৃদয়শোণিতে বাসা বেঁধে আছে, যা থেকে বেদান্তের জন্ম। সেই এক জিজ্ঞাসার বশেই মানুষ যেমন বেদান্ত রচনা করে, তেমনি কাব্যনাটক, কামকলা, মূর্তি-

প্রতিমূর্তি, স্তম্ভদেউল, সব কিছুর পেছনে ছুটে চলেছে তারই সন্ধানে। আপনি যতো বড় বীর হোন্ যতোবড় নাস্তিকই হোন্, প্রাণের এই স্পন্দনকে চেপে রাখ্‌তে পার্‌বেন না। দৈহিক মিলনের মাঝখান দিয়েও যেমন সেটা উপলব্ধি করা যায়, অন্য ভাবে অতো সহজে করা যায় না, তাই সৌন্দর্যকে নরক আখ্যা দিয়ে নিজের সংগেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

এতোক্ষণ যে মহিলাকে অজিত সেন অতি সাধারন বলে মনে করেছিল তাঁর মাঝে এতোখানি পাণ্ডিত্য দেখে তার মনে শ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে। মহিলার যুক্তি খুবই সংগত। অজিত সেনের বেশ লাগ্‌ছে আরো একটু টেনে বাড়াতে।

—কিন্তু আপনি যেটাকে সুখকর বলে বর্ণনা কর্‌ছেন সেইটাইতো মানুষের চরমতম দুঃখ। যে দুঃখ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে শত চেষ্টা ও শত পরাজয় বা এই সুখলাভের জন্যে কত কৌশল, শক্তি, ও প্রতিভার প্রাণান্ত প্রয়াশ এ সবই তো আত্মপ্রবঞ্চনা এমন কি একরকম নেশা, এটা কি অস্বীকার কর্‌তে পারেন? Be drunk, always drunk and with anything—money, women, poetry. আপনি কি বল্‌তে চান এই কি একমাত্র সত্যি, একমাত্র সুখী হবার উপায়?

মহিলার চোখে অজিত সেনের চমৎকার প্রতিবাদে খুসীর দীপ্তি ফুটে উঠ্‌ল।

—আমি তো সুখ দুঃখের কথা বলিনি, আমি বলেছি মানুষের

চিরন্তন আকুতির কথা ; জিজ্ঞাসার কথা। তবে আপনি যে যুক্তির অবতারণা করলেন ওটা সত্যিই সুখের পন্থা নয় ; দুঃখের ছদ্মবেশ মাত্র। তবুও দেখুন, সেই দুঃখলাভের জন্য মানুষের সংগ্রাম চলে আসছে আদিমকাল থেকে। কিন্তু আমি বলছি যে সৌন্দর্যের কথা বা আকুতির কথা, তার শেষে কোন দুঃখ নেই ; আছে অনন্ত পূর্ণচ্ছেদ। চিত্তের এতোটুকু মলিনতা নেই তার মাঝে। সৌন্দর্য উপসনায় সাধকের যে চরমতম বুভুক্ষা সেই পরিপূর্ণ বিশ্রাম, তারই পথের সন্ধান পাবে। Come unto me, all ye that labour and are heavy laden. and I will give you rest. থাক্‌গে, ছেড়ে দিন্ ওসব কথা। আপনি রাগ করবেননা, কাল সত্যি আমার শরীরটা ভয়ানক খারাপ ছিল। আপনি হয়ত মনে করছেন খুব ঝগড়াটে আমি কিন্তু বিশ্বাস করুন, একলা থেকে থেকে মনটা বড্ড একলাটে হোয়ে গেছে তাই অনেক সময় কড়া কথা বলে ফেলি। তাহলে এবার ভাবতো ?

মহিলার অসুখের কথায় অজিত সেনের সমস্ত রাগ বিরক্তি একমুহূর্তে জল হয়ে যায়। মহিলাকে আঘাত দেওয়ার মনোভাব নিয়ে যেসব কথা বলেছিল, সেগুলো স্মরণ করে নিজেই অনুতপ্ত হয়ে ওঠে। মুখের দিকে চকিতের জন্য তাকিয়ে তার মনে হোল কাল্‌কের কান্নার জের এখনও তাঁর মুখে লেগে রয়েছে। কারণ জিজ্ঞাসা করতে অজিত সেনের সাহস হয়না পাছে মহিলা আবার আঘাত পান এই

ভয়ে। তাঁর শেষ কথাটায় অজিত সেনের বুকে যে গুমোট্ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার আর চিহ্নমাত্র থাকে না। সহজভাবেই বল্‌লে :

—ঝগড়া আবার কখন করলাম।

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে প্রায় অজিত সেনের পাশে বসে পড়লেন মহিলা। তাঁর আঁচলের প্রান্তটুকু এসে পড়েছে অজিত সেনের কোলের ওপর। সে অস্বস্তি বোধ করে একটু সরে যাবার চেষ্টা করতেই মহিলা হঠাৎ তার ডান হাতটা ধরে ফেল্‌লেন :

—দেখি দেখি আপনার হাতের আংটিটা ....

অজিত সেনের সমস্ত শরীরে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবেশ করে ঝংকার দিয়ে উঠ্‌ল সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীতে। রোমাঞ্চিত হয়ে উঠ্‌ল প্রতিটি প্রত্যংগ। মহিলা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন আংটিটা দেখে।

—বাঃ সুন্দর মানিয়েছে তো আপনার হাতে অজিত বাবু।

চমকে উঠ্‌ল অজিত সেন মহিলার মুখে তার নিজের নাম শুনে। একটু পরেই তার মনে পড়ে গেল আংটিতে তার নাম খোদাই করা আছে। মহিলা আঁচলটা টেনে নিয়ে একটু সরে বসে ছেঁড়া পাটির দিকে লক্ষ্য করে বললেন :

—ইস্ আমার একেবারে হুঁস্ ছিলোনা আপনাকে অন্ততঃ একটা ভালো বিছানা করে দি। আপনি আমার অতিথি

অথচ কি যন্ত্রণাই যে আপনাকে দিয়েছি তার তুলনা হয় না। বসুন আমি এখুনি আস্‌ছি।

খানিকপরেই ফিরে এলেন একগাদা বিছানা নিয়ে। পরিপাটি করে শয্যা রচনা করে দিলেন। স্তম্ভিত অজিত সেনের কাছে মহিলার আর একটি নতুনরূপ ফুটে উঠ্‌ল।

—বিয়ে করেছেন নাকি অজিতবাবু ?

—না ওটার কথা মনেই পড়েনি এতোদিন।

—কেন সাধু সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছে আছে নাকি !

—ইচ্ছে না থাক্‌লেও সংসারী হবার মত মনটা এখনও স্থির হয়নি।

—একদিন বিয়ে করবেন তো নিশ্চয়, তখন আমাকে ভুলে যাবেন না তো ?

অজিত সেন বুঝে উঠ্‌তে পারলনা মহিলার একথার অর্থ। তবুও বল্‌লে :

—এমন কোন নিশ্চয়তা দিতে পারিনা। যখন বিয়ে করবার ইচ্ছে হবে তখন হয়ত পাত্রী নাও জুট্‌তে পারে।

—বাংলাদেশে বাঙালীর ছেলের পাত্রীর অভাব ! বরং পাত্রের অভাব বল্‌তে পারেন।

—তাবলে এতো সস্তা নয় যে, আমার মত চালচুলোহীন অপাত্রের হাতে কোন বাপ্‌ তার মেয়েকে সঁপে দেবে। পাত্রের অভাবের আগে একটা 'সু' বসিয়ে দিলে আপনার কথাটার সংগতি হতে পারে।

—আপনি নিজের সম্বন্ধে অতো নীচু ধারণা করেন কেন বলুনতো ? আপনার হাতে পড়া যেকোন মেয়ের পক্ষে অনেক সৌভাগ্যের দরকার। আপনি নিজেকে চালচুলোহীন অপাত্র ভাব্‌তে পারেন কিন্তু আমার মনে হয় চক্‌মিলান প্রাসাদের বনেদীবাবুরাও আপনার নখের যোগ্য নয়। যে দেশে মেয়ের বাপ্‌ গংগাযাত্রীর সংগেও মেয়ের বিয়ে দিতে পেছ্‌পাও হয়নি সে দেশে কোনদিন মেয়ের অভাব হবেনা। বাংলাদেশে বিয়ে তো আর মেয়ের সংগে হয় না, হয় দানসামগ্রী আর রূপিয়ার সংগে। মেয়েটাকে নেয় অনেকটা ফাউ নেওয়ার মত।

—আপনি অনেকদিন দেশের খবর রাখেননা তাই একথা বল্‌ছেন। একবার কোল্‌কাতায় গেলেই আপনার এধারণাটা বদ্‌লে যাবে।

—সারা বাংলাদেশটাই তো আর কোল্‌কাতা নয় !

অজিত সেন বারান্দায় বেরিয়ে এসে রেলিংয়ে ভর দিয়ে তাকিয়ে থাকে নীচের দিকে নির্লিপ্তের মত। লক্ষ্ণৌই থেকে চলে আস্‌বার পর থেকেই তার জীবনটা যেন যাযাবরের মত কেটে চলেছে। পিছনে কোমলস্পর্শ অনুভব করে চম্‌কে সরে গেল সে।

—অতো চম্‌কে উঠ্‌লেন যে .....

—কিছুনা এম্‌নি।

আবার হেসে উঠ্‌লেন মহিলা। চারদিকে রৌদ্রের তেজ

এর মধ্যেই বেশ প্রখর হোয়ে উঠেছে। কখন মহিলা আস্তে আস্তে চলে গেছেন অজিত সেন খেয়ালই করেনি।

—অজিতবাবু চা হয়ে গেছে আসুন—

চোখ ফিরিয়ে দেখ্‌ল মহিলা ডাক্‌ছেন ওপাশের ঘর থেকে বোধহয় রান্নাঘর হবে ওটা। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল সেদিকে। চা আর জলখাবার সাজিয়ে বসে আছেন তিনি।

—চা খাওয়া অভ্যেস্ আছে নিশ্চয়ই ?

অজিত সেন কথা না বলে শুধু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। ক্ষিধেয় তার খুব কষ্ট হচ্ছিল তাই বিনাবাক্যব্যয়ে বসে গেল জলযোগে। মহিলাও চায়ের পেয়ালা তুলে নিলেন ঠোঁঠের আগায়।

—আচ্ছা অজিতবাবু আপনার বাড়ী কোথায় ?

—বাড়ীতো কোথাও নেই।

—সেকি ! তবে ছিলেন কোথায় এ্যাদ্দিন ?

এবার মহিলাই বিস্মিতা হন অজিত সেনের কথায়। অজিত সেন তাঁর মনের ভাব লক্ষ্য করে বল্‌লে ঃ

ছোট্টবেলায় বাবা মা মারা যায় তারপর থেকেই পরের বাড়ীতে মানুষ, তাই বাড়ীর সংগে আর সম্বন্ধ কোথায় বলুন ?

—পরের বাড়ীতে মানুষ ! কার বাড়ীতে মানুষ হয়েছিলেন আপনি !

—সে এক মস্ত ইতিহাস। দুঃখের কথা বলে লাভ নেই বৌদি।

ছুজনেই একসংগে চম্‌কে উঠ্‌ল 'বৌদি' সম্ভাষণে কিন্তু তা ক্ষণিকের জন্য! মহিলা এঁটো কাপ আর ডিস্‌গুলো একপাশে সরিয়ে রাখ্‌তে রাখ্‌তে বল্‌লেন:

—আপনার যদি আপত্তি না থাকে আমি শুন্‌তে প্রস্তুত আছি। আমার জীবনটাও প্রায় পরের বাড়ীতেই কেটেছে কিনা তাই বুঝতে পাচ্ছেন তো কেন আমার এতো আগ্রহ?

অজিত সেন তার প্রথম জীবনের কথা আনুপূর্বিক বলে গেল মহিলার কাছে। মুগ্ধনেত্রে মহিলা শুনে গেলেন একটিও কথা না বলে। দীর্ঘ ইতিহাস বলা যখন শেষ হোল তখন মহিলার রান্না সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তিনি।

—আর দেরী নয় এবার স্নান করে আসুন। সত্যিই, আপনার কলংকশূন্য জীবনে ওই একটি ঘটনাই আপনার মনে কলংকের ছাপ এঁকে গেছে। তবে আমার অনুরোধ আপনি ওটাকে কলংক বলে মনে করবেন না।

স্নান করতে উঠে গেল অজিত সেন। সেদিন আথিতেয়তার এতোটুকু ত্রুটি হোতে দেখা গেল না। প্রতিটি কাজ নিখুঁত ভাবে করে গেলেন মহিলা। আহারের পর দুগ্ধফেননিভ শয্যায় গাঢ়নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে গেল অজিত সেন। বিকেল গড়িয়ে প্রায় সন্ধের কোলে এসে ঘুম ভাংলো মহিলার ডাকে। গায়ে ঠেলা দিয়ে ডেকে তুল্‌লেন তিনি। সাম্‌নেই ছোট্ট একটি টুলের ওপর ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা।

—উঠুন্—চা খাবেন না ?

স্তম্ভিত অজিত সেন শুধু মহিলার দুদিনের ব্যবহারে কতোখানি গরমিল তাই খুঁজতে চেষ্টা করে। চায়ের কাপটা হাতে তুলে দিলেন মহিলা। যতোটা সম্ভব কম ব্যবধান রেখে পাশে এসে বস্‌লেন তিনি। অজিত সেনের মনে হোল এবেলার প্রসাধনের পারিপাট্য যেন আগের চেয়েও অনেক বেশী।

—চা-টা কেমন হয়েছে ?

অজিত সেন প্রায় সংগে সংগে বলে ওঠে ঃ

—চমৎকার !

মহিলা হঠাৎ পাত্‌লা বেনারসীর আড়াল থেকে বার কর্‌লেন একখানা ঝক্‌ ঝকে বাঁধান খাতা।

—একটু পড়ে দেখ্‌বেন কবিতাগুলো কেমন লেখা হয়েছে ?

খাতাখানা অজিত সেনের কোলের ওপর ফেলে দিলেন তিনি এমন কি হাতটা পর্যন্ত তুলে নিলেন না।

অজিত সেন তাড়াতাড়ি চাটুকু গিলে নিয়ে খাতাখানা খুলে ফেল্‌লে মহিলার হাত থেকে রেহাই পাবার উদ্দেশ্যে কিন্তু মহিলার ব্যবধান তাতে আরো কমে এলো। কাঁধের ওপর এসে ঠেকেছে তাঁর চিবুক। গালের খানিকটা কানের সংগে লেপ্‌টে গেছে। নিঃশ্বাসটুকু এসে পড়ছে বুকের ওপর। পিঠের অনেকটা অংশে মহিলার বুকের স্পন্দন প্রতিধ্বনিত হোচ্ছে। উষ্ণস্পর্শে নিরুপায়ের মত অজিত সেন না পারে প্রতিবাদ করতে না পারে একচুল সরে যেতে। দুদিনের

ক্রমাগত ঘাত-প্রতিঘাতে সে মহিলাকে অনেকটা সহ্য করে নিয়েছে তাই এতো নিকট সান্নিধ্যেও নিজেকে অবিচলিত রাখবার চেষ্টা করে।

মরক্কো লেদারের ওপর আঁকাবাঁকা সোনালী অক্ষরে লেখা "মুকুল"। মলাট খুলে দেখা গেল লেখিকার নামও মুকুল। ঝরঝরে ভাষায় মুক্তোর মত টল্‌ টল্‌ করছে কবিতা কটি। ভরাটে গলায় প্রাণের আবেগ দিয়ে আবৃত্তি করে গেল সে প্রত্যেকটি কবিতা। সারা মুকুলেই শুধু বিরহের বেদনা রঙে রসে পুঞ্জীভূত হোয়ে উঠেছে। নিজের মধ্যে এতোখানি আবেগের পরিচয় পেয়ে নিজেই বিস্মিত হোল।

—এগুলো কি সত্যিই আপনার লেখা?

—কেন বিশ্বাস হোচ্ছে না বুঝি!

—না। এগুলো পড়ে মনে হোচ্ছে আপনি জীবনে অনেক দুঃখ, অনেক বেদনা সহ্য করেছেন তানইলে এতো প্রাণস্পর্শী ভাষায় আপনি প্রকাশ করতে পারতেন না।

মহিলা আরও বিমনা হয়ে পড়লেন একথায়। একটু পাশে সরে বস্‌লেন তিনি।

—সত্যি আপনি ঠিকই ধরেছেন আমার মনের কথা। শুনবেন আমার জীবনী?

একরাশ আগ্রহ ঝরে পড়ল তাঁর দু'চোখে।

—যদি আপনার কোন আপত্তি না থাকে……

—আপত্তির কিছু নেই। এতোদিন বলিনি শুধু শোনাবার

লোক পাইনি বলে। আমার জীবনে আপনিই প্রথম শুনতে চাইলেন আমার কথা তাই আজ আপনাকে আমার মনের সব কথাগুলো বলে হয়ত আমার এতোদিনকার গুমোট্ মনটাকে অনেকটা হাল্‌কা করে ফেল্‌তে পারবো।

—বদ্যিনাথদাও নয়!

—না। আমার জীবনে তিনি এসেছেন অনেকটা দুঃস্বপ্নের মত। হয়তো একমাত্র বদ্যিনাথবাবুর জন্যেই আমার এই পরিণতি। আমি আবার আপনার চাইতেও অভাগিনী। বাবা যখন মারা যান তখন আমার মা পাঁচ মাস অন্তঃসত্ত্বা, তাই বাবাকে দেখবার সৌভাগ্য থেকে আমি বঞ্চিতা। দূর সম্পর্কের মামার বাড়ীতে অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় আমার যৌবনের প্রথমভাগ অবধি কেটে গেছে। মনের মধ্যে অনেক আশা অনেক আকাংখা জেগে উঠ্‌তো কিন্তু মামার বাড়ীর ব্যবহারে সেগুলোর অপমৃত্যু ঘট্‌তো প্রায় সংগে সংগে। মামাতো বোনেদের সংগে আমিও পড়্‌তুম স্কুলে। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় যখন বাড়ীর মধ্যে একা আমি পাশ করলুম তখন থেকে আমার ওপর দুর্ব্যবহারের মাত্রা আরো বেড়ে গেল। মাকে দেখ্‌তাম তিনি কতোরাত্রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাদ্‌ছেন আমার পাশে শুয়ে। রাগের মাথায় মাও আমাকে ধম্‌কেছেন,—'সকলেই ফেল্‌ করল, তুই কেন মরতে পাস্ করে এলি মুখ্‌পুড়ী।' আমিও মনে মনে ভাব্‌তাম,—

'কেন ফেল্ হলাম না।' তারপর থেকেই লেখাপড়ার পাট চুক্‌লো।

বাড়ীর মধ্যে আমিই নাকি সুন্দরী। একথা অনেকেই বল্‌তেন। আমার সাম্‌নে মামাতো বোনদের দেখালে পাছে পাত্রপক্ষের অপছন্দ হয় এই জন্যে মেয়ে দেখানর সময় আমাকে পাশের বাড়ী যেতে হোত। বোনদের মধ্যে আমি সকলের বড় হলেও আমাকে বাদ দিয়ে সকলের ছোটরও বিয়ে হয়ে গেল ধূমধাম করে। মামার ছেলে ছিলনা তাই কুশ্রী মেয়েগুলোর বিয়ে হয়ে গেল বনেদী জমীদারের জোত্‌জমীর লোভে। একটা ছেলে হোতে গিয়ে মামার বড়মেয়ে মারা গেল বিয়ের কয়েক বছর পরে। সেই থেকেই বড়জামাই ঘন ঘন আসা-যাওয়া কর্‌তে লাগ্‌লো শ্বশুরবাড়ী। অন্য কেউ না বুঝ্‌লেও আমি বুঝেছিলাম মদ্যপায়ী বড়জামাইটি কেন আসে এখানে। তার চোখের দৃষ্টিতে আমি দেখ্‌তাম চরম কামনার উত্তেজনার আভাষ। যেন প্রতিমুহূর্তেই দাবী করে বস্‌বে আমাকে। সদাসর্ব্বদা এড়িয়ে চল্‌বার চেষ্টা কর্‌লেও তার বীভৎস দৃষ্টি আমাকেই খুঁজে বেড়াতো দিনরাত। বেশ মনে আছে, সেদিন শ্রাবণমাসের অমাবস্যা। অশ্রান্ত বর্ষণ সুরু হয়েছে সকাল-থেকেই। অতো বৃষ্টি মাথায় করেও সে এসে হাজির হোল শ্বশুরবাড়ী। বাড়ীর এককোণে একঘরের মত থাক্‌তাম্ আমরা। পরের অনুগ্রহের ওপর আছি বলে কোন অনুযোগ করিনি কোনদিন। সে রাত্রে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখ্‌লাম,

আমাকে ধরে নিয়ে চলেছে জনকয়েক দস্যু। হাতে মুখে শক্ত করে কাপড়ের বাঁধন। ঘুম ভেঙে গেল। চোখ চেয়ে দেখি স্বপ্ন নয়, সত্যি। তখনও হাত পা বাঁধা। একটা অন্ধকার কুঠ্‌রীর মধ্যে পড়ে আছি। ওপরের ঘুল্‌ঘুলী থেকে একটা সরু সুতোর মত রোদের আলো এসে পড়েছে ঘরের দেওয়ালে। দরজা খুলে প্রথমেই যে এলো, সে আমার অতি পরিচিত সেই বড়জামাই। পৈশাচিক অট্টহাসি করে উঠ্‌ল সে। হাত পা বাঁধা অবস্থায় আমার দিকে এগিয়ে আস্‌তে লাগ্‌লো অনেকদিন নিস্তেজ জীবনযাপনের কুৎসিত কামনা নিয়ে। ভয়ে চোখের পাতা বন্ধ কর্‌লাম। সর্বস্ব লুণ্ঠন কোরে পশুর লালসা চরিতার্থ হোল, আর আমার চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়্‌ল অজস্র অশ্রু নিরুপায়ের মত। তারপরেই বুঝ্‌লাম এটা কোন বস্তীর গুপ্ত কুঠ্‌রী। সেদিন সন্ধের আগেই আমার বাঁধন খুলে দিলে সেই নরপশু। বাঁধনের চাপে সর্বাংগে কালশিরার দাগ ফুটে উঠেছিল এতক্ষণ টের পাইনি। বাঁধন খুলতেই রক্ত চলাচল সুরু হোল আর টের পেলাম অসহ্য যন্ত্রণা। মাথা পর্যন্ত ঘুরে উঠ্‌ল তাতে। যন্ত্রণায় দুহাত দিয়ে মাথাটা টিপে ধরে বসে পড়্‌লাম মেঝের ওপর। ততোক্ষণে দরজা বন্ধ করে চলে গেছে পিশাচ।

খানিকক্ষণ পরেই আবার ফিরে এলো সংগে আরো দুজন। মদের গন্ধে ভরে উঠ্‌ল ছোট্ট কুঠ্‌রীটা। মনে মনে বুঝে নিলাম এরপর আমার পরিণতি কি হোতে পারে। ঘরের একটা

কোণে সরে গেলাম। তিনটে মাতাল তিনদিক থেকে ছুটে এলো আমাকে ধরবার জন্যে। মনে মনে শুধু ডাক্‌লাম, ভগবান উদ্ধার করো এই পিশাচদের হাত থেকে। অন্তরে যেন অসীম বল এলো। তারপর যে কি করে মুক্ত হাওয়ায় বেরিয়ে এলাম তা জানিনা। নিজের জীবন, যৌবন, রূপ, সব কিছুর ওপর তখন ঘৃণা জন্মে গেছে। যতক্ষণ না পর্যন্ত জীবনটা শেষ কর্‌তে পাচ্ছি ততক্ষণ পর্যন্ত মনে স্বস্তি হচ্ছিল না। ছুটে গিয়ে নদীতে ঝাঁপ দিলাম। মৃত্যু এসে ধীরে ধীরে গ্রাস কর্‌তে লাগ্‌লো কিন্তু তখনও বোধ হয় প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয়নি তাই আবার বেঁচে উঠ্‌লাম। বদ্যিনাথবাবুই জল থেকে টেনে তুল্‌লেন আমাকে।···তারপর থেকে কাশীতে কাটাচ্ছি ওঁরই স্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে···।

নিস্তব্ধ ঘরখানায় থম্ থম্ কর্‌তে লাগ্‌লো মহিলার ব্যথাভরা জীবনের সকরুণ ইতিহাস। অজিত সেন তাকিয়ে দেখ্‌লো মহিলার দুচোখে টল্‌টল্ কর্‌ছে দুফোঁটা অশ্রু। সমস্ত মুখখানায় একটা স্নিগ্ধ-পবিত্র-প্রলেপ। অজিত সেনের বুকের ভেতর মোচড় দিয়ে উঠ্‌ল তার জীবনের সংগে মহিলার জীবনের অনেকখানি মিল খুঁজে পেয়ে।

—আমায় ক্ষমা করুন মুকুলদেবী, আমি আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম।

মহিলা সামান্য মাত্র সহানুভূতিতে আর নিজেকে স্থির রাখ্‌তে পার্‌লেন না, ঝাঁপিয়ে পড়্‌লেন অজিত সেনের কোলের ওপর।

ব্যথিতচিত্ত অজিত সেন, এতোটুকু বাধা দিলেনা মহিলার অফুরন্ত কান্নায়। কান্নার গতিবেগে মনে হয় তিনি যেন উজাড় করে দিতে চান নিজেকে ক্রন্দনের উপচারে। ব্যর্থপ্রণয়ীর মত তীব্র দাহ নেই এতে আছে শুধু জলভরা মেঘের অবিরাম বর্ষন। নির্ণিমেষ নেত্রে অজিত সেন চেয়ে থাকে শুধু আলুলায়িত-কুন্তলার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের ভংগীমায়। ক্রন্দনও যে ছন্দহীন নয় এটা সে অনুভব করল সেদিনই। অন্ধকারে স্থির হয়ে থাকে শুধু দরদ আর দরদী। আস্তে আস্তে মহিলার চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে শান্ত করবার চেষ্টা করে অজিত সেন।

অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে মাথা তুললেন মহিলা। অন্ধকারের মধ্যে তাঁর চোখের জল তখনও চিক্ চিক্ করছে। আলো জ্বালবার জন্যে উঠে দাঁড়াল অজিত সেন। মহিলা কাতর কণ্ঠে বাধা দিয়ে উঠলেন:

—এখন জ্বালবেন না আর একটু অন্ধকারে থাকতে দিন। আমার জীবনে এমন একটা পুণ্যতিথি আর কখনও হয়তো পাবোনা। শেষটুকু এখনও বলা হয়নি, সেটুকু না বলা পর্যন্ত আমার এই অশান্ত দহন কিছুতেই শান্ত হবে না।

সুইচে হাত দিতে গিয়েও হাত টেনে নিল অজিত সেন।

—তারপর থেকে বদ্যিনাথবাবু আমাকে পিতার মত স্নেহে আগলে রেখেছেন। প্রতিশ্রুত করিয়ে নিয়েছেন যেন আমি আত্মহত্যা না করি। তার বিনিময়ে আমি শুধু একটি দাবী করেছিলাম ·····একলা থাকবার। বদ্যিনাথ বাবু সে দাবীর

এতোটুকু অবহেলা করেননি সেই থেকে। মধ্যে মধ্যে আসেন টাকা দিতে কিন্তু একঘণ্টার বেশী থাকেন না কোনদিন। আমি জানি তাঁর এ ঋণ জন্মজন্মান্তরেও শোধ করা যাবেনা তবু আমি বল্‌বো আমাকে জল থেকে তুলে না বাঁচালেই ভালো কর্‌তেন তিনি। ...দেখ্‌তে দেখ্‌তে আজ তিনবছর কেটে গেল। এর মাঝে মার মৃত্যুসংবাদও পেয়েছি বিশ্বনাথবাবুর মুখে। আজ আমি সম্পূর্ণ একা। সর্বহারার মত দাঁড়িয়ে আছি এক নির্জন প্রান্তরে। নীচেরতলার বাচ্চা ছেলেটা আসে মধ্যে মধ্যে খোঁজ নিতে দোকান বাজারের জন্যে। এছাড়া আর কারো মুখ দেখিনি এমন কি একদিনের জন্যেও নীচেরতলায় নামিনি এই তিন বছরের মধ্যে। তারপর এলেন আপনি অনেকটা দেবদূতের মত। আপনাকে দেখে প্রথমটায় আমার মন প্রতিহিংসায় নেচে উঠেছিল। আপনাকে ধ্বংসের পথে নামিয়ে দেবার জন্যে আমি চঞ্চল হয়ে উঠেছিলাম কিন্তু সত্যি বল্‌ছি আমার ভুল ভেঙে গেছে। আমি নতুন করে ফিরে পেয়েছি আগের জীবন। ...তুমি সত্যিকার জীবনদাতা। তোমাকে না পেলে নিশ্চয়ই আমি পাগল হয়ে যেতাম। তোমাকে দেখে আমার মনে নতুন করে জেগে উঠেছে বাঁচবার আশা। ওগো! বুকের দিব্যি দিয়ে বল্‌ছি এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই......

অজিত সেনের পা দুটো জড়িয়ে ধর্‌লেন মহিলা সমস্ত অংগ দিয়ে।

—ওগো—আমি সত্যিই পাপিয়সী তা'নইলে এ কলংকিনীর মনে কেন এ অসম্ভব আকাংখা জাগ্‌ল। কেন অশুচি দেহ দেবতার পায়ে নিবেদন করলাম……

অজিত সেনের সমস্ত অন্তরটা হাহাকার করে উঠ্‌ল। আচম্বিতে তারও মনে পড়ে গেল সে আর মুকুলে আজ কোন প্রভেদ নেই; একই ভেলায় ভেসে চলেছে তরংগ সংকুল সাগরের লহরী লীলায়। সরযূর সংগে কোথায় যেন অমিল রয়ে গেছে মুকুলের। বিপ্লবীর জীবন ভেঙেচুরে ছার্‌খার্‌ হয়ে গেল। ভূলুন্ঠিতার আত্মনিবেদন ব্যর্থ হোলনা। দুহাত দিয়ে বুকে টেনে নিল অজিত সেন ছিন্নলতার মত নিবেদিতা মুকুলকে।

—অতীত নিয়ে যারা পড়ে থাক্‌তে চায় আমি তাদের দলে নই; আমি বর্তমানের সমর্থক। আমারও সব ভার তোমার ওপর ছেড়ে দিলাম মুকুল। একঘেঁয়ে যাযাবরের জীবন আমারও আর ভালো লাগ্‌ছেনা। আজ তুমিও নিঃস্ব, আমিও নিঃস্ব, তাই আমাদের মিলন বোধহয় বিধির বিধানে লেখা ছিল। তুমি আমার জীবনে শতদল পদ্ম হোয়ে ফুটে ওঠো। তোমার ওই সুন্দর হাতে স্বর্ণ-প্রদীপের আলো জ্বেলে আমাদের যাত্রাপথ রাগিণীর মূর্চ্ছনায়, অনেক—অনেক দূরে এগিয়ে দাও। আমার নববসন্তে তুমিই আমার মঞ্জুরিত মুকুল। কে বলেছে তুমি কলংকিনী, তুমি অশুচি! অকপটে স্বীকার করেছ বলেই তুমি আজ নির্ম্মলা। In this world

there is nothing great but man, and in man there is nothing great but mind.

তখনও বুকের মধ্যে মাথা গুঁজে কেঁদে চলেছে মুকুল।

—কেঁদোনা মুকুল কেঁদোনা। সাম্‌নে চেয়ে দেখো, অনাগত ভ্রাজিষ্ণু ভবিষ্যৎ আমাদের হাতছানী দিয়ে ডাক্‌ছে। আমাদের সেইদিকেই এগিয়ে যেতে হবে। তুমিই হবে আমার শক্তি; আমার জীবনসাহারার মরুদ্যান।

সে রাত্রে মুকুলের প্রাণখুলে একবার কাঁদ্‌তে ইচ্ছে হোল। চোখের জল যেন কিছুতেই বাধা মান্‌তে চায়না। বাইরে তাকাতেই সব কিছু যেন সুন্দর বলে মনে হয়। তিন বছরের মধ্যে যা একঘেয়ে বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল, তাই আজ সজীব, প্রাঞ্জল। সব কিছুর মাঝেই একটা অর্থ খুঁজে পাবার সূত্রও আবিস্কৃত হোল বহুদিন পরে। তারাভরা আকাশের নীহারিকা পথে সে আজ একা নয়। নিবিড় পাতাঘেরা ছায়া শীতল শান্ত-প্রকৃতি রাজ্যে ভস্মমাখা বৈরাগ্যের ঝুলি আর তাকে বহে বেড়াতে হবেনা অজানার স্তব্ধ প্রহরে। অন্তরের মত্ত হাহারোল আর আস্‌বেনা অতীতের সরণি বহে। ধরণীর অন্ধকার মাঝে ওই যে দেখা যায় অসীম ওপরে আলোক বিকচ সুর। গৌরবের অসীম চেতনা সুমধুর বীণাকনে সুধাশ্যাম সমীর মুখর প্রান্তরে প্রান্তরে স্বপনের ভুবন রচনা করে সুদিনের আলপনা এঁকে। কানে এসে ঝংকৃত

হয় 'the darkness and light to tremble in the rhythm of thy song.

পরদিন সকালে অজিত সেনের ঘুম ভাংলো পাখীর কলরবে। তার চোখে পৃথিবীর রূপ একেবারে বদ্‌লে গেছে। বিছানার ওপর চুপ্‌ করে বসে গতরাত্রের ঘটনাকে আবার চিন্তা করে। নীরস জীবনে এতোদিন পরে আজ যেন মনে হোল যা দেখ্‌ছি সবই সুন্দর। আস্তে আস্তে উঠে গেল বারান্দায় বোধহয় চোখ দুটো মুকুলেরই খোঁজ করছিল কিন্তু সাম্‌নে কোথাও চোখে পড়লনা তাকে। হাত মুখ ধুয়ে আবার এসে দাঁড়াল সেখেনে। নীচের দিকে তাকিয়ে মনে হোল কোন কিছুই অর্থহীন নয় এ জীবনে। খানিক পরেই রান্নাঘর থেকে বেরুল মুকুল সলজ্জ কিশোরীর মত। অন্য দিনের মত মাথা তুলে সে এলোনা যেন চোখের দৃষ্টি জোর করে কে নামিয়ে দিয়েছে। পরিপূর্ণ করে মুকুলের দিকে চাইল অজিত সেন। মুকুলের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে গেল সে। প্রতিমুহূর্তে যেন নক্ষত্রবেগে তাদের মধ্যেকার ব্যবধান কমে আস্‌ছে। মুকুলের মধ্যে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না আগেকার মহিলার চিহ্নমাত্র। সে যেন সদ্যস্নাতা কচি কিশলয়। দেখে মনে হয় কম আনন্দ পায়নি ও। মুক্ত আকাশে উল্কার মত ছুটে চলেছে মুক্ত বিহংগী। অজিত সেনের ঠোঁঠের আগায় হঠাৎ এসে গেল ছোট্ট রসিকতা :
—মেয়েরাই প্রকৃতিকে লংঘন করে যায়।

ম রাঙা মধুর মুখে জবাব দেয় মুকুল :

—এরকম করাই মেয়েদের প্রকৃতি।

উপযুক্ত জবাব পেয়ে অজিত সেন আর কথাই খুঁজে পায়না। মুকুলই আবার বল্‌লে :

—চা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, খুব দেরী করলে আবার ঠাণ্ডা হয়ে যাবে।

—বেশতো এখুনি খেয়ে নিতে পারি। আজ্‌কে ঘুম ভাংতে খুব দেরী হয়ে গেছে না ?

মুকুলের বড্ড বাধোবাধো ঠেকে আজ অজিত সেনের সংগে কথা বল্‌তে। কোথায় গেল তার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ, আগুনের মত দৃষ্টি ! আজ থেকে সে যেন নতুন, পুরোণ দিনের কোন কথাই তার মনে পড়েনা। অনেক কষ্টে বলে :

—কাল্‌কে শুতে অনেক রাত্রি হয়ে গিয়েছিল তো, তার ওপর গরমটাও কাল কম ছিল……

আজ্‌কে আর চায়ের কাপ্‌টা হাতে তুলে দিতে পারলেনা মুকুল। অন্য দিন কত্তো ঝগড়াই না হোত সকাল থেকে আজ কোথায় গেল সেসব !

—সত্যি অন্যদিন কত্তো মশা থাকে, কাল একটারও চুলের টিকি পাবার যো ছিলোনা অথচ কাল্‌কেই আমার ওদের গান শোন্‌বার খুব ইচ্ছে হয়েছিল তাই রাগ করেই মশারীটা ফেলে দিস্‌লাম।

দু'ইজনে এক সংগে হেসে উঠ্‌ল একথায়। হাসির মধ্যে দিয়ে অনেকটা সংকোচ্‌ কেটে গেল।

—কাশীতে এলাম অথচ সারনাথটা দেখে যাবোনা।

কপট দীর্ঘনিঃশ্বাস ছেড়ে বল্‌লে অজিত সেন। মুকুলের মুখেও ফুটে ওঠে সলজ্জ হাসি।

—বেশতো একদিন গেলেই হোল। আমারও খুব ইচ্ছে করে দেখ্‌বার কিন্তু···

বাকীটুকু আর শেষ করতে পারে না সে। অজিত সেন একটু বেশী ব্যগ্র হয়ে পড়ে।

—আজ্‌কে গেলে কেমন হয়। সকাল সকাল খেয়ে দেয়ে গিয়ে আবার সন্ধের মধ্যে ফিরে আসা যাবে।

মুকুলেরও ইচ্ছে হয় যাবার। দীর্ঘ তিন বছরের মধ্যে একদিনের জন্যেও সে রাস্তায় পা দেয় নি। নিজেকে সমস্ত মানুষের জগৎ থেকে ছিনিয়ে এনে অন্ধকারে লুকিয়ে রেখেছে। দেবদূতের মত অজিত সেন না এলে হয়তো জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই রুদ্ধ কক্ষে কাটাতে হোত।

—তাই হবে।

মুক্তির নেশায় মুকুলের মন পাগল হোয়ে উঠেছে। চঞ্চলা বালিকার মত বেণী দুলিয়ে ছোটাছুটি করতে ইচ্ছে হয় তার কিন্তু বয়সের দিকে তাকিয়ে অনেক কষ্টে দমন করতে হয় তাকে। অজিত সেনের সংগে যেতে আজ তার কোন আপত্তি নেই। নতুন জীবনে সে নতুন করে পৃথিবীতে দাঁড়াবে বুকভরা

ভালোবাসা নিয়ে। হাসি গানে প্রস্ফুটিত রাখবে তাদের মিলন-বাসর। একমাত্র অজিত সেনের আদেশ পালন করতে পারলেই সে নিজেকে সবচেয়ে সৌভাগ্যবতী মনে করবে। অজিত সেন আকণ্ঠ পান করে মুকুলের রূপসুধা চোখের দৃষ্টি দিয়ে। সে নিজেই বিস্মিত হয় এতোখানি বিমোহনে। ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর বুকে সে ছিল এতোদিন যাযাবর। তৃণের মতই ভেসে চল্‌ছিল নিরবলম্ব সিন্ধুর বুকে। আজ সে কুল পেয়েছে, তাই নতুন করে তাঁবু ফেল্‌বার আয়োজন চল্‌ছে দিগন্ত বিস্তৃত বালুকার চরে।

—তাহলে কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি করে রান্নাখাওয়ার পাট-চুকিয়ে নিতে হবে।

— আচ্ছা।

ঝগড়ার সময় কত কথাইতো মুখে এসে জুগিয়ে থাকৃত কিন্তু এখন যেন একটি কথাও খুঁজে পাবার যো নেই অথচ কত কথাই না বল্‌তে ইচ্ছে করে।

—অতো ভালো যে কবিতা লিখ্‌তে পারে সে নিশ্চয় খুব ভালো গানও গাইতে পারে।

সহজ সচ্ছন্দ কৌতুকের মাঝে ডুবে যেতে ইচ্ছে করে অজিত সেনের। ঝগড়ার সময় আর কিছু না হোক্ একটা দীপ্তি ফুটে ওঠে মুকুলের মুখে। একথায় কামরাঙার মত লাল হয়ে গেল মুকুল। সে যেন মৌন হয়েই জানাতে চায় 'ওগো গানও গাইতে জানি।'

—অনেকদিন গাইনি তাই সাহস হয় না, তারওপর এখেনে থেকে থেকে সব ভুলে গেছি।

নতুন আবিষ্কারে অজিত সেন আনন্দিত হয়ে উঠ্‌ল।

—শ্রোতার কাছে যদি ভুলে যাওয়া গানই ভালো লাগে গায়িকার তাতে আপত্তি না হওয়াই উচিত। আস্তে আস্তে গাইলে এই সময় বেশ সুন্দর শোনা যেত।

চকিতের জন্য লজ্জারক্তিম মুখখানা তুলেই আবার নামিয়ে নিল মুকুল।

—এখেনে আমি গাইতে পারবোনা।

—তবে কোথায়…

—অন্য যে কোন জায়গায় গাইতে পারি, এখেনে বড্ড লজ্জা করবে। কোনদিন গাইনি তাই হঠাৎ গান গাইছি শুন্‌লে সবাই ছুটে এসে দরজায় ধাক্কা মার্‌বে।

—তথাস্তু! দেবীর আদেশ শিরোধার্য। তাহলে সারনাথে কিন্তু গাইতেই হবে। তথাগতের দেশ বলে কোন ক্ষমা নেই সেখেনে।

—যদি না গাই তাহলে…

মুকুলের কণ্ঠেও কৌতুকের সুর সে যেন আরো বিকশিত হয়ে উঠ্‌ছে।

—সেটার জবাব কিন্তু এতদূর থেকে বল্‌তে পারবনা; কানে কানে বল্‌তে পারি।

মুকুলের ভাবে বোঝা গেল সেও শুন্‌তে রাজী আছে। অজিত

সেন তার কানের কাছে মুখ নিয়ে গেল। গোপন কথায় দুজনেই আরক্তিম হয়ে উঠ্‌ল। মৃদু ধমকের ভাব নিয়ে কি একটা কাজের নাম করে বাইরে চলে গেল মুকুল। ওর প্রতিটি অংগ সঞ্চালনের ঢেউ এসে অজিত সেনের বুকে অংকিত হতে লাগ্‌লো। তার হৃদয় আজ বন্যার জলে প্লাবিত; কোথাও এতোটুকু শক্ত জমীর চিহ্ন মাত্র নেই। থৈ থৈ করছে অফুরন্ত জলরাশি। সামান্য সাহচর্য তবু এরই মধ্যে কত নব নব অনুপ্রেরণায় মন ভরে উঠ্‌ছে। দেশের কাজে মুকুল তার পাশে এসে দাঁড়ালে সে নিশ্চয়ই অত্যাচারীর হাত থেকে অত্যাচারীতকে রক্ষা করতে পারবে যারা শরবিদ্ধ হংসের মত যন্ত্রণায় ছট্‌ ফট্‌ করছে।

....এক্কা ছুটে চলেছে জন কোলাহল মুখরিত বারাণসীর রাজপথ ধরে। কতোদিন পরে একসংগে এতো মানুষের দেখা পেয়ে মুকুলের মনে হয় কোন্‌ আজব দেশে এসে পৌঁছেচে তারা। দীর্ঘ-তিন বছরে সে যেন অনেকটা পেছিয়ে পড়েছিল। অন্ধকার গিরিগুহা থেকে আলোকের জগতে হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে অচিন্‌দেশের রাজপুত্র। এক্কার ঝাঁকুনীতে মধ্যে মধ্যে ক্ষণিক স্পর্শে মাতাল করে দিচ্ছে সমস্ত অনুভূতি। এমন একটা সুন্দর দিনের জন্যে সে যে কতোকাল তপস্যা করেছিল তার বুঝি হিসাব করা যায় না। এতোদিন পরে বোধহয় শংকরের দয়া হয়েছে তাই তিনি পায়ে টেনে নিয়েছেন

সাধনরতা উমাকে। সহর ছাড়িয়ে পল্লীর পথ ধরে ছুটে চলেছে একা। দুপাশে মাঝে মাঝে খাপ্‌রার চালা আর ক্ষেত ছাড়া কিছুই চোখে পড়েনা। ফাঁকা মাঠের ঝির্ ঝিরে হাওয়ায় মুকুলের আঁচল উড়ে উড়ে পড়ছে অজিত সেনের মুখে চোখে। ঘোড়ার গলার ঝুম্‌ঝুমীর শব্দ আর একার ঝালর দেওয়া মোহনীয়া ব্রজপুরী যুগের রথের মত ছাউনী, গ্রন্থি বেঁধে দিল চন্দ্রাবলী আর মুকুলে।

—ওটা কি?

একটা উঁচু মাটির ঢিবির দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস্ করল মুকুল।

—ওটা একটা স্তুপ। শান্তি ও মৈত্রীর কথা সকলকে স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে বৌদ্ধযুগে এরকম অনেক স্তুপ তৈরী করা হয়েছিল।

আরো খানিকটা গিয়ে একা থেমে গেল। সারনাথ এসে গেছে। বৌদ্ধযুগের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র. পূর্বের ঈশীপত্তনবিহার সারনাথে পরিবর্তিত হয়েছে ধর্ম ও নির্বাণের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হোয়ে। আজ তার কিছু মাত্র অবশিষ্ট নেই; ধ্বংসস্তুপ নিয়ে যক্ষের মত পড়ে আছে। ডানদিকে মিউজিয়াম।

—আগে মিউজিয়াম দেখা যাক্ কেমন? বৌদ্ধযুগের অনেক কিছু নিদর্শন এর মধ্যে সংগ্রহ করা আছে।

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল মুকুল। তার সমস্ত সত্বা সে অজিত

সেনকে বিলিয়ে দিয়েছে, নিজস্ব বলে কিছুই রাখিনি তাই অনিচ্ছা জানাবার শক্তি কোথায় !

সামনেই রয়েছে স্তম্ভশীর্ষে ধর্মচক্র। তিনটি সিংহমূর্তি আজও জীবন্ত মনে হয়।

—এই হোল ধর্মচক্র। আমাদের দেশে এর দাম আজ অনেক। এর মূল নীতি হোল শান্তি ও মৈত্রী আর সবচেয়ে বড় কথা হোল অহিংস মনোভাব নিয়ে সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখতে হবে। বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের প্রধান নায়ক সম্রাট অশোক চেয়ে ছিলেন ত্রিভুবনকে সাম্যের বাঁধনে বেধে ফেলতে। দিকে দিকে তাঁর মিশনও ছুটে গিসল। সিরিয়ার রাজা অ্যান্টিয়োকস্ থীয়স্ থেকে সিরিনের রাজা মাগাস্ পর্যন্ত দূত পাঠিয়ে অহিংসার দ্বারা ধর্মবিজয়ের চেষ্টা করেছিলেন সম্রাট। দ্রাবিড়রাও বাদ যায়নি তাঁর লক্ষ্য থেকে। সুদূর ব্রহ্মদেশেও পাঠিয়ে ছিলেন শোণ আর উত্তরকে সেই সংগে মহেন্দ্র আর সংঘমিত্রা গিয়েছিল সিংহল। রজ্জুক ও ধর্মমহাপাত্রদের পক্ষ-পাতশূন্য ব্যবহারের ফলে হিন্দুকুশ থেকে মহীশূর, হিমালয় থেকে আরব সাগর এমনকি পারস্য তার পর জাভা থেকে চীন, ব্রহ্ম, তিব্বত পর্যন্ত মাথা নত করেছিল ভগবান বুদ্ধের বাণীতে। অথচ আজ আমরা তাঁরই নিদর্শন নিয়ে তাঁর নীতিকে করছি অবহেলা। অশোকের সমদৃষ্টি না থাকলে কোটি কোটি লোকের হৃদয় কখনও তিনি জয় করতে পারতেন

না। মানুষের সাথে মানুষের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের অবসান কল্পেই তিনি এই ব্রত গ্রহণ করেছিলেন।

মুগ্ধ নেত্রে মুকুল তাকিয়ে থাকে অজিত সেনের দিকে।

—আচ্ছা, মানুষের মন থেকে এই আদিম প্রবৃত্তিগুলো কি বন্ধ করে দেওয়া যায় না? দেশ সেবার নামে ক্ষমতা লোভীর মদমত্ত অভিযান কি অবরুদ্ধ করা যায় না?

অজিত সেন মুকুলের কাছে যেন এতোখানি আশা করেনি।

—নিশ্চয়ই যায়। আজ তোমার মনে যে প্রশ্ন জেগে উঠেছে এই প্রশ্ন যেদিন প্রত্যেকের মনে জেগে উঠ্‌বে সেদিন থেকেই বন্ধ হয়ে যাবে। এরকম একটা অমানুষিক অনুচ্ছেদের মাঝে ছেদ নাম্‌বেই, নবীন প্রভাতের পুণ্যপ্রভায় দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌বেই। একটুও অধৈর্য হোয়োনা মুকুল। তোমার কথাতেই বলি, ফুলের মাঝে আমরা কীটকেই চিনেছি, ফুলের সৌন্দর্যকে চিন্‌তে পারিনি। পরম সত্যের প্রতি আমাদের চিত্ত নিবদ্ধ করতে পারিনা বলেই আমরা মনে করি আমরাই সব। এই দম্ভকে চূর্ণ করতে হবে। আজ্‌কে তুমি পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত চেয়ে দেখ....দেখ্‌বে অধিকাংশ দেশেই মানুষের ভয়ে মানুষের দল প্রাণের দায়ে ছুটে পালাচ্ছে।

মিউজিয়াম থেকে বেরিয়ে এগিয়ে চল্‌ল বৌদ্ধ মঠের দিকে। বৌদ্ধ ভিক্ষুর কয়েকজন বসে আছেন সবুজ ঘাসের ওপর। শ্যামল জমি আর নীল আকাশের মাঝে গৈরিকমঠ যেন ত্যাগের

বাণীতে সমুজ্জল। দুজনেই প্রণাম করল ভগবান বুদ্ধের চরণে। প্রাচীন স্থাপত্য শিল্পের আরো নিদর্শন দেখে তারা ফিরে এলো বাসায় সন্ধের মুখোমুখী। ফেরার পথে প্রগল্‌ভ হয়ে উঠেছিলো মুকুল। একদিনের অভিযানে তাদের মধ্যেকার যত কিছু সংকোচ, যত কিছু জড়তা সব ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেল। মুকুলের হৃদয় জুড়ে দেবতার আসন দখল করে নিয়েছে অজিত সেন।

বাসায় ফেরার প্রায় সংগে সংগে বদ্যিনাথ রায় এসে হাজির হোল মলমের ভাঙা টিনের বাক্‌স হাতে ঝুলিয়ে। ছেঁড়া ক্যাম্‌বিসের জুতো, ময়লা কাঁধফাটা পাঞ্জাবী, হাঁটুর ওপর মোটা লালপাড় কাপড়, তারওপর খোঁচা খোঁচা একগাল কাঁচাপাকা দাড়ি, একটা ছন্নছাড়া নিষ্প্রাণের মত দেখাচ্ছে ওকে। ফ্যাকাসে শীর্ণ চেহারা আরও শুক্‌নো দেখাচ্ছে, বোধহয় তিনি চার দিন স্নানাহার ঠিকমত হয়নি।

—কোইগো কোথায় গেলে গো

রান্না ঘর থেকে ছুটে এলো মুকুল। সে আর হাসি চাপ্‌তে পারে না। আঁচলটা মুখে দিয়ে নকল কাসির মাঝে হাসি চাপতে চেষ্টা করে। বদ্যিনাথ রায়ের গলা শুনে অজিত সেনও বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। তারও মুখে পাত্‌লা হাসি। অবাক হয়ে চেয়ে থাকে বদ্যিনাথ রায় মুকুলের মুখের দিকে। এতো প্রাণবন্ত এতো সজীব হোল কি করে। তবুও সে অজিত সেনের সাম্‌নে প্রকাশ করে দিতে চায় না তাদের সত্যিকার সম্বন্ধের রহস্য।

—এই যে অজিত, কোন অসুবিধে হোচ্ছে না তো ভাই

—আজ্ঞে না। তবে ওঁর যা কড়ামেজাজ, দুদণ্ড কথা কয় কার সাধ্যি। ভাগ্যিস্ আপনি আজ এলেন। তা নইলে দুদিন ধরে কথা না কয়ে কয়ে পেট ফুলে মরে যাবার দাখিল হয়েছিল আর কি।

—কিগো শুনতে পাচ্ছো তো কি বল্‌ছে ভায়া আমার ?

মুকুলের যেন লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে। মুখ ঢেকে সে প্রায় দৌড়ে চলে গেল তার ঘরে। বোকার মত বার কয়েক নির্বিকার অজিত সেন আর মুকুলের চলে যাওয়া পথের দিকে চাইলে বদ্যিনাথ। তার কাছে যেন সব ঘুলিয়ে গেছে। তবুও স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বলে উঠ্‌ল :

—হ্যাঁ কি বল্‌ছিলে, কড়া মেজাজ ! তা—একটু আছে ওর। তবে যত্ন আত্যির দিকে কিন্তু কোন ত্রুটি হোতে দেবে না। সত্যি এমন একটা লক্ষ্মী মেয়ে পাওয়া অনেক ভাগ্যের দরকার কি বল অজিত ?

আপনভোলা দেশ সেবকের কথা অজিত সেন মনে মনে সমর্থন করলেও মুখে বললে :

—আমি তো বলি উনি একটি আস্ত কুঁদুলে-সরস্বতী। তবে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কড়া নজর এটা—একশোবার স্বীকার করি কিন্তু কথায় এঁটে ওঠা কঠিন।

বদ্যিনাথ রায় পলে পলে সংকিত হোয়ে ওঠে, এই বোধহয় অজিত সেন ধরে ফেল্‌লে তাদের সত্যিকার সম্বন্ধটা।

—তা মেয়েদের কাছে কথায় হেরে যাওয়া ভালো, তাতে আনন্দ পাওয়া যায়। কি জানো অজিত, ওর জীবনটা অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে সেই জন্যে ও একটু বেশী অভিমানী।

একটা হাত পাখা নিয়ে হাওয়া করতে এলো মুকুল। গায়ের থেকে জামাটা খুলে বারান্দার রেলিংয়ে ঝুলিয়ে রাখ্‌ল বদ্যিনাথ রায়। কোঁচার খুঁট্ দিয়ে মুছে নিল কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখের দৃষ্টিতে ধরা পড়ার ভয়ে পেছনে গিয়ে বাতাস দিতে লাগ্‌ল মুকুল। অজিত সেনের কাছে অপদস্থ হওয়ার ভয়ে বদ্যিনাথ রায় অন্য পাঁচরকম কথা পাড়বার চেষ্টা করলেও অজিত সেন ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সেই কথাই এনে ফেলে। এদের রহস্যপূর্ণ হাসির মাঝখানে আর নিজেকে চেপে রাখতে পারে না বদ্যিনাথ রায়। সেও একগাল হেসে ওঠে।

—ব্যাপার কি বলতো অজিত, আমি যেন ধরা পড়ে গেছি মনে হোচ্ছে।

—আজ্ঞে হ্যাঁ আপনি ঠিকই ধরেছেন দাদা।

হো হো কোরে প্রাণখোলা হাসিতে ভেঙে পড়্‌ল সবাই। এর মাঝেই দুবার দৃষ্টি বিনিময় হোয়ে গেল অজিত মুকুলে। অজিত সেন দেখ্‌ল মুকুলের নীরব চোখে শাসনের ইংগিত।

—আমি তাই বাড়ীতে ঢুকে পর্যন্ত অবাক হয়ে ভাব্‌ছি তোমরা এতো হাস্‌ছ কেন। আমি মনে করলুম আমার যা চেহারা হয়ত তাই দেখে হেসে উঠ্‌ছ তাই তাড়াতাড়ি কপালের ঘামটাম মুছে কাপড় চোপড় ঠিক করছি কিন্তু পরে বুঝ্‌লাম তাতো নয়

অন্য কিছু ব্যাপার আছে, তারপর মার মুখে আনন্দময়ীর ভাব দেখে আমার সন্দেহ বদ্ধমূল হোল। যাই হোক্ মুকুল! এদিকে এসো তো মা ···

বদ্যিনাথের গলায় আদেশের সুর। মুকুলও লক্ষ্মী মেয়ের মত সাম্‌নে এসে দাঁড়াল। পরিস্কার বারান্দার ওপরেই বসে পড়্‌ল বদ্যিনাথ রায়। সাম্‌নে বস্‌ল মুকুল আর অজিত সেন। মিথ্যে ভয়ের ভান করে জিজ্ঞেস্ কর্‌ল সে :

—আপনি কি এবার কৈফিয়ৎ তলব করবেন নাকি দাদা!

কপট রোষের সংগে বল্‌লে বদ্যিনাথ :

—নিশ্চয়ই। মার আমার এমন প্রতিমার মত মুখ কখনও দেখিনি। মাকে আজ এম্‌নি দেখে আমার বুকের মধ্যে যে কিরকম আনন্দ হোচ্ছে তা আমিই জানি। ইচ্ছে করছে প্রাণ খুলে নাচি কিংবা যাহয় একটা কিছু করি। আমি তিন বছরে যা পারিনি অজিত, তুমি তিন দিনে তাই পেরেছ। তোমায় বিশ্বাস করে পাঠালাম আর তুমি কিনা মার মনটাকে জয় করে নিলে। আমিও তোমাকে পাঠিয়ে অবধি মনে মনে হাস্‌ছিলাম যে, এবার নিশ্চয়ই মার তপস্যা সিদ্ধ হবে। যাক্ ভগবান আমার মুখ রক্ষা করেছেন। কিন্তু এতো গেল পরের কথা, এখন তোমাদের শুধু কৈফিয়ৎ নয় তুমি যে আমার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ তার বিচার হবে আর বিচারে যা শাস্তি হবে তা মাথা পেতে নিতে হবে কেমন রাজী ?

মৌনতাই সম্মতির লক্ষণ। কারোই চোখ তুলে চাইবার ক্ষমতা নেই। বদ্রিনাথই বল্‌লে :

—বেশ তাহলে বোঝা যাচ্ছে তোমরা রাজী আছ। আজকের মামলায় প্রথম আসামী অজিত সেন। তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তুমি একটি ফুলের মত সুন্দর বালিকার মন অপহরণ করেছ অতএব তোমাকে চোরের পর্যায়ে ফেলা গেল। আর দ্বিতীয় আসামী মুকুলের বিরুদ্ধে অভিযোগও খুব গুরুতর, তুমিও আমার সংগে বিশ্বাসঘাতকতা করেছ অতএব ঘরোয়া আইনের যে কোন একটা ধারা বা উপধারায় তোমরা দুজনেই অভিযুক্ত। এখন এবিষয়ে তোমাদের কিছু বলবার থাক্‌লে বল্‌তে পারো।

মধুর কণ্ঠে মুকুল বলে উঠ্‌ল :

—কিন্তু সাক্ষী তো কেউ নেই।

—তাইতো! দেখেছ অজিত, মা আমার এক খোঁচায় এতো বড় একটা মাম্‌লাকে ফাঁসিয়ে দেবার চেষ্টা করছে। এখেনে সাক্ষী নেই বটে তাহলেও সত্যের কাছে আশাকরি তোমরা মিথ্যে কথা বল্‌বে না আর তার ওপরেই নির্ভর করছে এই মাম্‌লার রায়।

এবার অজিত বল্‌লে :

—এর মাঝে আমি আর একটা দোষ স্বীকার করছি মানে আজ্‌কে আবার ওকে সারনাথে নিয়ে গিস্‌লাম।

কথাটা বলেই তাকাল মুকুলের দিকে। এবার কিন্তু বদ্রিনাথ রায়ের চোখে ধরা পড়ে গেল তারা। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বদ্রিনাথ রায়ের বুঝতে দেরী হোল না সে দৃষ্টির অর্থ।

—তোমার স্বীকারোক্তির জন্য ধন্যবাদ কিন্তু আমার এখেনে মনে হোচ্ছে মুকুল নির্দোষ অর্থাৎ ওর কোন দোষ নেই শুধু একনম্বর আসামীর প্ররোচনায় দরজা খুলে দিয়েছে অতএব মুকুলকে সর্তাধীনে মুক্তি দেওয়া গেল। কিন্তু প্রথম আসামীর দোষ সম্পূর্ণ আর তার শাস্তি স্বরূপ মার আজ্ঞাধীন হয়ে থাকতে হবে সারাজীবন। কোন আপীল গ্রাহ্য হবে না। তাহলে মা এবার এই বাউণ্ডুলে ছেলের জন্যে যাহয় একটু কিছু খাবার বন্দোবস্ত কর। হ্যাঁ শোন অজিত, এবার কাজের কথা হোক্। শুনেছ বোধহয় দেশের খবর মানে রায়টের ব্যাপার?

হঠাৎ যেন পট পরিবর্তন হোল। মুকুল তখন চলে গেছে।

—হ্যাঁ কিছু কিছু শুনেছি। ভেদনীতি তো ওদের মজ্জাগত স্বভাব দাদা।

—তা তো গেল, কিন্তু আমাদের তো আর বসে থাকা চলে না। লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুর কাতর আর্তনাদে আমাদের সাড়া দিতেই হবে।

—আমায় কি করতে হবে বলুন?

—তুমি কাল সকালেই বেড়িয়ে পড়। কোলকাতায় ভালো করে অর্গানাইজ করগে যাও, তবে তার আগে একবার আসামের বর্ডার ঘুরে যেও। আমি এবার পাঞ্জাবের দিকে যাবো। সংগে মুকুলকেও নিয়ে যাবো ভাব্ছি। আর যত শীঘ্র সম্ভব কোল্কাতায় একটা সম্মেলনের ব্যবস্থা কর। সেখেনেই আমাদের দেখা হবে।

বিদায়ের বাঁশী বেজে উঠ্লো। মুকুলকে ছেড়ে যেতে মন চায়

না তবু দেশের ডাকে বেরিয়ে পড়তেই হোল। দুরন্ত বৃষ্টির সংগে সংগে মুকুলের স্মৃতি আরো অধীর করে তুল্‌লো অজিত সেনকে।

ধূসর গোধূলী ধীরে ধীরে নেমে এলো গোলার্ধে। প্রাণবন্ত হয়ে উঠ্‌ল সহর, ঘুমিয়ে পড়ল পাড়াগাঁ। দমকা ঝড়ে বেশ খানিকের জন্যে অন্ধ করে দিলে ত্রিবর্ণার চোখ দুটো। ধাক্কা খেতে খেতেও সাম্‌লে নিলে সদ্য ম্যাট্রিক পাশ করা একটি কিশোর ম্যাটিনীশো ফের্‌তা। মোড়ের মাথায় এসেও বেশ কর্‌কর্‌ করতে লাগ্‌লো ত্রিবর্ণার দ্বিলোচন। হাই দিল আঁচলের পুটলী পাকিয়ে। হোঁচট খেল ফুটপাতের ফাঁপা ঢিবিটায়। অকেজো হল বাঁপায়ের পুরোণ স্যাণ্ডেল। অভিশাপ পেলো করপোরেশন আর তার সাথে হতভাগ্য মুচি এমন কি কলেজ ষ্ট্রীটের দোকানদার পর্যন্ত। পায়ের জুতো হাতে উঠ্‌লো চারদিক চেয়ে চিন্তে। মাথাঘোরা দেহ সৌন্দর্য নিয়ে তিনটে মেয়ে চলে গেলো প্রায় গায়ের পাশ দিয়ে। একটা ল্যাংটো বাচ্চা ভিখিরীর উৎকট কাতর প্রার্থনায় বিরক্ত হয়ে এগিয়ে গেল সে সিম্‌লের বাসার দিকে। ডাষ্ট-বিনের পচা গন্ধে নাকে রুমাল চাপা দিতে গিয়ে রুমালটাই খুঁজে পেল না বোধহয় কোথাও পড়ে গিয়ে থাকবে।

—আজ যে বড় সকাল সকাল ফেরা হোল, ব্যাপার কি! দুষ্টুমীভরা হাসি হেসে জিজ্ঞেস কোরল ফ্লোরা আড়মোড়া ভাংতে ভাংতে। খেয়ালই কোরলনা ত্রিবর্ণা, ফ্লোরার কথা। ছুঁড়ে ফেলে দিল হাতের ভ্যানিটি, গায়ের ব্লাউজ আর বোম্বায়ের ছাপা সাড়ী। সায়া আর গামছা গায়েই বেরিয়ে

গেল গা ধুতে। দেওয়ালের পূর্ণগর্ভা টিকটিকিটা থপ্ করে পড়ে গেল শক্ত মেঝের ওপর। চমকে উঠল ফ্লোরা আর তার পাশের নার্গিস। দড়াম করে বন্ধ হল বাথরুমের দরজা। কলের জলের আওয়াজ আর পাশের বাড়ীর কলের গানে অদ্ভুত আমেজ এনে দিল ফ্লোরার মনে। একদৃষ্টে চেয়ে আছে সে মাকড়সার জালের দিকে···নতুন শিকার পড়েছে। বারেকের জন্য দুলে উঠল ফ্লোরার তীব্র অনুভূতি। বের করল চিঠিখানা সুদূর সুয়েজ থেকে এসেছে আজকের এয়ার মেলে। তেরোবার পড়ে নিয়েছে চিঠিখানা এর আগে তবুও নতুন লাগে আবার পড়তে। সেন্টেড্ নয়, আরক্তিম হয়ে যাবার মত সম্ভাষণ নেই, না আছে কবিত্বের এতটুকু ছোঁয়াচ চিঠিখানার মধ্যে, তবুও অপূর্ব আস্বাদ, অনুপম সুরভী, চাঞ্চল্যকর রোমাঞ্চ। অথচ মামুলী কয়েক ছত্র লেখা—

"যুগকে যদি বিশ্বাস না কর—আমায় কোরো। প্রতিমা গড়ার আগে বিসর্জ্জনের চিন্তা কোরনা। পনেরই আগষ্ট মহানাদ পৌছুব পারোতো এসো।"

ক্যালেণ্ডার দেখে নিল আর একদিন পরে পনেরই। ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে দিল চিঠিখানা বাথরুমের দরজা খোলার আওয়াজ পেয়ে। ফিরে এলো ত্রিবর্ণা ভিজে গামছায় দুরন্ত দেহ ঢাকবার ব্যর্থ চেষ্টা নিয়ে। হয়ত ঘরে ওরা তিনটি মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই জেনেই ওর এতোখানি সাহস। হাত দুটো মাথার তলায় দিয়ে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে ফ্লোরা ত্রিবর্ণার

দিকে। খোলা পিঠটার প্রায় সবটাই ঢেকে দিয়েছে ওর ঘনকৃষ্ণ কেশদাম। গামছা দিয়ে চুলের জল ঝাড়বার সাথে সাথে চমকে উঠছে ওর ভরাটে বুকের দুটি শীর্ষ। সুকোমল শুভ্রতার মাঝে দুটি কৃষ্ণ বিন্দু যেন জীবন্ত বলে মনে হয়। কে বলবে এই সেই বীরবল্লভপুরের নয়নতারা!

—হাঁ করে চেয়ে কি ভাবছিস্ অতো?

গামছা নিংড়ে জিজ্ঞেস্ করল ত্রিবর্ণা। আচমকা ফ্লোরার অজান্তে বেরিয়ে এলো।

—একটা চিঠির কথা।

বলার সংগে সংগেই চমকে উঠল্ সে। যার কাছে সে চিঠির কথাটা লুকোতে চায় তার সাম্‌নে বলে ফেল্‌লে কথাটা?

—কার চিঠিরে ফ্লোরা?

—কোই কার চিঠি · ··

অপ্রস্তুতের মত জবাব দিল ফ্লোরা। ভয়ে আর ভাবনায় তার সারা স্নায়ুতন্ত্রে একটা শিহরণ খেলে গেল।

—আমার চোখ এড়াতে পারবিনে, দেখি চিঠিখানা···

আয়নার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে ফ্লোরার প্রতিবিম্বের দিকে লক্ষ্য করে মুরুব্বিচালে বললে ত্রিবর্ণা। ফ্লোরার বলবার ভংগীতে ত্রিবর্ণার মধ্যে কেমন এক প্রকার সন্দেহের প্রতিক্রিয়া স্মুরু হয়েছে; ফ্লোরা কথাটার মোড় ঘোরাবার জন্যে মিথ্যার আশ্রয় নেয়।

—চিঠি আবার কোথায় দেখ্‌লি, একটা চিঠির কথা বল্‌লাম বলে কি মনে কচ্ছিস্ কারো চিঠি আমি পেয়েছি? একটা

একজনকে লিখব কিনা এই কথাই ভাবছিলাম।

প্রায় সংগে সংগে বুকে হাত দিয়ে অনুভব করে নেয় ফ্লোরা সত্যি সত্যি চিঠিখানা আছে কিনা। ত্রিবর্ণা যে মেয়ে, এখুনি ছিনিয়ে নিলেও নিতে পারে। চোখে মুখে একটা নির্লিপ্তের মত ভাব আন্‌বার চেষ্টা করে সে। এর আগে তাদের কত গোপনীয় চিঠি দুজনকে দেখিয়েছে কিন্তু আজকের এই চিঠিখানা কাউকেই দেখান চলে না। চরমলাভের নির্দেশ যেন এর মধ্যে দেওয়া আছে। তাই চিঠিখানা প্রাণের চেয়েও প্রিয়তম মনে হয় তার আছে।

বেশবিন্যাস প্রায় শেষ করে এনেছে ত্রিবর্ণা। সাদা ব্লাউজের ওপর আকাশরঙা সাড়ীখানায় চমৎকার মানিয়েছে ওকে। এলানো খোঁপার পাশে কাণের রিং দুটো চিক্ চিক্ করছে। সারাদিনের কর্ম-ক্লান্তির পর বড্ড আরাম লাগে ত্রিবর্ণার এই অল্প পরিশর সন্ধার রহস্য কুহেলী।

—রাহাজানি না করলে তোদের মত মেয়ের কাছ থেকে সত্যিই কিছু পাওয়া কঠিন।

আচম্‌কা চেপে ধরে ফ্লোরার বুকের বোতাম। একদম প্রস্তুত ছিলো না ফ্লোরা ত্রিবর্ণার এই অতর্কিত আক্রমণের জন্যে। ঝটাপটিতে জামাটাই সরে গেল বুক থেকে। সুয়েজের চিঠি উঠ্‌ল ত্রিবর্ণার মুঠোয়।

—সত্যিই গোপনীয় চিঠি···

কাতর চোখে অনুনয় করে ফ্লোরা। ত্রিবর্ণার নখের খোঁচায় একটু ছড়ে গেছে বুকের নরম জায়গাটায়। এতক্ষণে বেশ জ্বালা

ধরিয়ে দিয়েছে। ছিঁড়ে যাওয়া ব্লাউজটা খুলে ফেলে দেয় সাম্‌নের আল্‌নায় অনেকটা ত্রিবর্ণার ওপর রাগ কোরে।

—রাগটা কার ওপর করা হোচ্ছে শুনি, আমার ওপর নিশ্চয়ই নয়!

ভ্রুদুটো কুঁচ্‌কে জিজ্ঞেস করল ত্রিবর্ণা। একটিও কথা বলে না ফ্লোরা। গুম্‌ হয়ে বসে থাকে খাটের ওপর। আজকের ঘটনাটাকে সে অন্ততঃ ঠাট্টা তামাসার মধ্যে ফেল্‌তে পাচ্ছে না। ওই চিঠিখানা পড়ে ত্রিবর্ণা যে, কি পরিমাণে হিংস্র হয়ে উঠ্‌বে তা যেন ফ্লোরা অনুমানেই বুকে নিচ্ছে। মনে মনে ঠিক করে, কাল ভোর হবার আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে অন্ততঃ ত্রিবর্ণার ঘুম ভাঙার আগে। নার্গিসের জন্য কোন চিন্তাই হয় না কারণ বেলা আটটার আগে ওর ঘুম কোনদিনই ভাঙে না। এই চিঠি-খানার ব্যাপারে ফ্লোরা একমাত্র ত্রিবর্ণাকেই প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। ওপাশ থেকে সবই দেখেছে নার্গিস। দুবার কলকণ্ঠে হেসেও উঠেছিল ওদের কাণ্ড দেখে।

—গোপনীয় চিঠি পড়ে কেন অপ্রস্তুত হবি ত্রিবর্ণা, তার চেয়ে দিয়ে দে।

সারা সন্ধের মধ্যে এই একবার মাত্র কথা কইলে নার্গিস।

—অপ্রস্তুত নয় হলামই তাতে কী।

বংকিম কটাক্ষে দেখে নিল ফ্লোরার মুখের চেহারাখানা। নার্গিস বুকে বালিশ দিয়ে কি একটা বিলিতী ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছে। সুন্দর মুখখানা আরও গম্ভীর করে দাঁড়িয়ে উঠল

ফ্লোরা। লাল কান দুটো দেখে বোঝা গায় বেশ রেগে গেছে ও।

—তাহলে সত্যি সত্যিই পড়বি চিঠিখানা!

—ভয় নেই গো—হাত ছাড়া হয়ে যাবে না।

পাত্‌লা হাসির মাঝে ঈষৎ কটাক্ষের ভাব ত্রিবর্ণার কথায়। ঘরের অপ্রচুর নীলাভ আলোটায় ত্রিবর্ণার সূক্ষ্ম সাড়ীখানা স্বচ্ছ লঘু মেঘের মত যেন ওর সর্বাংগে জড়িয়ে আছে। সদ্য প্রসাধন করা ওর গা থেকে একটা মৃদু উন্মত্ত সৌরভ আল্‌গা ভাবে সারা ঘরখানায় ছড়িয়ে পড়েছে। সারাদিনের পর একটু বিশ্রাম করেই এক কাপ চা আর কিছু খেয়ে এখুনি হয়ত বেরিয়ে পড়বে ও ইডেন হস্‌পিটাল রোডের সেই ইটবারকরা তিনতলা বাড়ীটার উদ্দেশ্যে অথবা এম্‌নি হয়ত এস্‌প্লানেডের চারপাশটা পাক্ খেয়ে বাসায় ফিরে আস্‌বে। ত্রিবর্ণাকে আর একবারও দেখ্‌তে ইচ্ছে করে না ফ্লোরার। সেদিনের সেই জড়ভরত মেয়েটা আজ যেন সকলকে ছাড়িয়ে যাবার যোগাড়। বাঙালী মেয়ের মাথার ওপর কেউ না থাকলে বড্ড বেহায়া হয়ে ওঠে। ওইতো নাগিস, মারাঠার কোন এক হোটেল মালিকের মেয়ে, অজিত সেনই অবশ্য মারাঠায় কাজ করবার সময় নিয়ে আসে ওকে। স্বেচ্ছায় ওর বাবা মেয়ের সব ভার ছেড়ে দিয়েছে অজিত সেনের ওপরে। কথা কম কইলেও বেশ লাগে ওকে। একটা শান্ত শ্রী মাখানো আছে ওর চোখে মুখে। আর ত্রিবর্ণাটা যেন জ্বলন্ত অংগার। খুব চট্‌পটে চালাক চতুর করে নিয়েছে নিজেকে খুব অল্পদিনের ভেতর। নাম অবশ্য ওর ত্রিবর্ণা ছিলো

না, অজিত সেনেরই ওটা দেওয়া, তা নাহলে কি যেন ছিল ওর নামটা বোধহয় কালোশশী কি নয়নতারা গোছের একটা হবে। পাকিস্তান হবার পরই বোর্‌খা চাপা দিয়ে নিয়ে আস্‌ছিলো কয়েকটি গুণ্ডা। শিয়ালদায় এসে হঠাৎ চেঁচিয়ে ওঠে আমায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে বলে। তারপরই এক মহাবিপ্লব। অর্ধমৃত গুণ্ডা তিনটিকে পুলিশের হেফাজতে দিয়ে অজিত সেনই কিরকম করে উদ্ধার করে নিয়ে আসে এখেনে। তারপর থেকেই তিনজনের জীবন প্রবাহ একই কক্ষে কেটে চলেছে আজও পর্যন্ত। পাড়াগাঁর মেয়ে আর শহরের ভদ্রতার কি জানবে। অথচ অজিত সেন এক একবার এমন ব্যবহার করেছে যে, মনে হয় ত্রিবর্ণাই কাজের মেয়ে সবচেয়ে কঠিন কাজগুলো একমাত্র ওর দ্বারাই সম্ভব। সারাদিন চর্‌কির মত ঘুরলেই যদি কাজের মেয়ে হওয়া যেত তাহলে আর ভাবনা ছিল কি! দুনিয়ার যাযাবরগুলো মান্যবর হোয়ে উঠ্‌তো। আর যাই করুক, অজিত সেনের কথায় ওঠ্‌বোস করা তার দ্বাবা সম্ভব নয়। ত্রিবর্ণার এই বেহায়াপনার জন্যে একমাত্র অজিত সেনকেই দায়ী করতে চায় ফ্লোরা। একথা কিন্তু অজিত সেন কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। কতোরাত্রে ফিরে আসেনি ত্রিবর্ণা বাসায়, তবু একদিনের জন্যেও জবাবদিহি করতে হয়নি অজিত সেনের কাছে। জিজ্ঞেস করলে শুধু নির্লজ্জের মত হাসতে থাকে মেয়েটা। ফ্লোরার সর্বশরীর ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে ওঠে ওর আচার ব্যবহারে।

কাজ করছি বলে কি নিজের অস্তিত্ব পর্যন্ত অস্বীকার করতে হবে!

—তবে নয় চিঠিখানা পড়েই ফেরত দে। সব সময় ইয়ার্কি ভালো লাগে না।

ভাঙা কাঁচের মত ধারাল গলায় বল্‌লে ফ্লোরা।

— না, চিঠিখানা এখন আমার কাছেই থাকবে।

ত্রিবর্ণা বিষয়টাকে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ করতে চায় না। ফ্রি স্কুল ষ্ট্রীটের মেয়ের কাছে ওরকম কতো চিঠিই আসে। হয়ত ত্রিবর্ণা চিঠির একটা অক্ষর পড়া দূরে থাক্ ভাঁজ অবধি খুলবে না তবুও ফ্লোরাকে রাগাতে বেশ মজা লাগে। রাগলে ওকে চমৎকার দেখায় অনেকটা পাকা সোনা আগুনে পোড়ানর মত লাল টক্‌টকে। কিন্তু বড্ড ছেলেমানুষ ও, একটুও ঠাট্টা বোঝে না। মিলিটারী ক্যাম্পে থেকে থেকে মেয়েটাও যেন মিলিটারী মেজাজী হয়ে গেছে। তবু যদি পেতো অজিত সেনের চিঠি। তা নয় কোথাকার কে গোমেশ লিখেছে গোয়ালিয়র থেকে নয়ত টমসন্ লিখেছে টাটা থেকে। আজকালই নয় সাড়ী পরছে অজিত সেনের পাল্লায় পড়ে তা নয়ত ঠোঁঠে লাল রং মেখে গাউন পরে ঘুরে বেড়াত এখেনে ওখেনে। বজ্‌বজের তেলের ডিপোর পাশে কতোদিন দেখেছে জিপের ওপর বসে আছে ফ্লোরা। সে সময় ইচ্ছে করেই চোখ ফিরিয়ে চলে এসেছে ত্রিবর্ণা। তাছাড়া শনি রোব্‌বারে তো ফ্লোরার টিকিটি পাবার যো নেই। এই নিয়ে কতবার অজিত সেন তার কাছে নালিশ

জানিয়েছে। ওর স্বভাব যে মোটেই ভালো হতে পারে না একথা জানিয়ে ছিল ত্রিবর্ণা তার কারণ ফ্লোরার জীবনের ইতিহাস তার অজানা ছিলো না। ফ্লোরার বাবা এণ্টনী সাহেব বর্মার জংগলে ফরেষ্ট অফিসার থাকতে একটা কারেণের মেয়েকে বিয়ে করেছিল। কারেণরা অধিকাংশই ক্রিশ্চান তাই বিবাহে প্রতি-বন্ধক হয়নি। তারপর কোন কারণে এণ্টনী সাহেবের চাকরী যায় ফ্লোরা জন্মাবার প্রায় বছর পাঁচেক পরে। কিন্তু ফ্লোরার মা স্বামীর দুর্দিনে এতোটুকু পতিব্রতার পরিচয় না দিয়ে এক অষ্ট্রেলিয়ান বণিকের সাথে অনন্ত সাগরের বুকে পাড়ি দিল। বর্মায় যথেষ্ট ধার দেনা হয়ে যাওয়ায় এণ্টনী সাহেব চলে এলো কোল্‌কাতায়।

অল্পদিনের ভেতরেই সৎমার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হোয়ে উঠ্‌লো ফ্লোরা তাই অল্পবয়স থেকে আলাদা থাকবার অভ্যেস তার হয়ে গেছে। অজিত সেনই বলেছিল কোহিমার কোন এক মিলিটারী ক্যাম্পে তার সাথে ফ্লোরার প্রথম আলাপ হয়। সুদর্শন-কান্তি অজিত সেনকে দেখা মাত্র ফ্লোরার পছন্দ হয়ে যায়। তারপর নিজের পার্টির কাজের জন্যে ফ্লোরাকে নিয়ে আসে কোল্‌কাতায়। কিন্তু তাহলেও ত্রিবর্ণা মনে করে তাকে ছাড়া অজিত সেনের একপাও চলবার ক্ষমতা নেই। এমন কি অদূর ভবিষ্যতে অজিত সেনের পাশে নিজেকে দাঁড় করিয়ে একটা মধুর সম্পর্কের কথা চিন্তা করতে দ্বিধাবোধ করেনা। পাড়ার লোকের অজস্র কদর্যপূর্ণ বিদ্রূপবান্‌ তাদের ওপর

বর্ষিত, হলেও এ পর্যন্ত গায়েই মাখেনি ত্রিবর্ণারা। এমন কি অজিত্ সেনের বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে অনেকেই এ বাড়ীতে আস্তে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু নার্গিসের একটা মাত্র কথায় অজিত সেনই এবাড়ীতে যাতায়াত বন্ধ করে দিল। শিবপুরের গার্ডেনে কিম্বা দক্ষিণেশ্বরের নির্জন বাগানে প্রয়োজনমত মিটিং হোত তাদের। ত্রিবর্ণা মনে মনে ভাবে আর হাসে যে, মেয়েরা আলাদা থাকলেই যেন স্বেচ্ছাচারে ডুবে যাবে। ছোট্ট হাত ঘড়িটার দিকে চেয়ে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সে। এখুনি না বেরুলে আবার ফির্তে অনেক রাত হয়ে যাবে। ভাব্তে ভাব্তে মনেই পড়ছেনা ফ্লোরাটা কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। ভেলভেটের স্লিপারটা যখন ও পরে যায়নি তবে নিশ্চয়ই এখুনি ফেরবার ওর কোন সম্ভাবনা নেই। হয়ত রাগে দুঃখে কোন এক পার্কের বেঞ্চে বসে কাঁদছে মেয়েটা। ত্রিবর্ণা নিজেই অনুতপ্ত হয়ে ওঠে নিজের আচরণে। একমনে পাঠরতা নার্গিসের স্নিগ্ধ মুখখানার দিকে চেয়ে চেয়ে এক সময় বেরিয়ে পড়ল উদ্দেশ্যহীন গতি নিয়ে।

রাষ্ট্রীয় পরিবাহনে বসে আচম্কা বুকের ভেতর থেকে বার করে ফেল্লে চিঠিখানা। দেখে মনেই হয়না যে, এরকম একখানা কাগজ মেঘদূত হয়ে এসেছে ফ্লোরার কাছে। গায়ের ঘামে ভিজে গেছে খামখানা। তিনপাট ভাঁজ খুলে তিনবার পড়েও ত্রিবর্ণা নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পাচ্ছিলনা।

অজিত সেন লিখেছে চিঠি সুদূর সুয়েজ থেকে এ যেন সত্যিই বিশ্বাস করা যায় না, অথচ প্রায় একই ধরণের চিঠি সেও পেয়েছে গতকালের এয়ারে। তফাৎ শুধু মহানাদের বদলে মধুপুর। বারকয়েক চোখমুছে দু'খানা চিঠিই পাশাপাশি ধরে ত্রিবর্ণা। নাঃ—দু'খানাই সুয়েজের চিঠি, ভুল সে একটুও দেখছেনা অথচ কী আশ্চর্য, এক ভাষা, এক কাগজ, এক স্বাক্ষর। অজিত সেনের সম্বন্ধে অন্তত ত্রিবর্ণার ধারণা অনেক উঁচু। কতো গভীর রাতে জনমানবহীন মাঠে জঙ্গলে রাতের পর রাত, দিনের পর দিন, সে কাটিয়েছে অজিত সেনের সংগে। প্রকৃতি পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণের অনেক কিছুই ঘটতে পারে বলে আশংকা করেছিল ত্রিবর্ণা কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে অপ্রস্তুত না থাকলেও অজিত সেন ঘটতে দেয়নি। তার প্রতি অজিত সেনের উদার অনুকম্পার খানিকটা মূল্যও যদি সে এই ভাবে চাইতো, তাতে ত্রিবর্ণার এতোটুকু আপত্তির কারণ ছিলোনা। মহাদানের মতই নিজেকে নিবেদন করত। কিন্তু অজিত সেন সেদিনের মত আজও অচেনা রয়ে গেল ত্রিবর্ণার কাছে। একদিনে একই সময়ে কেমন করে একটা লোক মধুপুর আর মহানাদে হাজির হবে! এমন অসম্ভব কথা কেউই বিশ্বাস করবেনা। পার্টির কাজে অজিত সেন কখনও কথার বেখালাপ করেছে বলে কেউ অপবাদ দিতে পারবেনা। তার কাছে সময়ের দাম সব চাইতে বেশী। কিন্তু ত্রিবর্ণা বেশ বুঝতে

১৬ যা—

পারে স্যুয়েজের চিঠি মোটেই তার সময় জ্ঞানের পরিচয় দিচ্ছে না। তবে কি নার্গিসও এমন একটা চিঠি পেয়েছে যার ওপর স্যুয়েজের ছাপমারা? মোটেই তা মনে হয়না ওর ভাবলেশ-হীন স্নিগ্ধ মুখের দিকে চেয়ে। তবে অজিত সেনের এ ছলনার অর্থ কি।

ত্রিবর্ণা এতোক্ষণে বুঝতে পারে কেন ফ্লোরা কিছুতেই দিতে চাইছিলনা চিঠিখানা। স্যুয়েজের চিঠি যে তারও কাছে এসেছে একটা, একথা ফ্লোরা হয়ত জানেনা, তার ধারণা সেই একমাত্র পেয়েছে শ্রেষ্ঠতম পুরস্কার। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সহর গুলোয় হাত ধরে ঘুরে বেড়াতে পারবে অজিত সেনের। রাত্রের সুখ শয্যায় সহধর্মিনীর অধিকারে পুরুষের স্বভাবসুলভ দৌরাত্মে এতোটুকু বাধা দেবার চেষ্টা মাত্র করবেনা। পোষাকের খাঁচা হতে মুক্ত তনুলতা অবাধে ছেড়ে দেবে নৈশ অভিযানে। আহা .বচারী!

রাতের গাঢ় মৌনতায় ফাঁকা বাসের মধ্যে অজিত সেনের কথা ভাবতে ভাবতে ত্রিবর্ণার চোখের সামনে সন্দেহের পাতলা আস্তরণ ধীরে ধীরে নেমে আসে। অজিত সেনই একদিন তাদের বলেছিল. দেশের মধ্যে থেকে কাজ করা আর সম্ভব নয়, এখেনে থেকে বহুরকম অসুবিধে হোচ্ছে। এবার ফিরে এসেই বোধহয় চির সাথী করে নিয়ে যাবে একজনকে। সে সৌভাগ্য কি তারই হতে পারে না? অজিত সেনই তো একদিন বলেছিল, ত্রিবর্ণা, তোমার ওপর কাজের ভার দিয়ে

আমি সবচেয়ে বেশী নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। ফ্লোরা কি অন্য কাউকেই তার পছন্দ নয় একথা ত্রিবর্ণা বেশ. ভালো ভাবেই অনুমান করে নিয়েছে। কিন্তু ফ্লোরাটা ভাবে যেন একমাত্র তাকেই বিশ্বাস করে অজিত সেন!

নার্গিসটা সেদিক থেকে সুখী। সত্যি ওরকম চাপা মেয়ে এ পর্যন্ত খুব কমই দেখেছে ত্রিবর্ণা। শুধু কাজ আর বই পড়া। হঠাৎ ত্রিবর্ণার হাসি পেয়ে যায় সন্ধের ঘটনাটা মনে করে। ফ্লোরার ওপর করুণা হয় যে, বেচারী শুধু শুধুই মহানাদ যাবে আর ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসবে। তার কিন্তু প্রচণ্ড আত্ম-বিশ্বাস জন্মে গেছে যে, অজিত সেন মহানাদ না গেলেও মধুপুরে আসবেই। ফ্লোরাকে শুধু দূরে সরিয়ে দেবার জন্যেই অজিত সেন এ মিথ্যার আশ্রয়টুকু গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। তাই শেষ রাতেই বেরিয়ে পড়া দরকার অন্ততঃ ফ্লোরা কি নার্গিস ওঠবার আগেই। অন্তরে একটা জয়ের গর্ব নিয়ে ত্রিবর্ণা উঠে বসে শেষ বাসখানায়। হু হু করে রাষ্ট্রীয় পরিবাহন ছুটে আসে অনেক ষ্টপেজে না থেমে। নিশুতি রাতে হাইহিল আর ফুটপাতের শান-বাঁধান সড়কে শব্দ একটু জোরালো শোনায়। বাসায় ফিরে ত্রিবর্ণার ভ্রুদুটো কুঁচকে ওঠে ফ্লোরা ফেরেনি দেখে। ঘুমন্ত নার্গিসকে অকারণে ডাক ইচ্ছে হয় না। ছোট্ট সুটকেশটি গুছিয়ে রেখে শুয়ে পড়ে চিন্তার জট নিয়ে। বারোটা, একটা, দুটো,

আড়াইটের ঘন্টা অবধি কানে আসে নীচের জাপানী ক্লক্ থেকে।.

গ্যাসের আব্ছা আলোয় নির্জ্জন পার্কের বেঞ্চে বসে একটা কঠিন সংকল্প ফ্লোরার সমস্ত অনুভূতিকে দুরন্ত কোরে তুল্তে চায়। ত্রিবর্ণা কি আর এতোক্ষণেও পড়েনি চিঠিখানা! সমস্ত আবহাওয়াটার মাঝে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব করে ফ্লোরা। একমুহূর্ত বসে থাক্তে চায় না পাদুটো অথচ ঘুরে বেড়িয়েও তৃপ্তি নেই। হিংসার খরদাহে নিশ্চয়ই অস্থির হয়ে উঠেছে ত্রিবর্ণা। চৌরংগীর পর্যাপ্ত আলোকেও হয়ত হোঁচট খাচ্ছে সমতল রাস্তায়। চিঠি নিলেই তো আর অজিত সেনকে পেয়ে যাবেনা সে, ফ্লোরা নিজের অশান্ত মনকে শান্ত করে এই ভেবে। নিজের জীবনের সীমাহীন পথ রেখার সীমানা বুঝিদেখা যায় এবার। তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায় সে। উচ্ছৃংখল জীবনে শৃংখল যেন স্বপ্নের মতোই দুর্ল্লভ অথচ সেই শৃংখলই আজ ছুটে আস্ছে জলধির ওপার হতে। বহুপুরুষের সংগে মিশেও ফ্লোরার অন্তরে তাদের কোন রেখাই আঁকা নেই। অজিত সেনই তার জীবনে ঝড় তুফান। ম্যাজেষ্টিকের জোন্সের কথা মনে হলে আজও ঘৃণায় সর্ব-শরীর কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। টাকার লোভ দেখিয়ে ভোগ করতে চেয়েছিলো জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। বীভৎস রাতের স্মৃতিটা এখনও বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে যায়নি বলে

অনেক সময় নিজেকে অশুচি লাগে পবিত্র দেউলে যেতে। গ্লানিকর অতীতের সাথে সম্পর্ক কি একটুও ভোলা যায় না! জোন্সের ভারী দেহটার কতোটা ওজন ফ্লোরা অনেকটা অনুমান করেছিল নৈশ নগরীর নিঃসহায় নিরুপায়ের মত। প্রাণপণ শক্তি নিয়ে চীৎকার করার মত বোকামী সেদিন মনেই আসেনি। বীত শ্রদ্ধায় অনিচ্ছাকৃত চিরন্তন আদিম প্রবৃত্তির স্রোতে ভেসে যেতে হয়েছিল দুর্নামের ভয়ে। উষ্ণ উত্তেজনা প্রবেশের নিষ্ঠুর বলপ্রয়োগ ঘৃণাই জানিয়েছিল সারা জাতের ওপর। রুদ্ধ কক্ষের উজ্জ্বল বিদ্যুতালোকে অভদ্র দেহটা কুঁক্‌ড়ে যেতে চাইলেও ওপরের খস্‌খসে লোমশ পাদুটো জড়িয়ে ধরে রেখেছিল হয়ত ওর শেষ মুহূর্ত উপস্থিত। অপরিসীম ক্লান্তি নিয়ে নেমে গেল অসহ্য বোঝাটা। চাপা বুক হোল উন্নত। পোষাকমুক্ত লাল্‌চে নরম চামড়ার ওপর জোরালো আলোর সবটুকুই জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে উঠ্‌ল। উল্ললাংসের ক্ষণ দর্শনে চকিতে টেনে নিল এখানে সেখানে ছড়িয়ে পড়া গোটা কতক দর্জির কলা নৈপুণ্য। জ্বলন্ত লাভার মত অবাঞ্ছিত অনুভূতি আজও গেলোনা ভোলা। যুদ্ধের খাঁকি পোষাকে চলে এলো কোহিমার তাঁবুর আশ্রয়ে। বিশ্বাসের মাঝে লুণ্ঠিত হওয়ার চেয়ে অচেনার মাঝে দান করাও অনেক ভালো। আন্তরিকতার ছদ্মবেশে আসুরিকতার রূঢ় আবেষ্টনী হতে বাঁচবার এছাড়া আর কোন পথই তখন খুঁজে পায় নি

ফ্লোরা। সমৃদ্ধ বয়সে সকাম অনুকম্পা শুধু অসহ্য নয় কদর্য বিড়ম্বনা।

অজ্ঞাতসারে ফ্লোরা হাজির হয় হাওড়া ষ্টেসনের আপার ক্লাস বিশ্রাম ঘরে। গাড়ী নেই জেনেও জিজ্ঞেস করে গাড়ীর কথা। সে যেন কল্পনায় বেশ দেখ্‌তে পাচ্ছে মহানাদের ধ্বংসস্তুপের ওপর দাঁড়িয়ে সে আর অজিত সেন। অজিত সেনের ঠোঁটে একটা অদ্ভুত মার্জিত হাসি। বুকের অনেকটা অংশ ওর বুকের সংগে এঁটে রয়েছে এমন কি হৃৎপিণ্ডের প্রতিটি ধাক্কা এসে বাজ্‌ছে বুকে। অজিত সেনের উষ্ণ ঠোঁঠ দুটো নেমে এলো রাশি রাশি ক্ষুধা নিয়ে নরম ঠোঁঠের ওপর। দুটো দেহের ব্যবধানও বাহুর বন্ধনে আরও নিকটতম হয়ে এলো। তারপরেই সোঁ সোঁ করে রকেটের মত ছুটে এলো বন্দর—জাহাজ—কেবিন—সুয়েজ—ফ্রান্স—বেলজিয়াম—ভিয়েনা।

একটি মাদ্রাজী অপেক্ষমানা যাত্রিনীর নবজাত শিশুর চীৎকারে ফ্লোরার চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ে। ভোর পাঁচটায় গাড়ী—আধঘণ্টায় পঁচিশবার ঘড়ি দেখেও সময় আর কাটে না। রক্ত-করবীর মত পুঞ্জ পুঞ্জ উত্তেজনার রক্তিম আবেগ অধৈর্য করে তোলে বিরক্ত প্রবাসীর মত। অপেক্ষার আভিজাত্য থেকে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মাঝে এসে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস অনেকটা সহজ সরল হয়ে ওঠে। ভোরের গাড়ীতেই চলে যাবে সে, বাসায় ফিরলে কোন কারণে আট্‌কে পড়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু অজিত সেনের সংযমী মনকে সে কি জয় করতে পারবে, যার

হেমকান্তি শৃঙ্গারচেষ্ট দৃষ্টিপাতের সাম্‌নে বিদ্রোহীও পরাভব স্বীকার করে এমনই ব্যক্তিত্বের গম্ভীর তেজস্বীতা। . 'কিন্তু পরোক্ষে যারা তোমার নেতৃত্ব অস্বীকার করতে চায় তারাই একদিন না একদিন তোমার যথার্থ মূল্য দিতে বাধ্য হবে ' অনুচ্চ কণ্ঠে বলে ওঠে মুগ্ধা ফ্লোরার অর্দ্ধ অবচেতনা। সেদিনের বিপুল সম্বর্ধনার অর্ধেক ভাগ নিশ্চয়ই তার প্রাপ্য। মস্ত জয়ের গৌরবে সাম্‌নের সব কিছুই তুচ্ছ মনে হয়।

রাতের প্রাচীনতার সাথে সাথে ফ্লোরার মানসনেত্রে ক্রম বিকশিত হতে থাকে গতির তালে তালে। এখন সত্যই করুণা হয় ত্রিবর্ণার ওপর। কতো সাবধানী আবেষ্টনী দিয়ে যাকে সে আগ্‌লে রাখ্‌তে চেয়েছিলো তারই নিষ্ঠুর পলায়নে তুলসী মঞ্জুরীর মতই ওকে শুকিয়ে দেবে দিনের পর দিন। আর কয়েক ঘণ্টা পরেই হয়তো মেয়েটার মাথার ওপর নেমে আসবে নিরাশার শাণিত খড়্গ রাগে, দুঃখে ব্যর্থতায় এর পর সস্তাদরের সামগ্রীর মত নিজেকে সুলভ করে দেওয়াও ওর পক্ষে বিচিত্র নয়। ভাবলেশহীন নাসিসের জন্যই যা একটু দুঃখ জাগে। ও কখনই বেপরোয়া হতে পারবে না ত্রিবর্ণার মত, তাই মারাঠার হোটেলেই ফিরে যেতে হবে ওকে অনাস্বাদিত তৃষ্ণা নিয়ে। পৈতৃক উদারতায় হয়তো মারাঠার গৃহলক্ষ্মী হয়ে কাটিয়ে দেবে জীবনের তিন চতুর্থাংশ অধ্যায়।

দুখানা গাড়ীই ছুটে চল্‌ল মহানাদ আর মধুপুরের পথে। একটা হোল রুগ্ন বাঙালীর স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের পরিপূর্ণ আশ্রয়। মধুর অন্নপূর্ণার মধুরতায় ভরপুর। ধব্‌ধবে সাড়ী পরা শালগ্রাম শিলার ওপর কুঁদ ফুলের মতই দেখা যায় সাঁওতালীর হাসিখুসী-ভরা জীবনপ্রবাহ। পাহাড়ী ঝরণার মতই লাস্যময়ী। আর একটি হোল প্রাচীন ঐতিহ্যের স্বাক্ষীস্বরূপ প্রত্নতাত্ত্বিকের মহামূল্য ভগ্নাবশেষ, ম্যালেরিয়ার মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত। ভাঙা ইট পাথরে লেখা আছে কি নাকি ছিল একদিন।

ভাড়াটে ট্যাক্‌সির ভাড়া মিটিয়ে নেমে এলো অজিত সেন। সুয়েজ থেকে সোজা আস্‌ছে সিম্‌লের বাসায়। ওপরে উঠ্‌তেই গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াল নার্গিস্‌।

—আহা, বেচারীদের অত কষ্ট না দিলেও পারতে। কোথায় মহানাদ আর কোথায় মধুপুর!

কৌতুকের হাসি ফুটে উঠ্‌ল অজিত সেনের মুখে।

—এ ছাড়া যে আর কোন উপায় ছিল না বোন। আজ মিটিং। ওরা থাক্‌লে সব পণ্ড করে দিত। দেশের কাজে মন নিয়ে মাতামাতি করবার মত সময় আমাদের কোথায়।

—কিন্তু ওরা দুজনেই অনেক আশা করেছিল তোমার ওপর।

—সেইজন্যেই তো এ ছলনাটুকু আমায় করতে হোল। যারা ঘর বাঁধবার স্বপ্ন দেখে তাদের জন্যে এ পথ নয়। তুমি তৈরী হয়ে নাও। এ বাসা আজকেই ছেড়ে দেব।

নার্গিস্‌ তৈরী হয়েই ছিল তাই বিনয়-নম্র কণ্ঠে বল্‌লে :

—তোমার চিঠি পাবার সংগে সংগেই সব গুছিয়ে রেখেছি।

যাবার সময় একটা চিঠি লিখে রেখে গেল অজিত সেন।··· তোমরা দুজনেই আমাকে ভুল বুঝেছিলে, তার জন্যেই আমাকে এই মিথ্যের আশ্রয়টুকু নিতে হোল। যে কষ্ট তোমাদের দিলাম তা'রজন্যে আমায় ক্ষমা কোর। দশের কাজে নেমে নিজের সুখটাকে বড় করে দেখো না। আজ মিটিং তাই সময় খুব কম। নার্গিস্‌কে নিয়ে চললাম। ওর সত্যিকার পরিচয় তোমাদের বলিনি। আজ বলছি ও আমার বোন সরযূ। কয়েক লক্ষ টাকার সম্পত্তি দান করেছে উদ্বাস্তুদের। হয়ত আর কোনদিনই দেখা হবে না কারণ মিটিং শেষ হলেই আমিও আবার য়ুরোপের পথে পাড়ি দেব। আমার সমবেদনা গ্রহণ কোর···।

বিরাট মিছিল···উদ্বাস্তু আর ভুখা জনতার শোভাযাত্রা। কলেজ ষ্ট্রীট দিয়ে বিবেকানন্দ রোডের দিকে এগিয়ে চলেছে। রাস্তার দুধারে অবাক হয়ে চেয়ে আছে নির্বাক জনতা। কেউ দেখেনি এর আগে এত বড় মিছিল। শুধুই জনস্রোত·· নারী-পুরুষের মিলিত জনস্রোত। পুলিশের ভ্যানগুলোও পাশাপাশি চলেছে উদ্ধত আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে। ঘন ঘন শ্লোগান। শান্তির ঝাণ্ডা উঁচিয়ে চলেছে সবাই। বিবেকানন্দ রোড ধরে পশ্চিমমুখো মিছিল সর্পিল গতিতে চললো এগিয়ে। নির্বাক জনতার অনেকেই এসে মিশে গেল এ শোভাযাত্রায়। মন্থর শোভাযাত্রা শেষ হোল মহম্মদআলী পার্কে। বিরাট জনসভা আগে থেকেই বহুলোক জমা হয়ে আছে তারওপর এতো বড় শোভাযাত্রাকারীর দল। পার্কে আর তিল ধারণের

স্থান নেই। উন্মুক্ত আকাশের তলায় উঁচু মঞ্চে উঠলেন বক্তা, আজকের প্রধান অতিথি অজিত সেন। জনপ্রিয় নেতার দর্শনে প্রাণের আবেগে জিন্দাবাদ জানাল শত সহস্র জনতার মিলিত কণ্ঠস্বর। আরম্ভ হোল বক্তৃতা। অত বড় সভা, এতোটুকু শব্দ না করে শুনে গেল নেতার কথা। দিনের পর দিন দুর্গতির দুর্ভাবনায় সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়ল। আজকের চরম দুর্গতির জন্য দায়ী কে? কার অনুষ্ঠিত কৃতকর্মের ফলে এই প্রগতিশীল শতাব্দীর বুকেও এতোখানি মাৎস্যন্যায় নীতির প্রভাব বিস্তৃত হোল? কে দেবে জবাব! পলাশীর বিশ্বাস-ঘাতকতার সব মূল্য কি এখনও শোধ হয় নি? কোটি কোটি মানুষের শান্তি প্রচেষ্টা কি এমনি করেই মতবাদের সংঘর্ষে ধূলিসাৎ হয়ে যাবে! সাম্রাজ্যবাদ ষড়যন্ত্রের জটিল চক্রান্তে আর কতোকাল নিরপরাধ মানুষের মাঝে নেমে আসবে মৃত্যুর অসংখ অনুচর! আকাশফাটান কণ্ঠে জনমণ্ডলী চেঁচিয়ে উঠ্‌ল—"অজিত সেন জিন্দাবাদ।" মঞ্চ থেকে নেমে আসার সংগে সংগেই একটা মোটা ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিল মুকুল। কতোকাল পরে মুকুলের দেখা পেয়ে অজিত সেন আনন্দের আতিশয্যে স্তম্ভিত হয়ে গেল। পাশেই দাঁড়িয়ে বদ্যিনাথ রায়। তারও পেছনে ভগবান। বুকে জাপ্‌টে ধরলে বদ্যিনাথ অজিত সেনকে। দর দর ধারায় আনন্দাশ্রু নেমে এলো সকলের চোখে।

—আজ আমার সত্যিকার আনন্দের দিন। গর্বে বুকটা ফুলে

উঠ্ছে তোমাকে আলিংগন করে। প্রণাম কর মুকুল। আজকের দিনে অন্ততঃ ওর প্রাপ্য থেকে ওকে বঞ্চিত কোরনা। আজ যে ও দেশের দেবতা

বদ্যিনাথ রায়ের কথায় লজ্জা অনুভব করে অজিত সেন। ততক্ষণে অসংখ্য জনতার গগনভেদী চীৎকার অনেক পাত্‌লা হয়ে এসেছে। মুকুলের দিকে তাকিয়ে অজিত সেনের মনে হয় মুকুলই তার বিজয়লক্ষ্মী, বিজয়বার্তা বহন করে এনেছে তার কাছে। সরযূ ও এগিয়ে এলো আলাপ করবার জন্যে। কেউই আর কারো কাছে অপরিচিত রইলনা বিস্ময়ের ধাক্কা সাম্‌লে নিয়ে বল্‌লে অজিত সেন:

—আপনারা কোত্থেকে এখেনে এসে হাজির হলেন দাদা?

—কেন, মনে নেই কাশীর কথা! বলেছিলাম তো, যেখেনেই থাকি তোমার সম্মেলনে এসে হাজির হবই। সারা পাঞ্জাব ঘুরে আজকেই এসেছি কোল্‌কাতায়। তোমার জিন্দাবাদ শুনে মিশে গেলাম মিছিলের মাঝে। তুমি আমার খবর না পেলেও আমি তোমার সব খবরই পেতাম। ...য়ুরোপের খবর কি?

—খুব আশাজনক। আশীর্বাদ করুন দাদা এবার গিয়ে যেন সাফল্য লাভ করি।

—নিশ্চয়ই, একশোবার। তবে শুধু হাতে আশীর্বাদ তো করতে পারিনা তাই আমার সবচেয়ে দামী জিনিষটি তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি, একে গ্রহণ কর ভাই। অগ্নি পরীক্ষায় যাকে

উত্তীর্ণ করিয়ে নিয়েছি। পাঞ্জাবে যে মাতৃরূপ আমি দেখেছি তা আর কোনদিন ভুলবোনা।

—আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু আমি যে দাদা যাযাবর…

—সেই জন্যেই তো যাযাবরীকে তোমার হাতে তুলে দিচ্ছি। গতায়ু পৃথিবী পৃষ্ঠে কে যাযাবর নয় অজিত, তবু তারাই আবার জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানে নীড় রচনা করে। চলিষ্ণু কালের ছন্দে ছন্দে এগিয়ে যাওয়াই প্রগতির একমাত্র কর্তব্য। আমরা সেই প্রগতির বাহক। মিথ্যা, গতিহীন স্থাণুর নেশায় উন্মত্ত হয়ে পশ্চিমের ধারকরা সভ্যতার ভঙ্গুর পসরায় আমাদের মনের সব কিছু জলাঞ্জলী দোবনা এই ভংগুর হাটে। নতুন উষার সাথে সাথে বাজাব জয়ডংকা। ফিরিয়ে আনব সেই সুমহানকে যার হাতে ন্যায়ের মানদণ্ড।…

শক্তের পাশে এসে দাঁড়াল শক্তি। হাত ধরে এগিয়ে চলল পথের দিকে। মুগ্ধ জনতা আপনি তাদের পথ করে দিল।